অবাক পৃথিবী

নারায়ণ সান্যাল

কুন্ডু ব্যাক্তিগত পাঠাগার

www.Banglaclassicbooks.blogspot.in

আমার কথা

বাংলা বইয়ের স্বর্গখনি আমার সংগ্রহে আছে। যে বইগুলো আমার পছন্দ এবং ইতিমধ্যে ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো নতুন করে স্ক্যান বা করে পুরনোগুলো যা এডিট করে নতুন ভাবে দেবো। যেগুলো পাওয়া যাবেনা, সেগুলো স্ক্যান করে উপহার দেবো। আমার উদ্দেশ্য ব্যবসায়িক নয়। শুধুই বৃহত্তর পাঠকের কাছে বই পড়ার অভ্যেস ধরে রাখা। আমার অগ্রণী বইয়ের সাইট সৃষ্টিকর্তাদের অগ্রিম ধন্যবাদ জানাচ্ছি যাদের বই আমি শেয়ার করব। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বন্ধু অস্টিমাস গ্রাইম ও পি. ব্যান্ডস কে - যারা আমাকে এডিট করা জানা ভাবে শিখিয়েছেন। আমাদের আর একটি প্রয়াস পুরোনো বিস্মৃত পত্রিকা নতুন ভাবে ফিরিয়ে আনা। আগ্রহীরা দেখতে পারেন www.dhulokhela.blogspot.in সাইটটি।

আপনাদের কাছে যদি এমন কোনো বইয়ের কপি থাকে এবং তা শেয়ার করতে চান - যোগাযোগ করুন -

subhojit819@gmail.com.

PDF বই কখনই মূল বইয়ের বিকল্প হতে পারে না। যদি এই বইটি আপনার ভালো লেগে থাকে, এবং বাজারে হার্ড কপি পাওয়া যায় - তাহলে যত দ্রুত সম্ভব মূল বইটি সংগ্রহ করার অনুরোধ রইল। হার্ড কপি হাতে নেওয়ার মজা, সুবিধে আমরা মানি। PDF করার উদ্দেশ্য বিরল যে কোন বই সংরক্ষণ এবং দূর দূরান্তের সকল পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। মূল বই কিনুন। লেখক এবং প্রকাশকদের উৎসাহিত করুন।

There is no wealth like knowledge, No poverty like ignorance

SUBHAJIT KUNDU

অবাক পৃথিবী

উৎসর্গ

পরমশ্রদ্ধাস্পদ

অধ্যাপক শ্রীরঙীন হালদার

মনোবিজ্ঞানাদিসকলকলা পারঙ্গমেষু

রচনাকাল : জুলাই 1976
প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর 1976

কৈফিয়ত

ইতিপূর্বে বিজ্ঞান-ভিত্তিক কথা-সাহিত্য যা রচনা করেছি, তা মূলত বিদেশী লেখকদের ছায়াবলম্বনে। অনুবাদ না হলেও তাতে মৌলিকতা ছিল না। স্থান-কাল-পাত্রের পরিবর্তনে তা ছিল মূলত—ছায়াবলম্বন; কখনও বা 'পেনাম্রাবলম্বন'! বর্তমান কাহিনীটি, এবং একই সঙ্গে লিখিত এবং প্রকাশিত 'আজি হতে শতবর্ষ পরে' এ বিষয়ে আমার প্রথম মৌলিক প্রচেষ্টা। 'রোবোটিক্স-বিজ্ঞান' সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে আমি তথ্য-সংগ্রহে বিদেশী লেখকদের কাছে ঋণী, বিশেষ করে আইজাক আজিমভের কাছে। 'রুডল্‌ফ ব্যাটলার' নামটির জন্য যাঁর কাছে ঋণী, প্রচ্ছদপটে তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করেছি।

আরও একটি ত্রুটি স্বীকার করি। এ গ্রন্থে 'মার্কিন-নিগ্রো' শব্দটি বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। ইদানিং তাঁদের 'আফ্রো-আমেরিকান' বলাই রেওয়াজ। সমকালের প্রতি শ্রদ্ধায় আমি শব্দটি পরিবর্তন করিনি। মূলে তখনকার প্রচলিত ধারণায় যা লিখেছি তাই অপরিবর্তিত আছে। এতে ওঁদের অশ্রদ্ধা করা হয়নি।

নারায়ণ সান্যাল

- Do you think that, if you were granted omnipotence and omniscience and millions of years in which to perfect your world, you could produce nothing better than the Ku Klux Klan, the Fascists and Mr. Winston Churchill ?

[*Russell—'Why I am not a Christian'*]

- The scheme of the Universe is devilish; I could have created a better world.

[*Vivekananda—'Kathamrita'*, Part II]

- Man is a rope stretched betwixt beast and Superman—a rope over an abyss.

[*Nietzsche—'Thus Spake Zarathustra'*]

- Man must either himself become a divine humanity or give place to Superman.

[*Aurobindo—'The Life Divine'*]

পৃথিবীতে বর্বর মানুষ জন্তুর পর্যায়ে। কেবলমাত্র তপস্যার ভিতর দিয়ে সে হয়েছে জ্ঞানী মানুষ। আরও তপস্যা সামনে আছে, আরও স্থূলত্ব বর্জন করতে হবে, তবে সে হবে দেবতা। পুরাণে দেবতার কল্পনা আছে, কিন্তু অতীতে দেবতা ছিলেন না, দেবতা আছেন ভবিষ্যতে, মানুষের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে।

[রবীন্দ্রনাথ—তিনসঙ্গী]

- Thou shalt create a higher body, a primal motion, a self-rolling wheel—thou shalt create a creator.

[*Nietzsche—Thus Spake Zarathustra'*]

নীরন্ধ্র অন্ধকারের বুক চিরে সৃষ্টির আদিম প্রভাতের প্রথম প্রকাশ যেন। সুরেলা যান্ত্রিক জলতরঙ্গের শব্দে সুষুপ্তি ভেঙে গেল ওর। ধীরে ধীরে চোখ মেলে চাইল। প্রথমটায়—প্রতিদিন সকালে ঘুম ভাঙার সময় সকলেরই যেমন হয়, ওর মনে হল—এ কোথায়, কেমন করে এল এখানে? শরীরটা অবসন্ন, ক্লান্ত, সর্ব অবয়বে যেন জোর নেই। হাত-পা স্বইচ্ছায় বুঝি নাড়ানো যায় না। চোখের সামনে অর্ধ-গোলাকৃতি একটা চন্দ্রাতপ—স্বচ্ছ, কাচের অথবা প্লাস্টিকের। উঠে বসবার চেষ্টা করবে কিনা ভাবছিল, ঠিক তখনই কে যেন বলে উঠল, সুপ্রভাত ডক্টর রয়! নড়াচড়া করবেন না। আপনি খুব দুর্বল এখন। আপনার শরীরে রক্ত চলাচল হতে দিন। আপনি কোথায় আছেন, তা মনে পড়েছে? স্পেসশিপ 'ফ্রন্টিয়ার'-এর 'হাইবারনেকুলাম'-এ।

হ্যাঁ, মনে পড়ে গিয়েছে। একে একে সব কথাই মনে পড়ে যাচ্ছে। আত্মপরিচয়। ও হচ্ছে ডক্টর বব্ রয়, মার্কিন নাগরিক। বয়স পঁয়ত্রিশ। পঁয়ত্রিশ? কোন হিসাবে? বছর বলতে কী বুঝি?—না, ওসব গুরুতর তাত্ত্বিক আলোচনা এখন নয়। ওর মস্তিষ্কের ইন্দ্রকোষগুলি অনেক, অনেকদিন পরে যথেষ্ট পরিমাণ রক্তকণিকার সন্ধান পেতে শুরু করেছে। কোনো দুরূহ চিন্তার সময় এটা নয়। বেশ বুঝতে পারছে—হাত পা, দেহের প্রতিটি প্রত্যঙ্গ পক্ষাঘাতের অবশতা থেকে তিল তিল করে সজীব হয়ে উঠছে—ইট-চাপা ঘাসের চাপড়া যেমন রোদ-জল পেয়ে খুশিয়াল হয়ে ওঠে।

এখন আপনার শিপ-টাইম ৯ বছর ২১০ দিন ৩৬,১২০ সেকেন্ড। অর্থাৎ পৃথিবীতে এখন ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের তেরোই মার্চ—নিউ-ইয়র্ক টাইম, বেলা দশটা সতেরো। তার মানে আপনি নিদ্রাকক্ষে একাদিক্রমে পাঁচ বছর তিন মাস ছদিন ঘুমিয়েছেন। বুঝলেন?

হ্যাঁ, বুঝেছে। সওয়া পাঁচ বছর একাদিক্রমে ঘুমিয়েছে। সব কিছু এতক্ষণে মনে পড়ে গেছে। ফ্রন্টিয়ার স্পেস-শিপ নিয়ে ওরা তিনজন রওনা হয়েছিল ২০১৭ খ্রীস্টাব্দে। মঙ্গল-বৃহস্পতি-শনি ছাড়িয়ে ইউরেনাস-এর উপগ্রহ ট্রাইটনের উদ্দেশ্যে। পৌঁছেছিল লক্ষ্যস্থলে। অবতরণ করেনি, অবতরণের কথাও ছিল না। অত্যন্ত কাছে গিয়ে বেতার-ফোটো তুলেছে SIDE যন্ত্রের সাহায্যে, ট্রাইটনের অন্তস্তলটা বুঝে নেবার চেষ্টা করেছে, সবকিছু তথ্য বেতারে জানিয়েছিল মিশন-কন্টোলকে। তারপর ২০২১ খ্রীস্টাব্দে ওরা যে যার নিদ্রাকক্ষে শুয়ে পড়েছিল, ফ্রন্টিয়ারকে শেষবারের মতো পৃথিবীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে। ওরা জানত, ঘুমন্ত যাত্রীদের নিয়ে পাঁচ বৎসর পরে মহাকাশযান ফ্রন্টিয়ার এসে পৌঁছবে পৃথিবীর অভিকর্ষ এলাকায়। এ পাঁচ বছর প্রত্যাবর্তনের পথে ওরা নিষ্কর্মা। বসে থেকে যাতে অন্নধ্বংস না করতে হয়—অন্নটা অবশ্য বড় কথা নয়, তবে তিনটি প্রাণীর পাঁচ বছরের আহার্যের ভর নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ; অক্সিজেনের পরিমাণটাও—তার চেয়েও বড় কথা—নিষ্কর্মা নভোচারীদের মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখাটা। তাই এই হাইবারনেকুলাম-এর আয়োজন।

বিজ্ঞান লক্ষ্য করেছিল, পৃথিবীতে অনেক উষ্ণ-রক্তের প্রাণী আছে, যারা সারাটা শীতকাল ঘুমিয়ে কাটায়—চার-ছ মাস। ঐ দীর্ঘসময়ে তাদের শারীরধর্মের অনেক স্বাভাবিক কর্মপদ্ধতি সাময়িকভাবে মুলতুবি থাকে। তারা খায় না, জলপান করে না, মলমূত্রাদি ত্যাগ করে না—নিশ্বাসে অক্সিজেন প্রয়োজন হয় খুব কম। মহাকাশ-জয়ের একটি আবশ্যিক পর্যায় হিসাবে তাই ঐ নিয়ে গবেষণা করছিলেন কয়েকজন জীববিজ্ঞানী। গত দশকে তাঁরা সফলকাম হয়েছেন। এখন কৃত্রিম পদ্ধতিতে ঐ 'হাইবারনেকুলাম'-চেম্বারে, অর্থাৎ মহানিদ্রাকক্ষে, কোনো মানুষকে পাঁচ-সাত বছর একাদিক্রমে ঘুম পাড়িয়ে রাখা যায়।

*　　*　　*

: ডক্টর রয়, আপনার শরীর এখন খাদ্যপানীয় চাইছে। আপনার ডান হাতের কাছে ঐ যে সবুজ রঙের বোতামটা আছে, সেটা দয়া করে টিপে দেবেন।

হাসি পেল রয়ের। 'দয়া করে টিপে দেবেন।' যন্ত্রের আবার ভদ্রতাবোধ? স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রটা—যে ওকে অনুরোধ করছে—সেটা ওদের মহাকাশযানেরই একটা অঙ্গ। সেটাতে এমন ব্যবস্থা করা আছে যাতে শিপটাইম ৯—২১০—৩৬১২০-তে আপনা থেকেই সদ্য-জাগরিত নভোচারীকে সে নির্দেশ দিয়ে যাবে। তাই যন্ত্রটা ভদ্রতা করলেও বব্ 'ধন্যবাদ' জানালো না ঐ বধির যন্ত্রটাকে। হাত বাড়িয়ে নির্দেশিত বোতামটা টিপে দিল। তৎক্ষণাৎ স্টেনলেস্ স্টিলের একটা কলের হাত দেওয়াল-গাত্র থেকে এগিয়ে এল। সে হাতে ফিডিং বোতল জাতীয় একটা প্লাস্টিকের পাত্র। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের ধেড়ে খোকা এবার সেই ফিডিং বোতল থেকে চুকচুক করে উষ্ণ পানীয়টা থেকে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে।

আরও পাঁচ মিনিট পরে বব্ উঠে বসল। বেল্ট-এর বাঁধনগুলো খুলে দেয়। বোতাম টিপে নিদ্রাকক্ষের ঢাকনাটাও খুলে ফেলে। বেরিয়ে আসে মহাকাশযানের কেন্দ্রীয় কক্ষে, যে কক্ষটা চক্রযানের মতো ধীরে ধীরে পাক খাচ্ছে—ওদের কিছুটা অভিকর্ষ দান করতে। আস্তে আস্তে ও এগিয়ে আসে পাইলটের কক্ষে। সেখানে বসেছিল ওর দীর্ঘদিনের বন্ধু ও সহচর ডক্টর ওয়াম্বাসী। নিকষকালো নিগ্রো যুবক। বব্‌কে দেখতে পেয়ে ঝকঝকে একসার দাঁত বার করে হেসে বললে, সুপ্রভাত। কাল রাতে ভালো ঘুম হয়েছিল তো?

কাল রাত! পাঁচ বছর ব্যাপী দীর্ঘ সুষুপ্তির নাম—'কাল রাত?' সে তো কালরাত্রি। বব্ বললে, তোর ঘুম ভেঙেছে কতক্ষণ?

: ৩৫৫২০-তে অর্থাৎ দশ মিনিট আগে। তোর জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।

: সনফেবিচটা ওঠেনি?

ওয়াম্বাসী তার দীর্ঘ আয়ত চোখ দুটি বন্ধুর দিকে মেলে নির্বাক বসে রইল। জবাব দিল না। তখনই, ঠিক তখনই ববের মনে পড়ে গেল নিদারুণ সত্যটা। ইলিংওয়ার্থ নেই! মারা গিয়েছে। পাঁচ বছর আগে। ওরা রওনা হয়েছিল তিনজন; ফিরছে দুজন। যাত্রার দিনে সারা পৃথিবী থেকে অসংখ্য অভিনন্দন বাণী পেয়েছিল ওরা তিনজন। দিনদশেক ক্রমাগত টি. ভি. স্ক্রিনের সামনে দাঁড়াতে হয়েছিল। প্রত্যাবর্তন মুহূর্তেও আয়োজনটা কী জাতের হবে তা আন্দাজ করতে পারে। নিউ-ইয়র্কে ওরা প্রবেশ করবে বিজয়ী রোমান সেনাপতির মতো—কিন্তু ইলিংওয়ার্থের অনুপস্থিতি সেই বিপুল আনন্দ উৎসবের মাঝখানে একটা কাঁটা হয়ে জেগে থাকবে! ইলিংওয়ার্থের মৃতদেহকে তারা ভাসিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে—মহাকাশে। শনিগ্রহের অমোঘ আকর্ষণে সে চলে গেছে অজানা রাজ্যে।

: আয়াম সরি!—আসন গ্রহণ করতে করতে বব্ বললে।

: না, দুঃখিত হবার কিছু নেই। আমারও মাঝে মাঝে মনে হয়, জানিস, ও হতভাগা মরেনি। মনে হয়, এখনই যেন দু-নম্বর কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে সনফেবিচটা আমার পিঠে একটা বিরাশিসিক্কা থাপ্পড় মেরে বলবে—হাই নিগার! হাউ গোজ দ্য ওয়ার্ল্ড?

ওরা তিনজন ছিল প্রাণের বন্ধু। বাস্টার্ড রয়, নিগার ওয়াম্বাসী আর সনফেবিচ ইলিংওয়ার্থ। একই বয়সি। এ মহকাশযানে রওনা হওয়ার আগে দীর্ঘদিন একই ট্রেনিং ক্যাম্পে একত্রে শিক্ষানবিশীর পালা সাঙ্গ করে এসেছে। বন্ধুত্বটা এত গাঢ় ছিল যে, ওরা দুই শ্বেতকায় বন্ধু ওকে ডাকতো 'নিগার' বলে—ওয়াম্বাসী রাগ করত না। ভালুকের মতো সাদা দাঁত বের করে হাসত। তেমনি ও বব্‌কে ডাকত 'বাস্টার্ড' বলে, আর ইলিংওয়ার্থকে 'সনফেবিচ' নামে। বব্ রয়ের সত্যই পিতৃপরিচয় নেই, কিন্তু সেটাকে গোপন করার মানসিকতাও নেই ওর। একবিংশতি শতাব্দীর মার্কিন সমাজে ওটা কোন কথাই নয়। বস্তুত বব্ বুঝে উঠতে পারে না—ওটাকে ওয়াম্বাসী এত গুরুত্ব দেয় কেন! বব্ বলত, আচ্ছা সত্যি করে বল তো নিগার, 'বাস্টার্ড' কথাটা কি গালাগাল? তাহলে আমাকে 'বাস্টার্ড' নামে ডেকে তুই এতটা খুশিয়াল হয়ে উঠিস কেন?

: তুই বা আমাকে 'নিগার' নামে ডেকে এত খুশিয়াল হয়ে উঠিস কেন?

: সেটা গালাগাল বলে নয়, তুই 'নিগার', তাই তোকে 'নিগার' ডাকি।

: একই কথা! তুই বাস্টার্ড, তাই তোকে বেজন্মা বলে ডাকি। তবে হ্যাঁ, আমার মনে হয়—তোর-আমার দুজনেরই একই অবস্থা। আমরা দুজনেই গত শতাব্দীর ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী অবচেতন মনের তাগিদে ঐ আচরণটা করি।

: কী রকম?—কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইত বব্।

: একদিন শ্বেতাঙ্গ সমাজ এই কৃষ্ণবর্ণের জন্য আমাদের ঘৃণা করত—ধর শতখানেক বছর আগেও। তখন তোদের সমাজের লোকেরা আমাদের উল্লেখ করত 'নিগার' বলে। আমরা আলাদা এলাকায় অন্ত্যেবাসীর মতো থাকতাম—শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে মেলামেশাটা হত ওপর ওপর। কোনো নিগ্রো যদি কোন সাদা-চামড়া-মেয়ের প্রেমে পড়ত, তাহলে তাকে ঠ্যাঙানি খেতে হত। এখন অবশ্য অবস্থা অত খারাপ নয়, তবু আজও তোরা মনের গভীরে—

বাধা দিয়ে বব্ বলত, ওটা তোর একটা ইন্‌ফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স, অহৈতুকী হীনম্মন্যতা। এখন সারা পৃথিবীতে, বিশেষ করে আমেরিকায়, সাদা-কালোয় কোনও তফাত নেই। না, থাক, তর্ক করিস না। বরং বল, তাহলে তুই আমাকে 'বাস্টার্ড' নামে ডাকিস কেন?

: একই কারণে। আজ থেকে তিন-চার শ' বছর আগে তোদের শ্বেতকায় পূর্বপুরুষেরা আফ্রিকা অঞ্চল থেকে আমাদের পূর্বপুরুষদের ধরে আনত। তোরা তখন দক্ষিণে আর পশ্চিমে নূতন রাজ্য আবিষ্কারে মেতেছিস—খেতে-খামারে, তুলার চাষে, কলের তাঁতে মজদুরের প্রচণ্ড চাহিদা। তোরা ঐ কালা আদমিদের ক্রীতদাস করে রাখতিস। বংশবৃদ্ধি হলেই তোদের লাভ—তাই পুরুষ-নারীর সহবাসে তোদের পূর্বপুরুষেরা আপত্তি করতেন না; কিন্তু নিগ্রোদের বিবাহ করবার অধিকার ছিল না।

: সে আবার কী? বিয়ে দিলে আপত্তি কিসের?

: শ্বেতাঙ্গ মালিকরা ভাবত—বিয়ে করলেই একটা মমতা জন্মায়, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র-কন্যা এই সব চিন্তা আসে। তখন তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেশের বিভিন্ন খামারে প্রয়োজনমতো প্রেরণ করায় অসুবিধা। তাই তারা বলত—ওয়েল নিগার, বাচ্চা পয়দা কর, আমরা স্লেভ-মার্কেটে গিয়ে তাদের বিক্রি করব; কিন্তু বিবাহ—নৈব নৈব চ।

বব্ রয় নির্ভেজাল বৈজ্ঞানিক—ইতিহাস, সাহিত্য, ললিতকলার ধার ধারে না। ওয়াম্বাসীর পরিবেশিত তথ্যটা তার জ্ঞানসীমার বাইরে। প্রতিবাদ করে বলত, দূর! ও সব বাজে গুজব। নিগারদের প্রচার।

ওয়াম্বাসী হেসে বলত, তুই 'আঙ্কল টমস্ কেবিন'-এর নাম শুনেছিস?

: নেভার হার্ড অব ইট! কোনো ফিল্‌ম? টি. ভি-তে দেখিয়েছে?

ওয়াম্বাসী হতাশ হয়ে মাথা নাড়ে। এই হচ্ছে একবিংশ শতাব্দীর প্রতিনিধি। ওরা ধৈর্য ধরে বই পড়তে পারে না! বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে ওদের যেটুকু পরিচয় তা ঐ সেলুলয়েডের মাধ্যমে। বললে, তাহলে আমার কথাটা মেনে নে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা সবাই ছিল বেজন্মা—আমরা সেই বেজন্মার বংশধর। যেহেতু আমাদের আদিপুরুষদের বিবাহ করবার অধিকার ছিল না। মজা হচ্ছে, এই তিন-চার শ' বছরে চাকা একশ আশি ডিগ্রি ঘুরে গেছে। আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ সমাজ আজ বিবাহ-বন্ধনটাকে একটা অহেতুক বোঝা বলে মনে করছে, পারিবারিক বন্ধনটাকে প্রিমিটিভ ভাবছে। তোরা বিবাহের বদলে 'টেম্পোরারি ম্যারেজ কন্ট্রাক্ট' আইন পাস করিয়ে নিয়েছিস। অথচ রক্ষণশীল মার্কিন নিগ্রো-সমাজ এখনও বিবাহের বন্ধনটাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। তাই হয়তো অবচেনতার তাগাদায় আমিও তোকে ঔ নামে ডেকে আনন্দ পাই।

বব্ প্রসঙ্গ বদলে বললে, টেপ্‌টা শুনেছিস? গত পাঁচ বছরে পৃথিবী কতটা বুড়িয়েছে?

ওয়াম্বাসী বললে, না। এই তো মিনিট-দশেক আগে এসে বসেছি। টেপ্‌টা চালাই?

একটা বোতাম টিপে দিল সে। টেপ-রেকর্ডারের স্পুলটা নিঃশব্দে পাক খেতে থাকে।

স্থির হয়েছিল, ওরা মহানিদ্রা-কক্ষে প্রবেশ করার পর পৃথিবী থেকে প্রতি সপ্তাহে একটি করে নিউজ বুলেটিন আসবে এবং স্বয়ংক্রিয় শব্দ-গ্রাহক যন্ত্রে তা সঞ্চিত হয়ে থাকবে। যাতে পাঁচ বছর পরে ঘুম থেকে উঠে ওরা সেই টেপ্‌টা বাজিয়ে গত পাঁচ বছরের সংবাদের চুম্বকসার শ্রবণ করে ওয়াকিবহাল হতে পারে। আশ্চর্য! স্পুলটা নিঃশব্দে ঘুরেই গেল। টুঁ শব্দটি করল না।

: ব্যাপার কী বল তো? কোনো কিছুই তো রেকর্ড হয়নি?

: তাই তো দেখছি! ওয়াম্বাসী টেপ্‌টাকে উল্টো দিকে রিওয়াইন্ড করে আবার চালু করল। শেষ শব্দ যা রেকর্ড হয়ে আছে তা ওদেরই কণ্ঠস্বর : হ্যালো মিশন-কন্ট্রোল! ফ্রন্টিয়ার থেকে বলছি। ক্রমিক সংখ্যা ৭৬২৮। প্রোগ্রাম মতো ফ্রন্টিয়ার এই শেষবারের জন্য গতিমুখ পরিবর্তন করল। এবার আমরা পৃথিবীর দিকে ফিরে চলেছি। এখন আমরা দুজন মহানিদ্রা-কক্ষে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। স্বয়ংক্রিয় কম্পুটার শুধু পাহারায় জেগে রইল। গুডবাঈ এ্যান্ড গুডনাইট!

ব্যস। আর কিছু নয়। এরপর টেপ্‌-রেকর্ডারের নিঃশব্দ চক্রাবর্তন!

বব্ বলে, নিশ্চয় কোনো যান্ত্রিক গণ্ডগোল হয়েছে। গত পাঁচ বছরের মধ্যে মিশন-কন্ট্রোল কোনও 'মেসেজ' পাঠায়নি—এ হতেই পারে না!

ওয়াম্বাসী বলে, কিন্তু যান্ত্রিক গণ্ডগোল হলে তা ত্রুটি-নির্ধারক যন্ত্রে ধরা পড়ত।

: তা ঠিক! আচ্ছা, আমরা এখন কোথায় আছি?

ওয়াম্বাসী ইলেকট্রনিক কম্পুটারের শরণাপন্ন হয়। মুহূর্তমধ্যে অঙ্ক কষে কম্পুটার ওদের জানিয়ে দিল সৌরমণ্ডলে ওদের বর্তমান অবস্থানটা। ওয়াম্বাসী বললে, মঙ্গলের কক্ষপথ আমরা অনেক আগেই অতিক্রম করেছি। পৃথিবীর দূরত্ব এখন সাড়ে-চার-মিনিট। তার মানে বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যেই আমরা পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্বে পৌঁছে যাব।

: পৃথিবীকে একবার ধর তো?

ওয়াম্বাসী টি. ভি. যন্ত্রের কতকগুলি বোতাম টিপে মিশন-কন্ট্রোলের বেতার তরঙ্গকে ধরবার চেষ্টা করল। আশ্চর্য! এবারও কোনও শব্দ ভেসে এল না। এটা কেমন করে সম্ভব? পৃথিবী জানে, অন্তত মিশন-কন্ট্রোল সন্দেহাতীতভাবে জানে, ওরা এতক্ষণে মহানিদ্রা-অন্তে জেগে উঠেছে। গত পাঁচ বছর ধরে মিশন-কন্ট্রোল কেন নীরব হয়ে আছে তার কোনো যুক্তি-নির্ভর হেতু অবশ্য নেই; কিন্তু এই মুহূর্তটিতে শুধু পৃথিবী নয়—চাঁদ, মঙ্গল এবং একাধিক স্কাই-ল্যাব কি উদ্‌গ্রীব হয়ে ওদের কণ্ঠস্বরের জন্য অপেক্ষা করছে না?

: হ্যালো মিশন-কন্ট্রোল! দিস্ ইজ্ ফ্রন্টিয়ার। তোমরা আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছ? ওভার।

নয় মিনিট অতিক্রান্ত হয়ে গেল। মিশন-কন্ট্রোল সাড়া দিল না।

: ব্যাপার কী! আচ্ছা চাঁদ কিংবা মঙ্গলকে ধর তো?

পর্যায়ক্রমে ওয়াম্বাসী পৃথিবীর একাধিক শক্তিশালী মহাকাশ স্টেশনকে ধরবার চেষ্টা করল। চন্দ্রলোকের ক্লেভিয়াস ও কোপারনিকাস্ বেস্-এ দুটি প্রচণ্ড শক্তিশালী বেতার-প্রেরক যন্ত্র বসানো হয়েছে বছর বিশ-পঁচিশ আগে। তার ফ্রিকোয়েন্সিও ওদের মুখস্থ। তারও ধরে দেখবার চেষ্টা করল। কিন্তু কোথাও কোনো শব্দ নেই। সৌরমণ্ডলের এ অংশ অপরাংশের মতোই অদ্ভুতভাবে স্তব্ধ।

বব্ গম্ভীর হয়ে যায়। বলে, না, এ হতে পারে না। একমাত্র সমাধান আমাদের বেতার-গ্রাহক যন্ত্রটা গন্ডগোল করছে। সেটা নিশ্চয় বছর-পাঁচেক আগেই অকেজো হয়ে গেছে। গত পাঁচ বছরে পৃথিবী কোনো সংবাদ পাঠায়নি, এ হতে পারে না।

ওয়াম্বাসী বলে, পাঁচ বছরের কথা ছেড়ে দে। এখন কেউ কোনো শব্দ করছে না কেন? কোনো রেডিয়ো স্টেশনে কোনো প্রোগ্রাম হচ্ছে না কেন?

: বললাম তো! এ সমস্যার একটিমাত্র সমাধান। আমাদের বেতার-গ্রাহক যন্ত্রটা বিকল হয়ে পড়ে আছে।

ওয়াম্বাসী ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে থাকে।

: কী? ঘাড়-নাড়া বুড়োর মতো মাথা দোলাচ্ছিস যে?

: বললাম তো। বেতার-গ্রাহক যন্ত্রটা খারাপ হয়ে গেলে ফল্ট-ডিটেক্টার যন্ত্রে ঐখানে লালবাতিটা তা আমাদের জানিয়ে দিত।

: তাহলে বলব, ত্রুটি-নির্ধারক যন্ত্রটাও অকেজো হয়ে পড়ে আছে!

ওয়াম্বাসী জবাব দেয় না। দুহাতে মুখ ঢেকে বসে থাকে।

বব্ চিৎকার করে ওঠে, ফর হেভেনস্ সেক! যা হোক কিছু বল্! তুইও যে মিশন-কন্ট্রোলের মত 'বম্' মেরে গেলি?

ওয়াম্বাসী ধীরে ধীরে মুখটা তোলে। বলে, কী কথা বলব বব্? যা বলব, তা তুইও ভাল রকম জানিস্। পর পর তিন সেট ত্রুটি-নির্ধারক যন্ত্র লাগানো আছে ফ্রন্টিয়ারে। একটা অকেজো হলেই দ্বিতীয়টা চালু হবে; সেটা বিগড়োলে তৃতীয়টা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে চালু হবে। তুই জানিস না?

বব্ অসহিষ্ণুর মতো বলে ওঠে, জানি, জানি, সব জানি। কিন্তু এক্ষেত্রে কি আমাদের ধরে নিতে হবে না যে, তিন-তিনটে ত্রুটি-নির্ধারক যন্ত্রই একযোগে বিকল হয়ে পড়েছে?

ওয়াম্বাসী রাগ করে না। বুঝতে পারে তার বন্ধুর মনের অবস্থা। বলে, এ ছাড়া যখন বিকল্প কোনো সমাধান নেই তখন সেই 'মিলিয়ান-টু-ওয়ান' সম্ভাবনাটাই মেনে নিতে হচ্ছে। অর্থাৎ আমাদের তিনটি বেতার গ্রাহক যন্ত্র এবং তিনটি ত্রুটিনির্ধারক যন্ত্র একযোগে বিকল হয়ে গিয়েছে।

* * *

বাহাত্তর ঘন্টা পরের কথা।

পৃথিবী থেকে এখন ওদের দূরত্ব পৌনে চার লক্ষ কিলোমিটার। প্রায় যে দূরত্বে একমুখী চন্দ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। এ কদিন ওরা দুজনে কথা বলেছে খুব কম। ওরাও যেন যন্ত্রে পরিণত হয়ে গিয়েছে। যেন দুজনেই মনে মনে জানে, ঐ নিতান্ত অদ্ভুত কাকতালীয় দুর্ঘটনা ছাড়া—যাকে ওয়াম্বাসী বলেছিল 'মিলিয়ান-টু-ওয়ান-চান্স', কোটিতে গুটিক—সেটা ছাড়া এই বিশ্বব্যাপী স্তব্ধতার একটা বিকল্প সমাধানও হতে পারে। অর্থাৎ ওদের বেতার যন্ত্রটা ঠিকই আছে—কিন্তু বিশ্ব-চরাচর স্তব্ধ হলে সে শব্দ ধরবে কোথা থেকে? এই যুক্তিটার সূত্র ধরে যদি উৎসমুখের দিকে এগিয়ে চলতে থাক তাহলে শেষ পর্যন্ত এমন একটা মহাপ্রলয়ঙ্করী, এমন একটা নারকীয় পরিস্থিতির সম্মুখে উপনীত হতে হয় যা সজ্ঞান চিন্তায় ভাবাই যায় না। উচ্চারণ করা চলে না এমন কি এই মহাকাশযানের নির্জনতম কক্ষে, প্রাণের বন্ধুর কাছেও। দুজনেই জানে—কথাটা দুজনেই জানে। বব্ অনেকবার ঐ নিকষকালো মানুষটার আয়ত চোখের মণিতে সেই প্রলয়ঙ্করী কথাটার প্রতিচ্ছায়া ভেসে উঠতে দেখেছে; উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করেছে, আর কোনো বিকল্প সম্ভাবনার কথা মনে হচ্ছে?

ওয়াম্বাসী ধীরে ধীরে শিরশ্চালনে অস্বীকার করেছে।

আবার ওয়াম্বাসী হয়তো লক্ষ করেছে—দু-হাতে চুলের মুঠি ধরে বসে থাকা ববের মুখে ফুটে উঠেছে মহামৃত্যুর এক ভয়ঙ্করী প্রতিচ্ছায়া। শিউরে উঠে বলেছে, কী ভাবছিস বল তো?

বব্ চমকে উঠে আত্মস্থ হয়েছে। বলেছে, ভাবব আবার কী? যন্ত্রগুলোই বিকল হয়ে গিয়েছে। আর কী হতে পারে?

অগত্যা দুজনেই চেষ্টা করেছে—বন্ধুর মনে প্রফুল্লতা ফিরিয়ে আনতে। অনিবার্য চিন্তাটাকে চাপা দিতে পুরানো দিনের স্মৃতির রোমন্থন করেছে। ওদের ট্রেনিং ক্যাম্পের জীবনের কথা। যাত্রা-মুহূর্তে ওদের সংবর্ধনার কথা। যে সনফেবিচের প্রসঙ্গ তার মৃত্যুর পরে ওরা আদৌ আলোচনা করেনি তার কথা। বব্ বিবাহিত—মানে, 'এক্সপেরিমেন্টাল ম্যারেজ'—পরীক্ষামূলক বিবাহ। মহাকাশে ভেসে পড়ার আগে বছর দুই ক্লারা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে সে সাময়িক বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। কন্ট্রাক্ট এতদিনে শেষ হয়েছে। ক্লারা হয়তো, হয়তো কেন নিশ্চয়ই, আর কারও ঘরনি। ওয়াম্বাসী অবিবাহিত। দেশে, টেক্সাস অঞ্চলের এক খামারবাড়িতে আছে ওর বাবা, মা, দাদা, ছোট বোন। একটি ভ্রমরকালো

মেয়ের সঙ্গে ওর প্রেমপর্বও চলছিল—ও মহাকাশ যাত্রায় রওনা হয়ে পড়ায় বিবাহটা হয়নি। এতদিনে সে মেয়েটিও নিশ্চয় আর কারো সন্তানের জননী হয়েছে। তখন তার বয়স ছিল একুশ, এতদিনে প্রায় ত্রিশ। এই সব গল্পই করেছে দুজনে। এমনকি প্রত্যাবর্তন-মুহূর্তে ওদের কীভাবে সংবর্ধনা জানানো হবে—সে কথাটাও আর আলোচনা করেনি।

ওয়াম্বাসী দূরবিনে চোখ লাগিয়ে বসেছিল। বললে, মাত্র আটশ' কিলোমিটার অল্টিচুড এখন। পৃথিবীকে দেখ্ একবার—

বব্ বেতার-গ্রাহক যন্ত্রটার কাঁটাটাকে সহস্রতমবার ধীরে ধীরে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে নিয়ে যেতে ব্যস্ত ছিল। কোথাও কোনো সাড়া নেই। এই আটশ' কিলোমিটার দূরত্বে পৃথিবীর সংখ্যাতীত রেডিয়ো স্টেশনের কলকণ্ঠ ওদের বেতারে মুখরিত হয়ে ওঠার কথা। অথচ আশ্চর্য। অবাক পৃথিবী অবিশ্বাস্য রকমে নীরব। বব্ বললে, কী দেখ্ছিস? ওটা পৃথিবীই তো? আমাদের লক্ষ্যমুখ অজান্তে কোনো রকমে ঘুরে যায়নি তো? ওটা অন্য কোনো গ্রহ নয়?

: তাই তো বল্ছি। তাকিয়ে দেখ একবার।

বব্ দূরবিনের আই-পিসে চোখ লাগালো। না, কোনো ভুল নেই।—পৃথিবীই। এখন আর আলোকবিন্দু নয়। খালিচোখেই পৃথিবী আধখানা আকাশ আড়াল করে রেখেছে। দূরবিনের কাছে তার রূপরেখা স্পষ্ট দেখা যায়—পাহাড়, সমুদ্র, এমনকি নদী। পৃথিবীর ওপর একটা ঘন মেঘের নীলাভ আস্তরণ আছে বটে, তবু সূর্যালোকিত অংশটার অনেকখানি আবহাওয়ার ছিদ্র ভেদ করে দেখা যাচ্ছে। পরিচিত মানচিত্র। এশিয়ার পূর্বাংশের কিছুটা আর অস্ট্রেলিয়া। তবে মানচিত্রে দেখা মার্কেটার-প্রজেকশনের পৃথিবীর সঙ্গে কিছুটা প্রভেদ আছে। টিশিয়ানের মডেল যেন এল গ্রেকোর তুলিতে ধরা পড়েছে। সবকিছুই একটু লম্বাটে ধরনের। বব্ অনেকক্ষণ ঐ মানচিত্রটার দিকে তাকিয়ে বললে, আশ্চর্য! অন্ধকার অংশটা তাহলে আমেরিকার পশ্চিম উপকূল। এই আটশ' কি.মি. দূরত্ব থেকেও দেখতে পাচ্ছি না—?

: কী দেখবি? ওখানে তো রাত্রি!

: হ্যাঁ, তাই তো দেখতে চাইছি! ঐ ঘনান্ধকার অংশটায় আছে সানফ্রানসিস্কো, লস্ এ্যাঞ্জেলেস, হলিউড, ডালাস! কোথায় তার রোশনাই?

: তার মানে কি বুঝতে হবে—? ওয়াম্বাসী মাঝপথেই থেমে যায়।

বব্ ধমকে ওঠে, ওসব অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার কোনো অর্থ হয় না। হয়তো ওদিকটায় ঘন মেঘ আছে—তাই আলো দেখা যাচ্ছে না। সে যাই হোক, এখন কী করা যায়?

: আর কাছে না গিয়ে এই দূরত্বেই বারকয়েক পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে দেখা যেতে পারে।

অগ্যতা ওরা একই দূরত্বে থেকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে। ওয়াম্বাসীর মনে পড়ল, প্রায় ষাট বছর আগে এই দূরত্বেই বিশ্বের প্রথম নভোচারী উরি গ্যাগারিন প্রথম পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছিলেন। ওরা দুজন কি বিশ্বের শেষ নভোচারী—মাঝপথেই চিন্তাটাকে অসমাপ্ত রাখল ওয়াম্বাসী।

কিন্তু বব্ পারল না। তার বোধ করি মনে হল, অনিবার্য দ্বিতীয় বিকল্প সম্ভাবনাটার বিষয়ে আলোচনা করার সময় হয়েছে। মিথ্যা সৌজন্যবোধ। মিথ্যা সঙ্কোচ। যদি তাই হয়ে থাকে তবে—

বললে, ওয়াম্বাসী, এমনও তো হতে পারে—মানব-সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে!

: শাট আপ! য়ু বাস্টার্ড!—প্রচণ্ড ধমকে ওঠে ওয়াম্বাসী।

বব্ রাগ করে না। বুঝতে পারে, ওয়াম্বাসী নিজেকেই ধমক দিচ্ছে। নীরবে প্রতীক্ষা করে সে। ওয়াম্বসী নিঃশব্দে একবার কক্ষটা পরিক্রমা করে আসে। এখন ওদের গতিবিধি অনেকটা স্বাভাবিক। ওয়াম্বাসী ফিরে এসে ওর মুখোমুখি দাঁড়ায়। বলে, ওয়েল! কথাটা আমারও মনে হয়েছে। হয়তো তাই ঘটেছে।

: কিন্তু মাত্র পাঁচ বছরে? পৃথিবীর সাড়ে ছয় শত কোটি মানুষ! চাঁদ, মঙ্গল—

: বুঝলাম। কিন্তু এর মানে কী? সারা পৃথিবীতে কোনো শহরে আলো জ্বলছে না। কোনো রেডিয়ো স্টেশন সজীব নেই! আর কী হতে পারে?

দু-হাতে চুলের মুঠি চেপে ধরে বসে ছিল বব্! দুটি আর্ত চোখ তুলে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, জানি না—আমি জানি না! বিশ্বাস কর, আমি জানি না।

ওয়াম্বাসী বলতে থাকে, এত বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে কী কী কারণে? সূর্য যে নোভায় রূপান্তরিত হয়নি তা তো দেখতেই পাচ্ছি। হোক প্রাণহীন, তবু পৃথিবী টিকে আছে, আমরা বেঁচে আছি। সুতরাং সূর্যের তাপ বিকিরণ ছন্দে কোনো তারতম্য ঘটেনি। ফলে একটি মাত্র সমাধানই হতে পারে বব্। এই পাঁচ বছরের ভেতর সেই দীর্ঘদিন ঠেকিয়ে রাখা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধটা ঘটে গেছে। শতাব্দী-সঞ্চিত থার্মোনিউক্লিয়ার মারণাস্ত্রে—

: না! সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো বব্ রয়। তার দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ, যেন এখনই মেরে বসবে ঐ কালো নিগারটাকে। বললে, না, তা হতে পারে না। সেক্ষেত্রে চাঁদে কিংবা মঙ্গলে মনুষ্য-সভ্যতা বিলুপ্ত হত না। ঐ বাস্টার্ডদের থার্মোনিউক্লিয়ার বম্ব যত শক্তিশালীই হক—চাঁদে বা মঙ্গলে পৌঁছতে পারে না।

ওয়াম্বাসী ওকে মনে করিয়ে দিল না—এই একবিংশ শতাব্দীর সুসভ্য সমাজে 'বাস্টার্ড' শব্দটা কোনো গালাগাল নয়। সে বললে, হয়তো চাঁদ এবং মঙ্গলও এ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল।

: না। তাছাড়া ভেবে দেখ্ ওয়াম্বাসী—বিশ্বযুদ্ধ হয় কেন? মুষ্টিমেয় কিছু ধনকুবের যুদ্ধবাজ তাদের স্বার্থে যুদ্ধ বাধায়—মাঝে মাঝে যুদ্ধ না হলে তাদের মারণাস্ত্র নির্মাণের কারখানা অচল হয়ে পড়ে। যুদ্ধে তারা নিজেরা কিন্তু কোনোদিনই মরে না—কারণ তারা বসে থাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক অনেক দূরে। মানব সভ্যতার ইতিহাস তার সাক্ষী। এমন আত্মঘাতী যুদ্ধ তারা কিছুতেই বাধতে দেবে না, যাতে তারা নিজেরাই উজাড় হয়ে যাবে!

ওয়াম্বাসী বলে, তাহলে তৃতীয় সম্ভাবনার কথা ভেবে দেখতে হয়।

: সেটা কী?

: তুই এইচ. জি. ওয়েল্স-এর 'দ্য ওয়ার অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস্' পড়েছিস?

বব্ ধমকে ওঠে, টু হেল উইথ এইচ. জি. ওয়েলস্! না, তার নামই শুনিনি। কী বলতে চাইছিস স্পষ্ট করে বলবি?

ওয়াম্বাসী তার আশ্চর্য চোখ জোড়া মেলে বললে, সূর্য যে নোভায় রূপান্তরিত হয়নি এটা প্রত্যক্ষ সত্য। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে এভাবে গোটা মানব-সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে পারে না—কথাটা তোর। আর একটা সম্ভাবনা—ধর এই গ্যালাক্টিক সিস্টেমে পাক খেতে খেতে গোটা সৌরজগৎ এমন একটা বিষবাষ্পের বলয়ের মধ্য দিয়ে চলে গেল যেখানে জীব বাঁচতে পারে না। তাও মেনে নিতে পারি না—কারণ সেক্ষেত্রে চাঁদ এবং মঙ্গল এভাবে মৃতদেহে পরিণত হত না, তারা শীতাতপ-বাষ্প-নিরোধক কৃত্রিম আবহাওয়ায় বাস করে। পৃথিবীতেও নিশ্চয় সেক্ষেত্রে জীবন এভাবে নিঃশেষিত হত না। এ দুর্দৈবকে প্রতিহত করবার ক্ষমতা মুষ্টিমেয় কিছু সভ্য এবং উচ্চকোটির মানুষের নিশ্চয়ই থাকত। তারা মরত না। তারা আমাদের বেতার-বার্তা ধরত এবং প্রত্যুত্তর করত।

ওয়াম্বাসী একটু দম নেবার জন্য থামতেই বব্ বলে ওঠে, পাণ্ডিত্য জাহির তো হল, এবার আসল কথায় আসবি?

: একমাত্র সমাধান— 'ওয়ার অফ্ দ্য ওয়ার্ল্ডস্'! সৌরমণ্ডলের বাইরে থেকে হয়তো আমাদের চেয়েও বুদ্ধিমান কোনো জীবের আবির্ভাব ঘটেছে। তারাই নিঃশেষে ধ্বংস করেছে মানব সভ্যতা—পৃথিবীতে, চাঁদে, মঙ্গলে, অসংখ্য স্কাইল্যাবে! হয়তো বিশ লক্ষ বছরের বিবর্তনের প্রতিনিধিত্ব করতে 'মানুষ' নামে বেঁচে আছি শুধু তুই আর আমি!

কয়েকটি মুহূর্ত নির্বাক থাকে বব্ রয়। ব্যাপারটা ঠিক মতো অনুধাবন করতে। তারপর চিৎকার করে ওঠে : এ্যাবসার্ড!

: কেন অসম্ভব?—জানতে চায় ওয়াম্বাসী।

: একাধিক যুক্তিতে। প্রথম কথা—ভিন্ন নক্ষত্রের কোনো গ্রহবাসী যদি পৃথিবীতে আসে তাহলে

তারা সংখ্যায় কতজন হতে পারে? দু-দশ জন? একশ জন? দূরত্বটা একবার ভেবে দেখ! যতই শক্তিশালী হক, ঐ মুষ্টিমেয় মানুষ ছয়শত কোটি পৃথিবীবাসীকে নিশ্চিহ্ন করতে পারে না। দ্বিতীয় কথা—সারা পৃথিবী, মায় চাঁদ আর মঙ্গলকে তারা ধ্বংস করতে চাইবে কেন? সামান্য ঐ কজন লোকের পক্ষে এতটা জায়গার প্রয়োজন হতেই পারে না। তারা যদি বেশি ক্ষমতাশালী হয়, তাহলে আমাদের ওপর কর্তৃত্ব করতে চাইতে পারে; কিন্তু রাজা হতে হলে কিছু প্রজারও তো দরকার? সুতরাং যদি ধরেও নিই যে, মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করবার ক্ষমতার তারা অধিকারী, তবু তারা সে ক্ষমতাকে প্রয়োগ করত না। পৃথিবীকে ক্রীতদাসে পরিণত করত।

: আর তারা যদি সংখ্যায় মাত্র দু-চারশ জন না হয়! ধর তারা যে ভিন্ন নক্ষত্রের গ্রহে বাস করছিল, কোনো কারণে সেটা আর বাসোপযোগী না হওয়ায় তারা দলে দলে—হাজারে হাজারে, লাখে লাখে রকেট নিয়ে পৃথিবীতে উপনিবেশ স্থাপন করতে এসে থাকে?

: দশ-বিশ-ত্রিশ লাইট ইয়ার পাড়ি দিয়ে? কত হাজার বছর সময় লাগবে—

বাধা দিয়ে ওয়াম্বাসী বলে, হিসাবটা তুই একবিংশ শতাব্দীর মনুষ্য বিজ্ঞানের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করছিস বব্। ওরা যদি আলোর গতি লাভ করে থাকে তবে ওদের সময় লাগবে মাত্র দশ-বিশ-ত্রিশ বছর।

বব্ বলে, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড! সেটা অসম্ভব। জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসাবে নয়, সেক্ষেত্রে সাধারণ যুক্তিবাদী মানুষ হিসাবে বলব, তাহলে আমরা পৃথিবীতে আলো জ্বলতে দেখতাম। বিজয়ী বীরদের বিজয়োৎসব। আমাদের বেতার সঙ্কেতের সাড়া পেতাম। ওরা হুকুম করত আমাদের আত্মসমর্পণ করতে।

: সুতরাং?

: সুতরাং হয় তুমি-আমি দুজনেই বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছি, কিম্বা দুজনেই স্বপ্ন দেখছি, অথবা এমন একটা কিছু ঘটেছে যার সমাধান তোর আমার আই. কিউ. দিয়ে পরিমাপ করা যায় না।

: না হয় তাই হল! এখন কী করতে চাস?

: কী করে পৃথিবীতে নামা যায় সেটাই হিসাব করে দেখা যাক।

কাজটা দুরূহ, অত্যন্ত দুরূহ—প্রায় অসম্ভব। কারণ এর কোনো প্রস্তুতি নেই। এমন কথা ছিল না। কথা ছিল—'ফ্রন্টিয়ার' পৃথিবীর কাছাকাছি এলে অবতরণের যাবতীয় ব্যবস্থা করবে মিশন-কন্ট্রোল। নভোচারীরা জানত না—ওরা কখন, কীভাবে, কোথায় নামবে। সেটা জানত মিশন-কন্ট্রোলের কয়েকটি ইলেক্ট্রনিক ব্রেন। ওদের কাজ ছিল শুধু বোতামটা টিপে দায়িত্বটা মিশন-কন্ট্রোলের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ায়। স্পেস-শিপের অবতরণ এখন এমনই ডাল-ভাত যে, ওরা এক বর্গকিলোমিটার টার্গেটের ভেতর সমুদ্রবক্ষে যে কোনো মহাকাশযানকে নামাতে পারে। সেখানে অপেক্ষা করে কোনো জাহাজ। নভোচারীদের তুলে আনা হয় হেলিকপটারে; আর মহাকাশযানটাকে গাধাবোটের মতো বেঁধে বন্দরে নিয়ে আসা হয়। এক্ষেত্রে ওদের মিশন-কন্ট্রোলের কোনো নির্দেশ পাওয়ার আশা নেই। ইলেকট্রনিক কম্পুটারের নির্দেশে সমুদ্রের কোনো নির্বাচিত অংশে প্রায় আন্দাজে অবতরণ করতে হবে। মহাকাশযানের পশ্চাদ্‌ভাগের ফিউসেলেজ-এ এখনও কিছুটা পারমাণবিক বিস্ফোরক আছে। ভীমবেগে যাতে সমুদ্রবক্ষে আছড়ে না পড়তে হয় তাই বিপরীতমুখী বিস্ফোরণে গতিবেগ সংযত করা এমন কিছু অসম্ভব নয়। প্রশ্ন সেটা নয়, প্রশ্ন—কোথায় নামবে? মহাসমুদ্র বিশাল—আদিগন্ত; কিন্তু মহাকাশের দৃষ্টিকোণ থেকে ওদের কাছে সেই মহাসমুদ্র একটা অতি ক্ষুদ্র গোষ্পদ। বুলস্-আইয়ের সূচিমুখ থেকে এক ডিগ্রি কোণের শতভাগের একভাগ ভ্রমক্রমে সরে গেলেই গন্তব্যস্থল কয়েক শত মাইল এদিক-ওদিক হয়ে যাবে। প্রশান্ত মহাসাগরের বদলে হয়তো আছাড় খেয়ে পড়বে হাওয়াই দ্বীপে; কিংবা মাইক্রোনেশিয়া-মেলানেশিয়ার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দ্বীপের কোনো কঠিন ভূ-ভাগে! অপরপক্ষে ম্যাপ দেখে যদি এমন কোনো সমুদ্রবক্ষ বেছে নেয় যার শত শত মাইলের ভেতর কোনো দ্বীপ নেই—তাহলেই বা সমাধান হচ্ছে কোথায়? ওদের মহাকাশযানে একটি ছোট লাইফবোট আছে, দাঁড়ও আছে—মাত্র কয়েক

ঘন্টা শুধু ভেসে থাকার আয়োজন। তার সাহায্যে মহাসাগর পাড়ি দিয়ে উপকূলভাগে পৌঁছানো যায় না।

সমস্যাটা ওরা দুজনেই জানে। তাই ববের আহ্বানে ওরাম্বাসী কোনো সাড়া দেয় না। দুই বন্ধু মুখোমুখি নির্বাক বসে থাকে। ফ্রন্টিয়ার অনিবার্যভাবে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে চলেছে।

* * *

: হ্যালো ফ্রন্টিয়ার!

আঁতকে ওঠে দুজনেই। একই সঙ্গে। না, মতিভ্রম নয়, তাহলে দুজনে একই খণ্ডমুহূর্তে ওভাবে শব্দতরঙ্গটা একসঙ্গে শুনতে পেত না। বেতার-যন্ত্রটা সক্রিয় হয়েছে। কথা বলছে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে দুজন একসঙ্গে।

: হ্যালো ফ্রন্টিয়ার! দিস্ ইজ নট, রিপিট নট, য়োর মিশন-কন্ট্রোল। প্লিজ ফলো আওয়ার ইন্সট্রাকশন্স। সুইচ অন টু মিশন-কন্ট্রোল ফর সেফ-ল্যান্ডিং। ওভার!

হ্যাঁ, ইংরাজি ভাষা। নির্ভুল উচ্চারণ : হ্যালো ফ্রন্টিয়ার! শোন। মিশন-কন্ট্রোল নই, আবার শোন, আমরা তোমাদের মিশন-কন্ট্রোল নই। তবু আমাদের নির্দেশ মেনে নাও। অবতরণের দায়িত্বটা আমাদের ওপর ছেড়ে দাও। সুইচ টিপে দাও।

দুই বন্ধু মুখ-তাকাতাকি করে। কথা নেই। বর রয়ই প্রথম বাকশক্তি ফিরে পেল। বেতারের যন্ত্রটাকে বললে, হু আর্ট দাউ?

এত দুঃখেও হাসি পেল ওয়াম্বাসীর। ওর মনে হল—বব্ তার মাতৃভাষাটাও ভুলে গেছে। সহজ সরল ইংরাজি ভাষাটা। সে যেন অর্ধসহস্রাব্দী আগেকার একটা শেক্সপীরিয়ান চরিত্র! ম্যাকবেথ যেন বেতারযন্ত্রের ভেতর ব্যাঙ্কোর ভূতটাকে আবিষ্কার করে বলছে : কে! কে তুমি?

পৃথিবী থেকে ওদের বেতার-দূরত্ব এখন নগণ্য। যেন টেলিফোনে কথা বলছে। বেতার যন্ত্রটা তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর করে, প্রশ্নটা অবান্তর। পরিচয় দিলেও তোমরা আমাদের চিনতে পারবে না। এটুকু নিশ্চয় বুঝতে পারছ—তোমাদের সামনে এখন তিনটি বিকল্প পথ। এক নম্বর—অনন্তকাল পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে পার। দু-নম্বর—নিজেরা অবতরণের চেষ্টা করে দেখতে পার। আমাদের কম্পুটার বলছে, সেক্ষেত্রে তোমাদের জীবিতাবস্থায় পৃথিবীর কোনো ভূ-ভাগে উপনীত হওয়ার সম্ভাবনা ৩.২৫৭ শতাংশ। তিন নম্বর—অবতরণের দায়িত্বটা আমাদের ওপর ছেড়ে দিতে পার। সে স্ট্যাটিসটিক্সটাও শুনে রাখ—আমাদের কম্পুটারের মতে সেক্ষেত্রে তোমাদের নিরাপদ অবতরণের সম্ভাবনা ৯৯.৯৩৫ পারসেন্ট। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অবশ্য তোমাদেরই নিতে হবে। উইশ য়ু গুড ল্যক ডক্টর রয় অ্যান্ড ডক্টর ওয়াম্বাসী;—এ্যান্ড উইশ য়ু সাম গুড সেন্স ইনটু দ্য বারগেইন! ওভার!

পুরো একটি মিনিট সময় লাগলো স্বাভাবিকতা ফিরে আসতে। তারপর বব্ বললে, ওয়েল নিগার! বল্ কী করা যায়?

ওয়াম্বাসী আবার মনে মনে হাসে। বুঝতে পারে, আতঙ্কের তুঙ্গশীর্ষ থেকে ওর বন্ধু ক্রমশ স্বাভাবিক মানসিকতায় ফিরে আসছে। তাই তিন দিন পরে আজ এই পরিচিত 'নিগার' সম্বোধন। বললে, তুই হচ্ছিস্ ফ্রন্টিয়ারের ক্যাপ্টেন; সিদ্ধান্ত তোকেই নিতে হবে। তবে প্রশ্ন যখন করেছিস তখন বলি—অঙ্কশাস্ত্র বলে, ৯৯.৯৩৫ সংখ্যাটা ৩.২৫৭ সংখ্যার চেয়ে কিছু বেশি!

বব্ বেশ খুশিয়াল হয়ে উঠেছে। বললে, নিগারদেরও যে ওটুকু অঙ্কশাস্ত্র জ্ঞান আছে, তা আমার জানা আছে। কিন্তু এই মওকায় বাছাধনকে একটু বাজিয়ে নিই, কী বলিস?

বেতারের মাউথপিসে সে বললে, আপনার নাম না জানায় শুভেচ্ছা বিনিময়ে অসুবিধা হচ্ছে আমাদের। তাছাড়া আপনার পরিচয় না পাওয়া পর্যন্ত সিদ্ধান্তেও আসতে পারছি না আমরা।

পরমুহূর্তেই ভেসে এল প্রত্যুত্তর, আপনারা নিতান্ত পীড়াপীড়ি করছেন, তাই জানাচ্ছি;—আমার নাম রুডলফ্ ব্যাটলার। পরিচয় দিলেও চিনবেন না। সেটা সাক্ষাতেই হবে। এবার দয়া করে সুইচটা টিপে দেবেন কি?

: থ্যাঙ্ক য়ু হের ব্যাটলার। সুইচটা টিপে দিল বব্ রয়।

ওয়াম্বাসী তখন ভাবছিল—বব্ ওকে 'হের' সম্বোধন করল কেন? লোকটার ইংরাজি উচ্চারণ তো ত্রুটিহীন। জার্মানের মতো নয়। বব্ তখন মুখটা উঁচু করে খোশমেজাজে শিষ দিচ্ছে। বেল্টটা কষছে—এবার ঋণাত্মক ত্বরণে দেহে একটা অনুভূতি হবে। হঠাৎ এদিকে ফিরে বললে, বোধহয় যতটা আশঙ্কা করা গিয়েছিল, তেমন কিছু হয়নি। নয়? সমস্ত ব্যাপারটার একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে।—মানে পৃথিবী ঠিকই আছে; সামান্য কিছু অদলবদল হয়ে থাকবে। কী বলিস?

ওয়াম্বাসী বেল্ট কষতে কষতে বললে, আমার মনে পড়ছে ম্যালেটের একটা উদ্ধৃতি—Uncertainty ....The human soul that can support despair, supports not thee. (অনিশ্চিয়তা! মানুষ নিরাশাকেও বরদাস্ত করতে পারে, কিন্তু তোমাকে নয়)।

বব্ খিঁচিয়ে ওঠে, আমার সব চেয়ে কেন ভাল লাগছে জানিস? তোর মতো একটা পণ্ডিতের হাত থেকে এবার মুক্তি পাব। দুটো সাদামাটা কথা বলবার মতো মানুষের সাক্ষাৎ পাব এবার!

ভালুকের মতো ঝকঝকে একসার দাঁত বার করে ওয়াম্বাসী হাসে।

দুই

: আচ্ছা, এর কোনও মানে হয়? তিন ঘন্টা ধরে দাঁড় বাইছি, ব্যাটাদের কোনো সাড়াশব্দ নেই!

কথাটা এবার নিয়ে বব্ চারবার বলল। ওয়াম্বাসী এবারও কোনো জবাব দিল না। চারদিকে নীরন্ধ্র অন্ধকার। আকাশে চাঁদ নেই। এক আকাশ শুধু তারা। আদিগন্ত বিস্তৃত শুধু সমুদ্র আর সমুদ্র। বব্ বলে, জায়গাটা কোথায় আন্দাজ করতে পারিস?

: দ্রাঘিমাংশটা পারি না। তবে ধ্রুব-নক্ষত্রের উন্নতি (অল্টিচ্যুড) দেখে বলতে পারি—আমরা আছি উত্তর গোলার্ধে, চল্লিশ অক্ষাংশের কাছাকাছি।

ফুলের মালা নিয়ে ওরা অভ্যর্থনা করতে আসবে—এতটা এরা আশা করেনি; তবে এভাবে তিন-চার ঘন্টা ধরে সমুদ্রের মাঝখানে ফেলে রাখবে এ আশঙ্কাও ছিল না। ওরা অন্তত আশা করেছিল—সমুদ্রের উপরিভাগে ভেসে উঠে দেখতে পাবে অদূরে ভাসছে একটা রেসকিউ শিপ; যা থেকে উড়ে আসবে একটা হেলিকপ্টার। এমন সুচারুরূপে ওদের অবতরণ করিয়ে ওরা যে কী করে সমস্ত ব্যাপারটাই ভুলে থাকতে পারল তার কোনো কূল-কিনারাই করা যাচ্ছে না।

ক্রমে পূর্বদিগন্তে আলোর রশ্মি দেখা দিল। সূর্য উঠছে। কুয়াশা একটু কেটে গেলে দেখা গেল—না, ওরা মাঝসমুদ্রে নেই। উত্তর, উত্তর-পশ্চিম কোণে উপকূলভাগ দেখা যাচ্ছে। মাইল সাত-আট দূরে। এতক্ষণে একটা লক্ষ্যস্থল পাওয়া গেল। জোরকদমে ওরা তীরভূমির দিকেই নৌকা বাইতে শুরু করে।

আধ-ঘন্টাখানেক পরে, তীরভূমির আরও কাছে এগিয়ে এসে যে দৃশ্য ওরা প্রত্যক্ষ করল তা প্রায় অবিশ্বাস্য। তীরভূমিতে যেগুলিকে অতিকায় গাছ বলে এতক্ষণ মনে হচ্ছিল সেগুলো আদৌ গাছ নয়—পাহাড়ও নয়—কোনো কিছুর ধ্বংসস্তূপ। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড—অবিশ্বাস্য রকমের বিশালকায় কংক্রিটের চাংক! পিরামিডের চেয়েও বড় এক একটা স্তূপ! নিঃসন্দেহে এটা ছিল সমুদ্রতীরের একটা অতি প্রকাণ্ড বন্দর। বর্তমানে ধ্বংসস্তূপ!

ওয়াম্বাসী বলে, এটা কোন বন্দর আন্দাজ করতে পারিস?

ববের কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে ওয়াম্বাসী ওর দিকে ফিরে দেখে। দেখে, দু-হাতে মুখ ঢেকে ডক্টর বব্ রয় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

: কী হল? বব্? বব্!

বব্ মুখটা তোলে না। নিঃশব্দে বাইনোকুলারটা বাড়িয়ে ধরে। দিগন্তের এক দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। ওয়াম্বাসী দ্রুতহস্তে বাইনোকুলারটা ছিনিয়ে নেয়। চিহ্নিত দিগন্তের দিকে দৃষ্টি মেলে দেয়। তৎক্ষণাৎ ওর সর্বাবয়বে যেন একটা হিমশীতল শিহরন বয়ে যায়। হ্যাঁ, পেরেছে—চিনতে পেরেছে

এতক্ষণে! এ বন্দর, এ শহর অতি পরিচিত ওদের। সমুদ্রতীরের একটি দিক্-চিহ্ন-চূড়ান্তভাবে সনাক্ত করে দিয়েছে শহরটার নাম।

একটি প্রকাণ্ড মর্মর-মূর্তির ধ্বংসাবশেষ। নারীমূর্তি। তার মাথায় মুকুট। ডান হাত—যেটা ভেঙে গিয়েছে—তাতে ধরা ছিল আলোকবর্তিকা। স্বাধীনতার প্রতিমূর্তি। স্ট্যাচু অব লিবার্টি!

: আই উইল কিল্ দেম! আ'য়ল কিল্ দেম অল!—নিষ্ফল আক্রোশে গজরাচ্ছে বব্ রয়।

ওয়াম্বাসী অতি দুঃখেও আত্মসংযম হারায়নি। তারও বুকের মধ্যে মুচড়ে উঠছে। এতক্ষণে যে চূড়ান্তরূপে সনাক্ত করা গেছে শহরটা! পাঁচ বছরে এ কী হাল হয়েছে মানব সভ্যতার সেই আকাশচুম্বী গরিমা-নগরীর! সেই শহরটা এখন একটা ধ্বংসস্তূপ! তা হোক, পাঁচ বছরে অতীতের চেয়ে বর্তমানটার মূল্য বেশি। ধীরে ধীরে ও বসে পড়ে ববের পাশে। বলে, মাথা গরম করিস না বব্। পরিস্থিতিটা বুঝে নিতে দে, বুঝে নে! এই জন্যেই ওরা এতক্ষণ সাড়া দেয়নি। ওরা ইচ্ছা করেই আমাদের সময় দিচ্ছে—বুঝে নিতে দিচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতিটা।

: আ'ল কিল্ দিজ জেরিস্!

: জেরি! জার্মান! জার্মান কে? ঐ রুডলফ্ ব্যাটলার নামে লোকটা? পাগলামি করিস্ না বব্। জার্মানদের সঙ্গে আমেরিকার যুদ্ধ হয়েছিল আশি-নব্বই বছর আগে। এই একবিংশ শতাব্দীতে মার্কিন-সভ্যতাকে এভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেবার ক্ষমতা ওদের নেই—ইস্ট জার্মামী ওয়েস্ট-জার্মানির মিলিত শক্তিও—

: তবে ওরা কারা? প্রশ্ন করে বব্।

: জানি না—আমি জানি না। তবে ওরা পৃথিবীর লোক নয়। আমার এখনও বিশ্বাস, ওরা নক্ষত্রান্তরের কোনো গ্রহের জীব!

আর কোনো কথা হয় না। নীরবে দুজনে এসে পৌঁছায় উপকূলভাগে। কলমুখরিত প্রাক্তন নিউইয়র্কের একটি নির্জন সমুদ্রতীরে। এ কোন নিউ ইয়র্ক? একটি বাড়ি দাঁড়িয়ে নেই, একটি গাড়ি চলছে না পথে। এমনকি আকাশে নেই একটি পাখি, মাটিতে নেই একটিও প্রাণের স্পন্দন। মৃতদেহ আছে—এখানে-ওখানে, রাস্তায়, পার্কে, ধ্বংসস্তূপের একান্তে। দুর্গন্ধ নেই—পড়ে আছে শুধু কঙ্কাল। আবর্জনা সরাবার চেষ্টা কেউ করেনি। যে যেখানে মৃত্যুবরণ করেছে, সে সেখানেই পড়ে আছে, কঙ্কালে রূপান্তরিত হয়ে। ওদের হাতঘড়ি, গলার মালা, হাতের বালা পর্যন্ত আছে অবিকৃত। এ দৃশ্য যেন আর সহ্য করা যায় না।

: ও কী করছিস্? প্রশ্ন করে ওয়াম্বাসী।

: দেখছি, আবহাওয়ায় এখন রেডিয়ো-অ্যাক্টিভিটির চিহ্ন আছে কিনা।

না নেই। পাঁচটি বছরের বর্ষণে, ঝড়ে-ঝঞ্ঝায় সব ধুয়ে মুছে গেছে। সর্বংসহা পৃথিবী বিপুলা,—পাঁচ বছর পূর্বেকার একটি খণ্ডমুহূর্তের চিহ্নও নেই আকাশে-বাতাসে। সকালের ঝলমলে রোদে নির্লজ্জা পৃথিবী হাসছে!

দুজনে প্রায় ছুটতে ছুটতে শহরটা পার হবার চেষ্টা করে। বিশাল শহর। এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে পৌঁছাতে সারা দিনমান অতিক্রান্ত হল। বব্ বললে, মনে হয় নিউ ইয়র্কে ডাইরেক্ট হিট হয়নি; তাহলে এত প্রচণ্ড উত্তাপ হত যে সবকিছু গলে যেত। কঙ্কাল খুঁজে পেতুম না আমরা।

: আমারও তাই মনে হয়।

: এর শোধ আমাদের নিতে হবে। আই'ল কিল্ দেম অল!

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ওয়াম্বাসী। বলে, বব্ একটা কথা বলি, কিছু মনে করিস না। ফ্রন্টিয়ারে তুই ছিলি ক্যাপ্টেন। যা হুকুম করেছিস, আমি তামিল করেছি। সে খেলা শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন আমাকে জিনিসটা ট্যাক্‌ল্ করতে দে।

বব্‌ও দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে, ঠিক কী বলতে চাইছিস?

: বল্‌ছি, তুই অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিস। মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিস। হ্যাঁ, শোধ তো

আমাদের নিতেই হবে; কিন্তু ভুলে যাস না আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ ওরা অন্তরালে বসে লক্ষ করছে। প্রতিটি কথা হয়তো শুনতে পাচ্ছে।

: আই সী!

আরও কিছুক্ষণ পথ চলার পর বব্ আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে, দ্যাখ দ্যাখ! এ ভালচার! হাউ বিউটিফুল!

হ্যাঁ, একটা শকুন। দূর আকাশে পাক খাচ্ছে। ববের উচ্ছ্বাসটা অহেতুক নয়। পৃথিবীতে ফিরে এসে এই প্রথম ওরা প্রাণের সন্ধান পেল। তাই ববের মনে হতে পারে বটে : একটা শকুন! কী সুন্দর!

মানুষের সাক্ষাৎ পেল একেবারে দিবাবসানে। প্রথমে লক্ষ্য হল, ভিজে মাটিতে কিছু পদচিহ্ন। পাঁচ বছরের তুষারপাতে, বৃষ্টিতে, সে পদচিহ্ন টিকে থাকতে পারে না। সুতরাং পৃথিবী জনশূন্য নয়। মানুষ আছে; আজও টিকে আছে! আনন্দে দুই বন্ধু চীৎকার করে ওঠে। ওয়াম্বাসী হঠাৎ হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে জল-কাদায়। বুকে ক্রুশচিহ্ন আঁকে।

আরও ঘন্টাখানেক পরে হঠাৎ বাঁকের মুখে দেখতে পেল একটা দৃশ্য। ওরা উঠে পড়েছিল একটা বালিয়াড়ির ওপর। বালিয়াড়ি ঠিক নয়, হয়তো কোনো ধ্বংসস্তূপ। মাটিচাপা পড়ে একটা ছোট পাহাড়ের মত হয়েছে। সেখান থেকে দেখতে পেল নীচে একটা খরস্রোতা জলধারা। আর সেই নদীর ধারে জল খেতে এসেছে বনচারী একদল অসভ্য মানুষ। সংখ্যায় ওরা প্রায় শতখানেক হবে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, যুবক-যুবতী। কারো কারো গায়ে শতচ্ছিন্ন পোশাকের ধ্বংসাবশেষ। বব্ বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে দেখল—ওদের অনেকেই বিকলাঙ্গ। দু-একজনের মাজায় চামড়ার বেল্ট বাঁধা। অধিকাংশ পুরুষের হাতেই হাতঘড়ি, মেয়েদের হাতে বালা অথবা রিস্ট-ওয়াচ। তবু প্রায় সকলেই সম্পূর্ণ উলঙ্গ। ওদের গায়ের রঙ সাদা, চোখের তারা নীল, মাথার চুল সোনালি, লাল অথবা কালো।

বেচারি বব্ বসে পড়ে মাটিতে।

: ওরা সবাই আমেরিকান! ওয়াম্বাসী বললে।

: না। ওরা এক্স-আমেরিকান! এখন মানবেতর জীব!

অর্থাৎ ওরা প্রাণে মরেনি। কিন্তু কী একটা বিধ্বংসী মারণাস্ত্রের তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে ওদের আত্মিক মৃত্যু ঘটেছে। বুদ্ধিবৃত্তি লোপ পেয়েছে নিঃশেষে। ওদের মস্তিষ্কের পরিমাপ করলে হয়তো দেখা যাবে তা সেই প্রাগৈতিহাসিক পিকিং-ম্যানের সমান। যূথবদ্ধ নরনারী ঐ নদীর জলে দিনান্তের শেষ জলপান করতে এসেছে। ওরা অঞ্জলি ভরে জলপান করছে না কিন্তু। উবু হয়ে জলে মুখ ডুবিয়ে জল খাচ্ছে। এবার ওরা হয়তো রাতের মতো কোনো গুহায় আশ্রয় নেবে। গুহার অভাব কি? পঞ্চাশ-ষাটতলা স্কাই-স্ক্রেপার তো চিত হয়ে শুয়ে আছে সারি সারি!

দুই বন্ধু ধীরে ধীরে নেমে এল পাহাড় থেকে। হঠাৎ বন্যমানুষগুলো সচকিত হল। ওদের দেখতে পেল। একটা যৌথ জান্তব আর্তনাদ করে সবাই রুদ্ধশ্বাসে ছুটতে শুরু করল। বব্ রয়ও ছুটছে—ওদের একটাকে ধরতে হবে। নিতান্ত ভাগ্যক্রমে একটি যুবতী মেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল পাথরে ধাক্কা খেয়ে। পরমুহূর্তেই বব্ ধরে ফেলল তাকে। আতঙ্কেই হোক অথবা পতনজনিক আঘাতেই হোক—মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। বব্ বিস্ফারিত নেত্রে দেখতে থাকে ভূশয্যালীন সম্পূর্ণ নিরাবরণা মেয়েটিকে। কত বয়স হবে ওর? বিশ-বাইশ! মাথার চুলগুলো এককালে ছিল সোনালি, এখন পিঙ্গল জটাজাল। হাতে-পায়ে নখ বাঘের মতো। সর্বাঙ্গ কর্দমলিপ্ত। পাঁচ বছর আগে সে বোধ করি ছিল কোনো হাই স্কুলের টীন-এজার ব্লন্ডি! হঠাৎ ইষ্টক-বর্ষণ শুরু হল দূর থেকে। বব্ চোখ তুলে দেখে ঐ বন্য মানুষগুলো ভয়ে কাছে এগিয়ে আসতে পারছে না বটে, কিন্তু দলের মেয়েটিকে ছেড়েও যায়নি। দূর থেকে ইঁট ছুঁড়ে মারছে। বব্ উঠে দাঁড়ায়। চিৎকার করে ওদের ডাকে, অভয় দেয়। নানান অঙ্গভঙ্গি করে ওদের আশ্বাস দেওয়ার চেষ্টা করে। ওরা কিন্তু বুঝতে পারে না। যূথবদ্ধ বনমানুষের মতো দূর থেকে শুধু আস্ফালন আর চিৎকার করতে থাকে। নিরুপায় হয়ে বব্ ফিরে আসে ওয়াম্বাসীর কাছে।

বনমানুষ দলের একটি জোয়ান ছুটে এসে ঐ অচৈতন্য মেয়েটিকে পিঠে তুলে নেয়। মুহূর্তে ওরা মিলিয়ে যায় ধ্বংসস্তূপের আড়ালে!

: গুড ইভনিং ডক্টর্স্! আশা করি সারাদিনে আপনাদের সরেজমিনে তদন্তটা শেষ হয়েছে। আপনাদের আমেরিকার কী হাল হয়েছে—

বব্ হুমড়ি খেয়ে পড়ে বেতার যন্ত্রটার উপর : য়ু বাস্টার্ডস্! আই'ল—

ওয়াম্বাসী তৎক্ষণাৎ ওর মুখ চেপে ধরে। তা হোক, ববের বক্তব্যের আর বাকিও ছিল না কিছু। তাই ও-প্রান্তবাসী অনায়াসে চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে পারল, একবিংশতি শতাব্দীর সুসভ্য সমাজে 'বেজন্মা' কথাটা কোনো গালাগালি নয়, ডক্টর রয়। কথা সেটা নয়, কথা হচ্ছে আপনারা কি আত্মসমর্পণে প্রস্তুত?

ববের মুখে হাত চাপা দেওয়া আছে। সে জবাব দিতে পারে না। তাই ওয়াম্বাসী বলে, কার কাছে আত্মসমর্পণ করছি সেটুকুও কি জানবার অধিকার নেই আমাদের?

: নিশ্চয়ই আছে। আমার কাছে। আমার নাম তো আগেই বলেছি—রুডল্ফ্ ব্যাটলার।

: নামটাই বলেছিলেন। পরিচয়টা দেননি।

: আমি ওয়েস্টার্ন কমান্ডের জেনারেল।

: কোন সৈন্যদলের?

: সেটা তো আপনি অনেকক্ষণ আগেই বুঝিয়ে দিয়েছেন আপনার বন্ধুকে। আমরা পার্থিব নই। নক্ষত্রান্তরের জীব। মানুষ নই!

সব সংশয়ের অবসান হল এতক্ষণে। এবার আর ওয়াম্বাসীর মনে পড়ল না ম্যালেটের সেই অনবদ্য উক্তিটা। সে শুধু সংক্ষেপে বললে, আমরা আত্মসমর্পণ করছি।

: ভেরি গুড! বুদ্ধিমানের মতো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বব্ দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকে। কয়েক মিনিটের ভেতরেই একটা যান্ত্রিক শব্দ শোনা গেল। পরমূহূর্তেই দিগন্ত ভেদ করে এসে উপস্থিত হল একটি হেলিকপ্টার। নামলো সামনের মাঠে। ধ্বংসস্তূপের মাথায় মাথায় উলঙ্গ মানুষ-উল্লুকদের সে কী চিৎকার! ওরা যেন চিৎকার করেই পাখিটাকে তাড়াবে। হেলিকপ্টারের শিরঃঘূর্ণন স্তব্ধ হল। কক্‌পিট থেকে নেমে এলেন সেই অপার্থিব ওয়েস্টার্ন কমান্ডের জেনারেল। তাঁর দেহাবয়ব দেখা গেল না কিন্তু। মনে হয় পাঁচ সাড়ে-পাঁচ ফুট লম্বা, হৃষ্টপুষ্ট দেহাবয়ব। সমস্ত শরীরটা তাঁর একটি আলখাল্লায় ঢাকা; এমনকি বোরখার মতো একটি আবরণে মুখখানিও আবৃত। ধীর ভারিক্কি মেজাজে অনেকটা 'গুজ স্টেপে' তিনি এগিয়ে এলেন। তাঁর বাঁ হাতে শট-গানের মতো কী একটা অস্ত্র। ওদের সামনে এসে ডান হাতটা তুলে কী একটা অদ্ভুত স্লোগান দিলেন। সেটা ওদের প্রতি সম্ভাষণ, নাকি তাঁর জয়োল্লাস তা বোঝা গেল না।

ওয়াম্বাসী বললে, একটা কথা হের ব্যাটলার! দয়া করে আমাদের জানাবেন কি—সমস্ত পৃথিবীরই কি আজ এই অবস্থা?

: আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনারা যে স্যাম্পল সার্ভে করেছেন তা শুধু নিউ ইয়র্ক শহরের নয়, বলা যায় গোটা পৃথিবীর প্রতিচ্ছবিই তাতে ফুটে উঠছে।

: আমরা যখন যাত্রা করি তখন পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল ছয় শত কোটি। এখন পৃথিবীতে মানুষ কত আছে জানতে পারি?

: আমরা আদিমসুমারী করে দেখিনি। অন্যান্য মহাদেশের খবর রাখি না। তবে লোকসংখ্যা বেশ কয়েক লক্ষ হবে। অবশ্য তারা ঠিক মানুষ নয়, প্রায়-মানব—ঐ ওদের মতো!

ধ্বংসস্তূপের মাথায় মাথায় তখনও কৌতূহলী উলঙ্গ প্রায়-মানবগুলো ওদের দেখছিল। ওয়াম্বাসী তখনও মনের ভারসাম্য হারায়নি। বললে, ওদেরই বা আপনারা শেষ করে দিলেন না কেন? কয়েক লক্ষ বছরের বিবর্তনে আবার তো ওরা মানুষে রূপান্তরিত হতে পারে?

: না, পারে না। অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই ঐ কয়েক লক্ষ প্রায়-মানব পৃথিবী থেকে নিঃশেষে মুছে যাবে।

: কেন? কোন যুক্তিতে?

: দেখছেন না—ঐ অতগুলি মানুষ-জন্তুর মধ্যে পাঁচ বছরের কম বয়সের কোনো বাচ্চা আছে? ওরা শুধু বুদ্ধিবৃত্তিই হারায়নি, প্রজনন ক্ষমতাও হারিয়েছে।

মুহূর্তের অসতর্কতা। ওয়াম্বাসী বাধা দেওয়ার আগেই বব্ তার কোমরবন্ধ থেকে একটানে বার করে ফেলেছে রিভলভারটা। পর পর তিনটি গুলি ছোঁড়ে সে অব্যর্থ লক্ষ্যে। তারপর সে বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

নক্ষত্রান্তরের জীবটি একবার নীচু হয়ে দেখল, তার আলখাল্লার কোথায় কোথায় ফুটো হয়েছে। তারপর আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললে, আপনার টিপ তো বড় অদ্ভুত ডক্টর রয়! আমার শবব্যবচ্ছেদ হলে ডাক্তার বলত তিনটে গুলিই লেগেছে হৃদ্‌পিণ্ডে—রাইট ভেনট্রেক্‌ল্ এবং লেফ্‌ট্ অরিক্‌ল্!

ওয়াম্বাসী কুণ্ঠিত হয়ে বলে, আমি বন্ধুর হয়ে ক্ষমা চাইছি। অবশ্য আপনি নিশ্চয়ই বুঝবেন—ওর উত্তেজিত হবার যথেষ্ট কারণ ছিল!

: না, না, ক্ষমা চাওয়ার কিছু নেই। তবে আপনার বন্ধুটি একটি গবেট! ওঁর বোঝা উচিত ছিল, তেমন কোনো আশঙ্কা থাকলে আমি আপনাদের আত্মসমর্পণ করতে বলার আগে অস্ত্রসমর্পণ করতে বলতাম। তাই নয় কি?

বব্ অথবা ওয়াম্বাসী জবাব দিতে পারে না।

রুডল্‌ফ্ ববের দিকে ফিরে বলে, আপনার রিভলভারে আরও তিনটে চেম্বার ভরা আছে। মহাশয় কি ও তিনটি চুকিয়ে-বুকিয়ে ঝাড়া হাত-পা হয়ে গাড়িতে উঠতে চান?

রুদ্ধ আক্রোশে বব্ ছুঁড়ে ফেলে দেয় রিভলভারটা।

লোকটা তখন তার বাঁ হাতের যন্ত্রটা তুলে দেখায়। বলে, এটার ব্যবহার আপনারা জানেন না। লেসার রশ্মি আপনারা চেনেন—এটা হচ্ছে পোর্টেব্‌ল্ লেসার-রিভলভার। অস্ত্রটা সে বাগিয়ে ধরে সামনের ধ্বংসস্তূপের দিকে। প্রকাণ্ড কংক্রিটের চাংককে সেই অদৃশ্য রশ্মি করাতকলের মতো দু'টুকরো করে দিল। রুডল্‌ফ্ কোনো কথা বলল না। হাতটা বাড়িয়ে দিল। সে ব্যঞ্জনার অর্থ : আসতে আজ্ঞা হোক! যেন কন্যাকর্তা বরযাত্রীদের আমন্ত্রণ করছেন।

হেলিকপ্টারে উঠে বব্ গোঁজ হয়ে বসে থাকে। কিন্তু ওয়াম্বাসী তখনও ভেঙে পড়েনি। বললে, আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।

: বিলক্ষণ! করুন না যে কোনও প্রশ্ন। জানাতে আমার একটুও আপত্তি নেই।

: আপনারা কতজন এসেছেন?

: সব জাতের মিলিয়ে ধরুন জনা-পঞ্চাশ আছি।

: জাত! আপনাদের জাত আছে তাহলে?

: জাত মানে, শ্রেণী। তা আছে বইকি। আমাদের পাঁচটি শ্রেণী।

: আপনি কোন জাত?

: বর্ণশ্রেষ্ঠ! আল্‌ফা!

: বাকি জাতগুলি কি—বীটা, গামা, ডেলটা এবং এপসাইলন?

: এক্‌জ্যাক্টলি!

: ওয়াম্বাসী প্রসঙ্গ বদলে বললে, মাত্র পঞ্চাশ জনে আপনারা পৃথিবীটা জয় করে ফেললেন?

: সেটা অসম্ভব হতে যাবে কেন। আমরা আর্য, আপনারা অনার্য!

: আর্য! আর্য মানে?

: আর্য মানে ঋষি-প্রোক্ত—যা বিবেক-বুদ্ধি-ব্যাকরণ মানে না।

ওয়াম্বাসীর আই. কিউ.-এর লগিতে 'একবাম' মেলে না। বলে, মাপ করবেন, ঠিক বুঝতে পারলাম না।

: না পারাই স্বাভাবিক। অনার্যদের বুদ্ধি চিরকালই কম। ভগবান দু-জাতের বুদ্ধিমান জীবকে সৃষ্টি করেছেন—আর্য এবং অনার্য। যাদের ধমনীতে বিশুদ্ধ আর্য রক্ত আছে, তারাই জগতে বেঁচে থাকবার অধিকার নিয়ে এসেছে। এই জগতের যাবতীয় দুঃখের মূল ঐ অনার্য জাতি।

: কোন যুক্তিতে?

: যুক্তি নেই। এটা আর্য প্রয়োগ! যুক্তির ব্যাকরণে বুঝতে পারবেন না। কিন্তু বিযুক্তির ভ্যা-করণে আর্য-প্রয়োগের ফলাফলটা তো প্রত্যক্ষ করছেন! আমরা মাত্র পঞ্চাশজন আর্য এই নতুন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছি, অনার্যদের বিযুক্ত করেছি,—আগামী হাজার বছর ধরে এ সাম্রাজ্য চালু থাকবে!

লোকটার—যদি 'লোকটা'ই বলা যায় ওকে—বক্তব্যে যুক্তির বালাই নেই। তবু বক্তব্যটা একেবারে অশ্রুতপূর্ব বলেও মনে হল না ওয়াম্বাসীর। হোক নক্ষত্রান্তরের জীব, ওর মানসিকতায় এই পৃথিবীর ইতিহাসের ছাপ পড়েছে। দুরন্ত কৌতূহল হল নিগ্রো মানুষটার। জানতে চায় : একটু আগে আপনি ভগবানের কথা বললেন। আপনারা তাহলে ভগবান মানেন?

: কেন মানব না? সৃষ্টি যখন আছে, তখন তার সৃষ্টিকর্তাও আছেন।

: কেমন দেখতে তিনি?

: ঠিক আমার মতন। কারণ : God made us in His own image—নিজের খানদানি বদনখানির আদলে তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছিলেন।

ওয়াম্বাসী প্রতিবাদ করে, সে তো মানুষও তাই ভাবে, মানে ভাবতো। বাইবেল-এ আছে—

: ওটা ছিল মানুষের ভ্রান্ত ধারণা। গোরু-ছাগল-ভেড়া-বাঁদরেরও যদি এক এক কণা বুদ্ধি থাকত, তাহলে তারাও ও কথা বলত।

ওয়াম্বাসী আবারও বলে, মাপ করবেন জেনারেল, গোরু-ছাগল-বাঁদর-মানুষ যদি ভুল করতে পারে তাহলে আপনারাও যে ভুল করছেন না সেটা কোন যুক্তিতে—

এবারও ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে জেনারেল ব্যাটলার বলে ওঠেন, ও-কথা যে বলে সে অনার্য! তাদের খতম করতেই জন্মেছি এই কল্কি-অবতারে, মানে আমরা কজন। আর যুক্তির কথা বলছেন? আগেই বলেছি—ও-সব যুক্তি-লজিক-ব্যাকরণ শিকেয় তুলে রাখুন। এ হচ্ছে আপ্তবাক্য, অভ্রান্ত সত্য—আর্য-প্রয়োগ! আমাদের ধর্মগ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে একথা লেখা আছে।

: আপনাদেরও তাহলে ধর্মবোধ আছে? ধর্মগ্রন্থ আছে? আপনি পড়েছেন?

: না, আমি নিজে পড়ে দেখিনি। বইটা জার্মান-ভাষায় লেখা। ভারি শক্ত ভাষা। অনেক চেষ্টা করেও শিখতে পারিনি। কিন্তু যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা ঐ কথাই বলেছেন।

: কে লিখেছেন বইটা?

: ঈশ্বর স্বয়ং!

: কেমন করে জানলেন?

: সহজ উপায়। আর্য-প্রয়োগে!

তিন

সে-রাত্রের জন্য বন্দি দুজনের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হল ভূগর্ভস্থ এক কারাকক্ষে। কারারক্ষীর বালাই নেই। স্বয়ং জেনারেল রুডল্‌ফ্ ব্যাটলার ওদের কারাকক্ষে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে বিদায় চাইলেন। বললেন, আচ্ছা, চলি তাহলে। কাল সকালে আবার দেখা হবে। ও! ভালো কথা, ঐ পাশের ঘরটা হচ্ছে বাথরুম, আর এই ফ্রিজে পানীয় জল ও খাবার আছে। ও-পাশে কিচেনেট। আপনারা ফ্রন্টিয়ারে তো নিজেরাই রান্নাবান্না করে খেতেন—অসুবিধা হবে না আশা করি!

বব্ তাকিয়ে তাকিয়ে কারাকক্ষটা দেখছিল। জেলখানার মতো মোটেই নয়, এটা নিশ্চয়ই কোনো হোটেলের ভূগর্ভস্থ এয়ার-রেড শেল্‌টার। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধেও ভেঙে পড়েনি। দিব্যি ছিমছাম। যেন

একটা ডবল্-বেট স্যুইট। ওয়াম্বাসী বলে, বিলক্ষণ! অসুবিধা কিছুই হবে না। বস্তুত আপনাদের আতিথেয়তায় আমরা মুগ্ধ। যদি একটু বসে যান, কফি করে খাওয়াতে পারি।

: না থাক। আমরা ওসব খাই না। ও-সব অনার্য নেশা!

: কাল সকালে আমাদের কোথায় যেতে হবে?

: ফ্যুরার-এর কাছে।

: ফ্যুরার!

: মানে আমাদের সর্বাধিনায়ক আর কি। বিশ্বাধিপতি। আল্‌ফা শ্রেণীর মাত্র তিনজন আমরা এখানে আছি। আমি ফ্যুরারের দক্ষিণহস্ত। বামহস্ত হচ্ছেন ইস্টার্ন কমান্ডের জেনারলে ডিফিটস্টোন চারশকুন। আমরা এই তিনজন মাত্র হচ্ছি বর্ণশ্রেষ্ঠ—আলফা শ্রেণীভুক্ত।

ওয়াম্বাসী বলে, 'ফ্যুরার'টা কি সর্বাধিনায়কের নাম? না উপাধি?

: কোনোটাই নয়। আমি ওঁকে ঐ নামে ডেকে আনন্দ পাই, যদিও জানি তিনি সেটা পছন্দ করেন না। তাঁর নাম হচ্ছে—লেক্‌জান্ডা দ্য গ্রেট!

ওয়াম্বাসী বলে, নামটা চেনা-চেনা। আপনারা দুজনেই। কিন্তু ঐ জেনারেল চারশকুনকে তো ঠিক ধরতে পারছি না।

: পারবেন না। আমি আজও তাঁকে ধরতে পারিনি। পাঁকাল মাছের মতো তিনি ক্রমাগত পিছলে পালিয়ে যান। দ্বিতীয়ত উনি জেনারেল নন, স্যার চারশকুন!

: বুঝলাম। তাঁর কী কাজ? কী করেন তিনি?

: তিনি একটি অকর্মার ধাড়ি। একটি মাত্র কাজই তিনি জানেন,—ক্রমাগত বর্মা চুরুট ফুঁকতে।

এতক্ষণে সেই অজ্ঞাত ডিফিটস্টোন চারশকুনের একটা মানসমূর্তি ফুটে উঠল ওয়াম্বাসীর অন্তরপটে। জেনারেল বললেন, দরজাটা খোলাই থাক। এয়ার-কন্ডিশানারটা চালু নেই—একটু হাওয়া খেলবে। না, চুরি-চামারির ভয় নেই। আর ভাল কথা—আপনার বন্ধুকে বলে দেবেন, দরজার বাইরে সমস্ত মেঝেটায় এইট-এইট্টি ভোল্ট অল্টারনেটিং কারেন্ট আছে। আচ্ছা চলি—গুড নাইট!

কারাকক্ষের দরজাটা হাট করে খুলে দিয়ে জেনারেল বিদায় হলেন।

বব্ এতক্ষণ কথা বলেনি। এবার বলে ওঠে, সমস্ত ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য!

ওয়াম্বাসী ওর পাশে একটা গদি-আঁটা চেয়ারে বসতে বসতে বলে, কেন, সবটাই অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে কেন?

বব্ রুখে ওঠে, তোর মনে কোনো খটকা নেই?

: আছে। একটা প্রশ্নের সমাধান এখনও পাইনি!

: একটা? আমার মনে তো হাজারটা প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। কোনোটারই সমাধান খুঁজে পাচ্ছি না।

: যথা?

: এক নম্বর—ওরা কী? দু-নম্বর—ওরা কোন নক্ষত্র থেকে এল? তিন নম্বর—কত সময় লেগেছে? চার নম্বর—কেন ওরা এভাবে সমস্ত পৃথিবী থেকে মানব সভ্যতাকে মুছে ফেলল? পাঁচ নম্বর—

ওকে বাধা দিয়ে ওয়াম্বাসী বলে, চার নম্বর প্রশ্নটার জবাব কিন্তু ও দিয়েছে—ওদের বিযুক্তির ভ্যাকরণ-অনুসারে আমরা হচ্ছি অনার্য, বাঁচবার অধিকারী নই, আর ওরা হচ্ছে পবিত্র আর্য-রক্তের অধিকারী।

বব্ সে কথায় কর্ণপাত না করে এক নিশ্বাসে বলে চলে, পাঁচ নম্বর—পর পর তিনটে বুলেটেও বেটা ঘায়েল হল না কেন? ছয় নম্বর—যেটা সব চেয়ে ভাইটাল—ওদের কেমন করে মারা যায়!

ওয়াম্বাসী বলে, মাই ডিয়ার বাস্টার্ড! এসব প্রশ্নের ঠিকমত জবাব যদিচ আমি দিতে পারিব না, তবু আমার মনে সব চেয়ে বড় যে খটকা বেধেছে তা তোর দীর্ঘ তালিকায় নেই।

: বটে! সেটা কী? শুনি?

: হতভাগাটা অমন চোস্ত ইংরাজি বলতে শিখল কী করে!

বব্ অবাক দৃষ্টি মেলে পুরো পনেরো সেকেন্ড বসে রইল। তারপর যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বললে, লে হালুয়া! ঐ সামান্য কথাটা তোকে এভাবে ভাবিয়ে তুলেছে?

: সামান্য? না! ঐটাই সব চেয়ে অসামান্য! তোর প্রতেকটি প্রশ্নের একটা করে জবাব হতে পারে—সেগুলো আমাদের জ্ঞানরাজ্য-সীমার অতিরিক্ত হতে পারে, কিন্তু তা যুক্তিরাজ্যের বাইরে নয়। তোর ছয়টি প্রশ্নের জবাবে এক নিশ্বাসে আমি বলতে পারি—ওরা অপার্থিব জীব, এসেছে দশ-বিশ লাইট-ইয়ার দূরের কোনো নক্ষত্রের গ্রহ থেকে, সময় লেগেছে বিশ-ত্রিশ বছর, ওদের ঐ অদ্ভুত অনার্য থিয়োরির জন্য এভাবে ধ্বংসলীলায় ওরা মেতেছিল; ওদের দেহ বুলেটপ্রুফ পদার্থে তৈরি এবং তোর ছয় নম্বর প্রশ্নের জবাব—ওরা হয়তো অমর নয়, কিন্তু কী ভাবে ওদের বধ করা যাবে, তা আমরা জানি না। কিন্তু তুই এবার আমার প্রশ্নটার জবাব দে তো! ও কীভাবে ইংরাজি বলতে শিখল?

: কীভাবে আবার! তুই-আমি যেভাবে শিখেছি!

: না বন্ধু, অত সহজ নয়। ধরা যাক, ওর বয়স পঞ্চাশ। তাহলে ওর জীবনের প্রথম পঁয়তাল্লিশটা বছর কেটেছে অন্য নক্ষত্রের গ্রহে—যেখানে ইংরাজি ভাষা নেই। তার মানে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত ও ইংরেজি শোনেনি। আবার দেখছি, এখানে পৌঁছেই যাবতীয় অনার্যদের ওরা হত্যা করেছে। এখন পৃথিবীতে যেসব প্রায়-মানব আছে, তারা জান্তব-শব্দ উচ্চারণ করে—ইংরাজি বলে না। তাহলে ও ভাষাটা শিখল কেমন করে?

বব্ রয় কান চুলকালো। ভাবল। তারপর বললে, হুঁ! কথাটা ফেলনা নয়। কিন্তু এটা তো মানবি, ওরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান? ওদের আই. কিউ. খুব বেশি। ধর, আমি যদি বলি—এই বিধ্বস্ত পৃথিবীতেই ও কিছু ইংরাজি বই উদ্ধার করে ভাষাটা নিজে-নিজেই শিখে ফেলেছে?

: মায় উচ্চারণ?

: ধর, কিছু টেপ্-রেকর্ড আর গ্রামোফোন ডিস্কও ও কোনোক্রমে উদ্ধার করেছিল!

ওয়াম্বসী হেসে বলে, মাই ডিয়ার ডক্টর ওয়াটসন! তুই একটা ভাইটাল ক্লু বাদ দিয়ে যাচ্ছিস। অতটা বুদ্ধি আর অধ্যবসায় থাকলে ইংরাজি ভাষার বদলে জার্মান ভাষা শিখত। ইংরাজি ওর কাছে একটা মৃত ভাষা—কোনো কাজে লাগার কথা নয় ওর; অথচ ওদের ধর্মগ্রন্থ জার্মান ভাষায় লেখা। ও নিজমুখেই স্বীকার করেছে—সে ভাষা ও চেষ্টা করেও শিখতে পারেনি। ভাষা শেখার ব্যাপারে ওর আই. কিউ. আমার চেয়ে খুব বেশি নয়। আমি সতেরো বছর বয়সেই জার্মান ভাষা শিখেছি! আরও একটা কথা—ওদের ভগবানই বা কেমন করে জার্মান ভাষায় বইটা লিখল? নো—মাই ডিয়ার হোরাশিও—দেয়ার্স মোর থিং ইন হেভেন এ্যান্ড আর্থ.....

ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বব্ বলে, তুই থামবি? এমনিতেই মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে—তার মধ্যে আমাকে কখনও ডাকছিস 'ওয়াটসন' কখনও 'হোরাশিও'! ওসব নাম কোথায় পেলি? তুই বাপু আমাকে 'বাস্টার্ড' বলেই ডাকিস্! ওসব বদ-নাম আমার সইবে না।

পরদিন বন্দিদের যারা নিয়ে যেতে এল তারা আজব-জীব। জেনারেল ব্যাটলার স্বয়ং আসেননি। পাঠিয়ে দিয়েছেন একটি রোবট-শ্রেণীর যন্ত্রমানবকে। সঙ্গে তার যন্ত্র-দেহরক্ষী। রোবো'-টার অঙ্গে কোনও বোরখা ছিল না। এমন রোবো ওরা আগেও দেখেছে। সে কথা বলতে পারে না। তার বুকে আটকানো আছে একটা টি. ভি স্ক্রিন। হাত, পা, মাথা আছে। কলের পুতুলের মতো এসে দাঁড়ালো ওদের সামনে। তার দু-পাশে আরও ছয়টি বিচিত্র দর্শন রোবো। অনেকটা আরশোলা বা কচ্ছপের মত দেখতে। প্রায় হাত-দেড়েক লম্বা। ছয়টা পা এবং দুটি টেনটেক্‌ল্ অর্থাৎ শুঁড় আছে। সময়ে সময়ে তারা দুপায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে, ঐভাবে ধীরে ধীরে হাঁটি-হাঁটি-পা-পা ছন্দে হাঁটতেও পারে—তখন তাদের লুইস ক্যারল বর্ণিত মক্-টার্টল-এর মতো দেখতে হয়। তখন পিছনের পা দুটি হয় চরণ, সামনের ও মাঝের চারখানা ঠ্যাঙ হয়ে যায় হাত। বব্ এবং ওয়াম্বাসী তাদের দেখেই চিনতে

পারে—ওরা প্রাথমিক যুগের রোবো। প্রায় একশ বছর আগেই এজাতীয় যন্ত্র-জীব মানব-বিজ্ঞান তৈরি করতে পেরেছিল—1940 সাল নাগাদ। তখন মানব-বিজ্ঞান তার নাম রেখেছিল Machina Speculatrix।

বব্ প্রশ্ন করে, কোন চুলোয় যেতে হবে আমাদের?

বাক্-প্রয়োগের ঐ বিচিত্র শৈলী সত্ত্বেও তার মর্মার্থ বুঝে নিতে রোবটটার অসুবিধা হল না। সে কথা বলতে পারে না। তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর ফুটে উঠল ওর বুকে সাঁটা টি. ভি. স্ক্রিনে। সিনেমার পর্দায় যেমন ঝপ করে একসঙ্গে লেখা ফুটে ওঠে সেভাবে নয়, টেলিপ্রিন্টার অথবা টাইপরাইটারের ভঙ্গিমায় বাম থেকে ডাইনে টপাটপ অক্ষরগুলো ফুটে উঠল : আমাদের সর্বাধিনায়ক মহামহিমার্ণব বিশ্বাধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত লেকজান্ডা দি গ্রেটের রাজসভায়!

বব্ অস্ফুটে বললে, লে হালুয়া! বেটা নাটক করছে নাকি?

ওয়াম্বাসী গম্ভীর ভাবে বললে, তুমি কে? কী নাম?

: আমি সর্বাধিনায়কের দেহরক্ষী। আমার নাম ডেল্টা-19।

এই তাহলে ওদের শ্রেণী-বিন্যাস অনুযায়ী ডেল্টা শ্রেণীর জীব! তাহলে ঐ আরশোলা-প্রতিম যন্ত্র-জীবগুলো নিশ্চয় এপ্সাইলন শ্রেণী ভুক্ত। সেই মর্মে প্রশ্ন করল ওয়াম্বাসী। ডেলটা-19 লিখিত জবাব দাখিল করল, আজ্ঞে হ্যাঁ; কিন্তু আপনারা অযথা কালবিলম্ব করবেন না। ওদিকে রাজসভায় মহামহিমার্ণব বিশ্বাধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত

ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বব্ বলে ওঠে : ছি! বোকা ছেলে। শুধু 'শ্রী' বলতে নেই, ওতে বিশ্রী শোনায়। এবার থেকে '১০০৮ শ্রী' বলবে। কেমন?

ডেল্টা-19-এর পেছনে দুই বন্দি—তাদের ঘিরে ষটপদ ছয়টি এপসাইলন প্রহরী-বেষ্টিত দুই মানবসন্তান—এসে উপস্থিত হল রাজসভায়। বিশ্বাধিপতির রাজসভাটির কিন্তু বিশেষ জাঁকজমক নেই। নিতান্ত ঘরোয়া আয়োজন। বস্তুত সেটা কোনো নবনির্মিত রাজপ্রাসাদই নয়। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ঘটনাচক্রে টিকে থাকা একটা পরিত্যক্ত গ্রাম্য গির্জা—অ্যাংলিকান প্যারিশ চার্চ।

ওরা সিঁড়ির কাছাকাছি এসে পৌঁছাতেই দু-পাশে সার দিয়ে শুয়ে থাকা এপসাইন আরশোলা পেছনের পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়ালো, মাঝের হাত দুটি মাজায় রেখে সামনের দুটি হাতে শিঙের মতো একটা বাদ্যযন্ত্র ধরে তূর্যধ্বনি করল। ববের মনে হল—ওয়াল্ট ডিজনের কোনো অতি জীর্ণ ফিল্ম দেখছে। ডেল্টা-19 এতক্ষণ বেশ গুড়গুড়িয়ে আসছিল—গির্জার প্রবেশদ্বারে পৌঁছেই মরালছন্দে অর্থাৎ 'গুজ স্টেপে' এগিয়ে চলে কেন্দ্রীয় 'নেভ' অংশ দিয়ে। দু ধারের 'আইল'-এ সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ডেল্টা-এপসাইলনের দল—সাধারণ প্রজাবৃন্দ। গির্জার দু-পাশে—যে অংশকে বলে সাইড অল্টার, পাতা থাকে ক্রিডেন্স টেব্‌ল, সেখানে অপেক্ষাকৃত অভিজাত সম্প্রদায়, গামার দল। গির্জার কেন্দ্রবিন্দুতে—অর্থাৎ হাই অল্টারে বসে আছেন সর্বাধিনায়ক স্বয়ং। পরিধানে গ্রিক পোশাক; মস্তকে গজদন্তশোভিত একটি হস্তিমুণ্ডের মুকুট; বামস্কন্ধে চীনাংশুক উত্তরীয়ের গ্রন্থি, দক্ষিণ হস্তে শাসনদণ্ড, কোমরবন্ধে বিশাল ঋজু তরবারি। তাঁর দুই পার্শ্বে দুই প্রধান সেনাপতি। একজন ওদের পরিচিত রুডল্ফ্ ব্যাটলার, বসেছেন রাজার বামে, দক্ষিণে নন। রাজার দক্ষিণে যিনি বসে আছেন তিনি স্থূলকায়, তাঁর মুখে একটি প্রকাণ্ড চুরুট। সিংহাসনের ওপরে একটা অলিন্দ—যাকে বলে 'রুড লফ্ট'; সেখানে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কয়েকজন। তাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে মনে হয় তাঁরা স্ত্রীজাতীয়া। ওরা পরে জেনেছিল তাঁরা বীটা শ্রেণীভুক্তা।

ববের মনে হল—এটা বাস্তব দুনিয়া নয়, বিরাট একটা রঙ্গমঞ্চ!

কেন্দ্রীয় গলিপথ দিয়ে প্রহরী-বেষ্টিত বন্দীদল এগিয়ে এসে থামল। ডেল্টা-19 এ্যাটেনশন হল, তারপর ডান হাতটা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে রীতিমত গ্রিক কায়দায় সম্রাটকে অভিবাদন জানালো। বেচারি কথা বলতে পারে না। তার উদরদেশে পটাপট ফুটে উঠল রাজসম্ভাষণ : জয়তু বিশ্বাধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত ১০০৮!

জেনারলে ব্যাটলার উঠে দাঁড়ালেন। সম্রাটের হয়ে প্রত্যভিবাদন করলেন : হেইল লেকজান্ডা!

তারপর সম্রাটের দিকে ফিরে একটি অনুচ্চ গলা খাঁকারি দিলেন।

সম্রাটের বয়স হয়েছে। এতক্ষণে বসে বসে বামহস্তে একটি পাখির পালক বাম কর্ণকুহরে প্রবেশ করাতে ব্যস্ত ছিলেন। কয়েক মুহূর্ত পূর্বে তিনি কিঞ্চিৎ-মাত্রায় নিদ্রাভিভূত হয়ে থাকবেন। সেনাপতির অনুচ্চ গলা খাঁকারিতে তাঁর চট্‌কা ভেঙে গেল, অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন, আমি জাগরিতই আছি!

: বন্দিরা উপস্থিত হয়েছে বিশ্বাধিপতি!

লেকজান্ডা দি গ্রেট উঠে দাঁড়ালেন। বয়স হোক, তিনি সোজা হয়ে হাঁটছিলেন। ধীরে ধীরে নেমে এলেন স্যাংচুয়ারির সোপান বেয়ে। বন্দিদ্বয়ের সমীপবর্তী হয়ে তিনি থামলেন, গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে সম্রাট বললেন, বন্দিদ্বয়! তোমরা আমার নিকট কীরূপ আচরণ প্রত্যাশা কর?

বব্ অস্ফুটে আপনমনে বললে, লে হালুয়া!

ওয়াম্বাসী কিন্তু ভোলেনি। এক পা অগ্রসর হয় সে। সম্রাটের নিকট মাথা নত করে না আদৌ। স্বামীজির ভঙ্গিতে বুকে হাত দুটি জড়ো করে মাথা সোজা রেখে বললে, বীরের প্রতি বীরের যে আচরণ পৃথিবীপতি!

সম্রাট হাসলেন। ফিক্ করে। বাম দিকে ফিরে রুডল্‌ফ্‌কে বললেন, দেখলে? বলিনি আমি? ওদেরও বুদ্ধিসুদ্ধি থাকতে পারে। তোমার ও অনার্য-থিয়োরি কোনো কাজের নয়!

তারপর ওয়াম্বাসীর দিকে ফিরে বললেন, যাও বীর, মুক্ত তুমি! এতক্ষণে ওয়াম্বাসী সম্রাটকে অভিবাদন করে। পিছন না ফিরে ব্যাকগিয়ারে পিছিয়ে যেতে থাকে। বব্ হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পায়। সেও ঐভাবে কেটে পড়ার তাল করতেই সম্রাট হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন, এ্যাই! বেয়াদব! তুই কোথায় পালাচ্ছিস?

থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ে বব্ রয়। সম্রাট বলেন, তুই এখনও পাস করিসনি!

ওয়াম্বাসী পুনরায় অভিবাদন করে বলে, সম্রাট মহানুভব, কিন্তু আমার বন্ধুটি বে-আদপ নয়। বেচারি শুধু বিজ্ঞান চর্চাই করেছে। সাহিত্য-ইতিহাস ও আদৌ পড়েনি।

: সে তো দেখতেই পাচ্ছি। হতভাগা বিড়বিড় করে কী বলেছে জান? বলেছে, 'লে হালুয়া!' রাজসভায় 'হালুয়া'! সে যাই হোক, তুমি ওকে একটু সহবৎ শিখিয়ে নিও। যাও, বসো গিয়ে ঐ দিকে। আমাকে রাজকার্য করতে দাও দিকিনি!

দু-বন্ধু গুটিগুটি গিয়ে রাজসভায় একান্তে বসে পড়ে।

রাজকার্য কিন্তু বেশিক্ষণ চলল না। চলবে কোথা থেকে? বস্তুত রাজসভায় আদৌ কোনো সমস্যা ছিল না, যার সমাধান প্রয়োজন। বিশ্বাধিপতির সাম্রাজ্য বিশাল—সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর তিনি, কিন্তু তাঁর প্রজা বলতে কেউ নেই। ফলে সমস্যাও নেই। ঘন্টাখানেকের মধ্যে নকিবে রাজসভার অবসান ঘোষণা করল। বীটা, গামা, এপসাইলনের দল সম্রাটকে অভিবাদন করে ব্যাকগিয়ারে সভাকক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হল। মহামহিম সম্রাট তখন বাকি ক'জনকে ডেকে বললেন, এবার সবাই ঘনিয়ে এসে বসো দিকিনি। কাজের কথাগুলি সেরে ফেলি।

সম্রাটকে সবাই ঘিরে বসে। দুপাশে দুই আল্‌ফা সেনাপতি। সামনের সারিতে পাঁচ-সাতজন বুদ্ধিজীবী, গামা পণ্ডিত। আর হংসমধ্যে বকো যথা, একজোড়া মানুষের বাচ্চা—সাদায়-কালোয়।

সম্রাট ওদের দুজনকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে বললেন, দেখ বাপু, আমি সোজা কথার মানুষ। মনে এক, মুখে এক—এ আমার ধাতে নেই। তোমরা দুজন আকাশ পাড়ি দিয়ে আসছ, এ খবর আমরা অনেক আগেই পেয়েছি। আমিই তোমাদের দুজনকে এখানে নিয়ে আসতে বলেছিলাম। বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। সে কথা পরে বলছি, আগে আমাদের মোটামুটি পরিচয়টা দিয়ে রাখি। তোমরা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে জেনেছ—আমাদের পাঁচটা শ্রেণী। এ শ্রেণী-বিভাগ আমরা করিনি, করেছেন স্বয়ং ঈশ্বর। তিনি নিজমুখেই কবুল করেছেন 'পঞ্চবর্ণং ময়া সৃষ্টং'—সুতরাং এইসব খেয়োখেয়ি, শ্রেণী-সংগ্রাম সব তাঁরই সৃষ্টি; আমরা নিমিত্ত মাত্র। বর্ণশ্রেষ্ঠ আমরা আছি কুল্লে তিনজন। আমি এবং আমার এই দুই

প্রধান সেনাপতি। ওঁরা নাকি আমার দুই হাত। কোনটি যে দক্ষিণ হস্ত এবং কোনটি যে বাম, তা আজও আমি ঠাহর করে উঠতে পারিনি। বস্তুত পরম কারুণিক ঈশ্বর সৃষ্টির আদিতে পাঁচটি আল্‌ফা শ্রেণীর জীব সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু তার ভিতর দুজন গত বিশ্বযুদ্ধে শহিদ হয়েছেন।

বব্ সোৎসাহে বলে, কেমন করে?

সম্রাট প্রত্যুত্তর করার পূর্বেই লাফিয়ে ওঠেন রুডল্‌ফ্ ব্যাট্‌লার : ফ্যুরার! ও বেটা কায়দা করে আমাদের হত্যা করার কৌশলটা জেনে নিতে চায়। বলবেন না, খবরদার বলবেন না। বেটা অনার্য!

সম্রাট হতাশ হয়ে ওয়াম্বাসীকে বলেন, দেখলে? এই হয়েছে মুশকিল! আমার দুই সেনাপতি আমার বুদ্ধির ওপর আস্থা রাখতে পারেন না। দোষ ওঁদের নয়, আমার চিন্তাধারা আর ওঁদের রাজনীতির মধ্যে দু-হাজার বছরের ফারাক। আমারই দুর্ভাগ্য। ঈশ্বরের ত্রুটি নেই—তিনি ধাপে ধাপে পাঁচটি আলফা যা বানিয়েছিলেন তা খানদানি। গত বিশ্বযুদ্ধে যে দুজন শহিদ হয়েছেন তাঁরাও ছিলেন দুই ধুরন্দর জেনারেল—গুলিয়াস গীজার এবং ন্যাপলা বোনাইপার্ট। তারা না থাকতেই এই বুড়োর সঙ্গে ঐ নওজোয়ানদের শুধু জেনারেশান গ্যাপ নয়, মিলেনিয়াম গ্যাপ্!

গামা শ্রেণীর কে একজন বললেন, মহামহিম সম্রাট, আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় থেকে—

বৃদ্ধ সম্রাট তাঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলেন, জানি রে বাপু, জানি। আসছি, তোমাদের প্রসঙ্গে ও আসছি। হ্যাঁ, এই এঁরা ক'জন হচ্ছেন 'গামা' শ্রেণীর। গামার গানে 'মধ্যমে'র বদলে 'ধৈবত' লাগালেই সুরটা অবশ্য ভাল খোলতাই হত। মোট কথা গামারা হচ্ছেন বদ্ধ উন্মাদের দল। যেমন হস্তিমূর্খ, তেমন বদ্ধ উন্মাদ। এঁদের মধ্যে যাঁরা অন্ধ তাঁরা মহাকাব্য রচনা করতে চান, যাঁরা বধির তাঁরা রচনা করতে চান 'সিম্‌ফনি'। তবেই বুঝে দেখ! মিডলটন অন্ধ মানুষ, তুই গানে সুর লাগা না কেন? তা নয়, মহাকাব্য লিখব! আবার বিটল্‌ফেন চোখে দেখে—চেষ্টা করলে হয়তো সে পদ্য-টদ্য লিখতে পারত! তা নয়, সে গানে সুর দিতে চায়। অথচ সে বদ্ধ বধির উন্মাদ। বদ্ধ উন্মাদ সব!

সম্রাটকে বাধা দিয়ে আর একজন বব্‌ভো দাড়িওয়ালা গামা পণ্ডিত উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, সম্রাট! আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না—

সম্রাটও খেঁকিয়ে ওঠেন, থাক থাক, তোমাকে আর পাণ্ডিত্য জাহির করতে হবে না দা-ভেংচি! জান হে ওয়াম্বাসী—এই লোকটা হচ্ছে 'মাস্টার অফ অল ট্রেডস্—জ্যাক অব নান্!' হেন বিষয় নেই যার মধ্যে ঐ শুকচঞ্চু নাকটা না ঢুকিয়েছে, ফলে জ্যাকপটটা কোনোদিনই হিট করতে পারল না। প্রতিভার এক বিচিত্র ভেংচি!

আর একজন পণ্ডিত এবার দাঁড়িয়ে উঠে বলেন, মহামহিম সম্রাট যদি শ্রেণীগতভাবে আমাদের এইভাবে ক্রমাগত অপমান করতে থাকেন—

সম্রাট তাঁকেও মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলেন, কী করবে? বাপু হে, লেকজান্ডা দ্য গ্রেট তোমার গাছের পাকা আপেলটি নয় যে, টুপ করে পড়ল, আর সম্রাটকে মাধ্যাকর্ষণের মতো কপাৎ করে লুফে নিলে! বয়সের সম্মান দিতে শেখো!

ওয়াম্বাসী একটা অভিবাদন করে বললে, মহিমার্ণব! ওঁর নাম কি বাইজাক লংটন?

সম্রাট বলেন, না। ওর নাম হাইজ্যাক ওল্ডটন। লোকটা এত বড় হস্তিমূর্খ যে, স্থানকালপাত্রর জ্ঞান নেই। নিজে যখন বিশ বাঁও জলের নিচে সমুদ্রের ভেতর হাবুডুবু খাচ্ছে তখনও ভাবে—ও বুঝি সাগরবেলায় নুড়ি কুড়োচ্ছে! পাগল আর কাকে বলে? আর একজন আছেন—ঐ যে তোমার বাঁদিকে বসে, কি হে আইনস্টোন ঘুমালে নাকি!

: আজ্ঞে না। আমি থিংক করছি।

সম্রাট বলেন, ঐ আর এক তরুণ পাগল! দিনরাত শুধু থিংক করছেন! ছোকরা আঁকটা কষে ভালই; কিন্তু ওর ধারণা ও একজন ভালো বেহালাবাদক। এই পাগলের দল হচ্ছে গামা শ্রেণী।

জেনারেল ব্যাটলার কাজের মানুষ। বলে ওঠেন, সম্রাট, পাগলদের পরিচয় দেওয়া আপনি শেষ করেছেন—এবার আপনার ফতোয়াটা জারি করুন।

: ফতোয়া-টতোয়া নয়। শোন বাপু—কী নাম যেন তোমার? হ্যাঁ, ওয়াম্বাসী! আমাদের এখানে কতকগুলো সমস্যা আছে, যার সমাধান আমরা করে উঠতে পারছি না। আমরা তোমাদের দুজনের সাহায্য চাই। ব্যাপারটা তোমাদের ঐ আইনস্টোন ছোকরা বুঝিয়ে দেবে অখন। মোট কথা, আমাদের একটা শেষ লড়াই করতে হবে। তোমরা তাতে মুখ্য ভূমিকা নিতে পারবে। বস্তুত এমন একটা ব্যাপার আছে যা আমরা পারি না ঈশ্বরের এমনই বিধান, কিন্তু তোমরা—মানুষেরা—পার। সেই শেষ লড়াইটা আমাদের জিততে হবেই।

সৈন্যাধ্যক্ষদ্বয়ের দিকে ফিরে সম্রাট বলেন, কী বল তোমরা? আমরা জিততে পারব না?

ওয়েস্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক রুডল্‌ফ ব্যাটলার বললেন, ফ্যুরার অজেয়!

ঈস্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক এতাবৎকাল কোনও কথা বলেননি। ক্রমাগত চুরুট ফুঁকে গিয়েছেন। এখনও বললেন না। সম্রাট সবার শেষে তাঁর দিকে দুটি জিজ্ঞাসু চোখের দৃষ্টি মেলে ধরতেই ডান হাতটা উঁচু করে দেখালেন। মুষ্টিবদ্ধ হাত—শুধু তর্জনী ও মধ্যমা একটি V-অক্ষর রচনা করেছে।

চার

: আসুন, আমাদের স্টুডিওটা আপনাদের ঘুরিয়ে দেখাই। এটা শুধু স্টুডিও নয়, 'স্টুডিও-কাম-ল্যাবরেটরি-কাম-লাইব্রেরি-কাম-লুনাটিক্ অ্যাসাইলাম্'। অর্থাৎ গামাদের ডর্মিটারি। এখানে আমরা সবাই মিলেমিশে থাকি।

প্রকাণ্ড হল কামরাটায় ঢুকল ওরা তিনজন। দুটি মানুষের বাচ্চা আর প্রফেসর আইনস্টোন। তিনিই ওদের সবকিছু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন। বইপত্র, রঙ-তুলি, যন্ত্রপাতি, মার্বেল আর প্ল্যাস্টার অব প্যারিসের পিণ্ড এবং বীক্ষণাগারের নানান সাজ-সরঞ্জাম ইতস্তত ছড়ানো। এক এক প্রান্তে এক একজন, কোথাও বা দু-তিনজন একত্রে নিজ নিজ গবেষণায় কিংবা আলোচনায় বুঁদ হয়ে আছেন। হল কামরায় ঢুকতেই বাঁদিকে দেখা গেল এক অন্ধ বৃদ্ধ কী একটা কবিতা আবৃত্তি করে যাচ্ছেন, আর তাঁর সম্মুখে টুলে বসে আর একজন অতি-বৃদ্ধ তা দ্রুতহাতে লিখে চলেছেন।

বব্ রয় বললে, উনি কী আবৃত্তি করে শোনাচ্ছেন?

: আবৃত্তি নয়, উনি রচনা করছেন। একটি নতুন মহাকাব্য। অন্ধ মানুষ তো, নিজে হাতে লিখতে পারেন না। চলুন না আলাপ করবেন।

ওয়াম্বাসী বাধা দিতে যাচ্ছিল, কবির মুড না নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু তার পূর্বেই আইনস্টোন অন্ধকে বললেন, কী মিডলটন দাদু, এবার কী কাব্য রচনা হচ্ছে?

অন্ধদৃষ্টি মেলে বৃদ্ধ বলেন, কে? আইনস্টোন নাকি? না দাদু, ও কিছু নয়। সামান্য একটা মহাকাব্য।

—সামান্য হোক, নামটা কী?

: "প্যারাডাইস টু বি রি-ক্রিয়েটেড' মানে 'যে নূতন স্বর্গ আমরা তৈরি করব'!

ওয়াম্বাসী আর স্থির থাকতে পারে না। বলে ওঠে, ঐ প্যারাডাইস আপনাকে আজও ছাড়েনি দেখছি। প্যারাডাইস লস্ট হল, রিগেইনড হল—তবু আপনার তৃপ্তি হল না?

বৃদ্ধ একগাল হেসে বললেন, ক্যা কিয়া যায়? ম্যয় তো ছোড়নেই চাহতা, লেকিন কম্‌লি নেহী ছোড়তি! ভেবে দেখলাম, বুয়েছ, ঐ ভগবানর তৈরি স্বর্গ নিয়ে মাতামাতি করাটা কোনো কাজের কথা নয়, তার চেয়ে এবার নিজেরাই একটা স্বর্গ বানালে কেমন হয়? Creation নয়, recreation—আনন্দ! শুনবে? ভেংচি-দা, ওদের একটু শুনিয়ে দাও না? ঐ 'প্রেলুড'-টুকু!

ওয়াম্বসীর এতক্ষণে খেয়াল হয় শ্রুতিলিখন লিখছিলেন যে বৃদ্ধ তিনি সেই 'মাস্টার অফ অল ট্রেডস্, জ্যাক অফ নান্!' ওয়াম্বাসী তাঁকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন করে কবি মিডলটনকে বলে, মাপ করবেন, ওঁর নাম 'ভেংচি-দা', না কি 'দা-ভেংচি'?

কবি হেসে বলেন, আরে না রে বাপু না, 'দা' মানে এখানে 'দাদা'। দা ভেংচি আমার চেয়ে বয়সে বড় নন? দেড়শ' বছরের বড়।

দা-ভেংচির সবকিছু নিখুঁত হওয়া চাই। বলেন, দেড়শ' নয়, একশ ছাপ্পান্ন।

: ঐ একই কথা!

: না। মোটই এককথা নয়। চার শতাংশ ভুল হয়েছে।

: আচ্ছা দাদা! না হয় তাই হয়েছে।

ওয়াম্বাসী দা-ভেংচিকে বলে, মহাকাব্যের প্রথম অংশটা.....

দা-ভেংচি বিনা বাক্যব্যয়ে খাতাখানা ওদের দিকে বাড়িয়ে ধরেন। ওয়াম্বাসী অবাক হয়ে দেখে, হরফগুলো তার অচেনা। ইংরাজি ভাষাই নয়, অন্তত রোমান হরফ নয়।

মুখ তুলে মনে হল, গোঁফ-দাড়ির জঙ্গল ভেদ করে দা-ভেংচি যেন ভেংচি কাটছেন।

প্রফেসর আইনস্টোন ওয়াম্বাসীর কানে কানে বলেন, আয়নার সামনে না ধরলে ও লেখা পড়া যাবে না! চলুন, অন্যত্র যাওয়া যাক।

বব্ বললে, সম্রাট ঠিকই বলেছিলেন। বদ্ধ উন্মাদ সব! শ্রুতিলিখন এমন উল্টো করে লেখার মানে? নেহাত পাগলের খেয়াল!

ওঁদের দুজনকে মহাকাব্য রচনায় বিভোর হতে দিয়ে ওরা এগিয়ে চলে। আর একটু আগে দেখে, আর একজন বৃদ্ধ উঁচু টুলে বসে জানলা দিয়ে বাইরে আকাশে কী দেখছেন। তাঁর হাতে একটা দূরবিন। আইনস্টোন বললেন, ওঁর সঙ্গে আলাপ করা যাবে না—উনি এই পৃথিবীতে থেকেও এখন মহাকাশে হারিয়ে গেছেন। ডাকলেও সাড়া দেবেন না এ-অবস্থায় ক্যালিলিও ক্যালিলি।

স্টুডিওর এখানে-ওখানে অনেক অনেক কাজ করছেন। যে যার নিজের কাজে বুঁদ। ওদের খেয়ালই করছেন না। বব্ বললে, এ উন্মাদাশ্রমে আর দেখার কী আছে! চলুন অন্য কোথাও যাই।

আইনস্টোন বললেন, ঐ কোনাটায় আমার সিট। ঐখানেই যাচ্ছি। আসুন।

প্রফেসর আইনস্টোনের খাট একেবারে দেওয়াল ঘেঁষে। তাঁর ডাইনের খাটখানা হচ্ছে হাইজ্যাক ওল্ডটনের, আর বাঁ দিকেরটা সঙ্গীতজ্ঞ বিটল্‌ফেন-এর। ওল্ডটন তাঁর সিটে নেই, বিটল্‌ফেন একখণ্ড স্বরলিপির সামনে লাঠি নেড়ে নেড়ে বোধকরি ব্যায়াম অভ্যাস করছেন।

আইনস্টোন ওদের আপ্যায়ন করে বসালেন। বললেন, সম্রাট আদেশ করেছেন, সমস্ত ব্যাপারটা আপনাদের বুঝিয়ে দিতে। আমি চেষ্টা করছি একেবারে গোড়া থেকেই শুরু করি। আমাদের গোড়ায় গলদ কোথায় জানেন? হাইপথেসিসেই গলদ। যত নষ্টের গোড়া স্বয়ং ঈশ্বর!

ওয়াম্বাসী আঁতকে ওঠে। বলে, প্রফেসর আইনস্টোন! আপনি....আপনি এ-কথা বলছেন? যত নষ্টের গোড়া স্বয়ং ঈশ্বর?

: আলবত বলছি! ও হো হো! আপনিও গোড়ায় গলদ করছেন—এখানে ঈশ্বর বলতে আমি সেই 'deeply emotional conviction of the presence of a superior reasoning power, which is revealed in the incomprehensible universe'-কে আদৌ বোঝাতে চাইছি না। এখানে God লিখতে ক্যাপিট্যাল 'G' ব্যবহৃত হবে না; ছোট হাতের 'g'— goat লিখতে, gorilla লিখতে, gestapo লিখতে যে 'g' লাগে তাই দিয়েই god লিখতে হবে। বুয়েছেন?

ওয়াম্বাসী মাথা নেড়ে বললে, আজ্ঞে না।

আইনস্টোন তাঁর প্ল্যাটিনাম-ব্লন্ড ঝাঁকড়া মাথা দুলিয়ে বলেন, বুঝেছি। আপনি এখনও সেই 'ওল্ডটনিয়ান ইউনিভার্সে' আছেন। স্থান-কাল-পাত্র যে সংপৃক্ত এ বোধ এখনও জন্মায়নি। আচ্ছা বলুন তো—এই আমরা, এই আলফা-বীটা-গামা-ডেল্‌টা-এপসাইলনের দল কোথা থেকে এসেছি?

বব্ বললে, ও প্রশ্নটা তো আমরা করব। কোন নক্ষত্রের গ্রহ থেকে এসেছেন?

অট্টহাস্য করে ওঠেন আইনস্টোন। বলেন, নক্ষত্রটা g-গ্রুপের +5 এ্যাবসোলিউট ম্যাগনিচুডের এবং সেটা এখান থেকে আছে আট আলো-মিনিট অর্থাৎ সাড়ে পনেরে কোটি কি.মি. দূরে। চিনতে পারলেন?

বব্ অবাক হয়ে বলে, মানে? সেটা তো আমাদের সূর্য!

: আজ্ঞে হ্যাঁ। সেই নক্ষত্রের তৃতীয় গ্রহে আমাদের জন্ম। মালুম হল?

: অর্থাৎ পৃথিবীতে?

: আজ্ঞে!

: আপনারা ভিন্ন নক্ষত্রের বাসিন্দা নন?

: মোটেই নই। বুঝেছি, ঐ ভ্রান্ত ধারণা কী করে হল আপনাদের! এ নিশ্চয় সেই ডাহা-মিথ্যুক ব্যাটলার ব্যাটার প্রচার। লোকটার ধারণা—মিথ্যা বার বার শুনতে শুনতে সেটা সত্য হয়ে যায়। আমাকেও বেটা দেশত্যাগী করেছিল!

: তাহলে আপনারা কে? আপনারা কী?

: আমরা যন্ত্র-মানব। মানুষের তৈরি । একবিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক বিস্ময়। যিনি আমাদের পয়দা করেছিলেন তাঁকেই বলছি 'গড'—ঐ ছোট হরফের 'g' দিয়ে।

: তিনি কে? কোন দেশের লোক? কী নাম? কোথায় থাকেন?

: তিনি আমেরিকান। নাম—এম. সি. গডফাদার। গত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে মারা গেছেন।

: তিনি একা হাতে আপনাদের এতগুলি 'ইয়ে'কে তৈরি করেছেন?

: না, একা হাতে নয়। তাহলে তাঁর ইতিহাসটা বিস্তারিত শুনুন—

গডফাদারের ইতিকথা অতঃপর বিস্তারিত শোনালেন প্রফেসর আইনস্টোন।

* * *

এম. সি. গডফাদারের পুরো নাম—মাল্‌টি-বিলিয়নেয়ার ক্যাপিটালিস্ট গড্‌ফাদার। কোটিপতি ধনকুবের। বাপ-পিতেমোর ছিল তেলের খনি। পৃথিবীর ভাণ্ডার থেকে পেট্রোলিয়াম একদিন ফুরালো, কিন্তু ওঁদের ধনতৃষ্ণা মিটল না। গডফাদার চাঁদে এবং মঙ্গলে তরলিত হাইড্রোজেন সাপ্লাইয়ের এক্সপোর্ট লাইসেন্স পেলেন! হোলসেল এজেন্সি। একচেটিয়া ব্যবসা। কোটিপতি হলেন অর্বুদপতি, পরার্ধপতি। কিন্তু নাদু মল্লিকের সেই অনবদ্য বাণীটি তাঁর জীবনেও মূর্ত হল : "সব সুখ কি আর হয় রে দাদা! গিন্নিটি ছিলেন খাণ্ডার!"

গডফাদারের দাম্পত্যজীবন সুখের ছিল না। শুধু দাম্পত্য নয়, পারিবারিক জীবন এবং ব্যক্তি-জীবনও! ভগবান তাঁকে এক হাতে যেমন দিয়েছেন, অপর হাতে কেড়েও নিয়েছেন অনেকখানি। পর পর চারবার বিবাহ-বিচ্ছেদের পর গডফাদার স্থির করলেন আর বিবাহই করবেন না। বিজ্ঞান এতটা উন্নতি করেছে কিন্তু এমন একটা সামান্য অসুখ সারাতে পারে না! লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করেও কিছু হল না। ভগবান তাঁকে পুরোপুরি মানুষ করেননি। শুধুমাত্র সন্তানের জনক হবার অধিকারই তিনি কেড়ে নেননি—স্ত্রীকে তৃপ্ত করার অধিকার থেকেও বঞ্চিত করেছেন।

সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে গডফাদার আত্মগোপন করলেন। এ ছাড়া উপায় ছিল না। সোসাইটিতে-ক্লাবে-পার্টিতে সর্বত্র মনে হত সবাই ওঁকে দেখে হাসছে। মেয়েরা এবং ছেলেরা। উনি স্থির করলেন—সন্তান ওঁর চাই, এক-আধটি নয়—এক দল; ছেলে-মেয়ে, বুড়ো-বাচ্চা। উনি তাদের পয়দা করবেন স্ত্রীর সাহায্যে নয়, বিজ্ঞানের সাহায্যে। উনি তাদের শুধু গডফাদার নন, হবেন ফাদার।

শতখানেক বাছা বাছা পণ্ডিতকে নিযুক্ত করলেন। গণিত-পদার্থবিদ্যা-ইলেক্‌ট্রনিক্স-জীববিজ্ঞানী, মানববিজ্ঞানী, ডাক্তার, মনোবিজ্ঞানী। যত টাকা লাগে সব চেয়ে সরেশ পণ্ডিতটি তাঁর চাই। কয়েক হাজার একর জমি কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে তৈরি হল কারখানা, ল্যাবরেটারি। সে আয়োজনের একমাত্র উপমান 'সান্তা ফে'-র অদূরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পারমাণবিক বোমা তৈরির প্রচেষ্টা। তেমনি শ্রেষ্ঠ মনীষার সমাবেশ, তেমনি গোপনীয়তা। দ্রুতগতি তৈরি হতে শুরু করল নানান জাতের রোবো—ইলেকট্রনিক ব্রেন—যাদের স্বপ্ন দেখেছিলেন 1920 সালে Karel Capek : Rossum's Universal Robot.

এই সময়েই ঘটল একটা ঘটনা। গডফাদারকে আসতে হল লন্ডনে—একজন ধুরন্ধর ব্রিটিশ বিজ্ঞানীকে বাগাতে। ঐ সময়ে নিতান্ত খেয়ালের বশে তিনি দেখতে গেলেন মাদাম তুসোঁর মোমের

পুতুল প্রদর্শনী। মাদাম তুসোঁ মোম দিয়ে প্রমাণ-সাইজ সব পুতুল বানিয়েছেন, ঐতিহাসিক সব চরিত্রের অনুরকণে। তারা বাস্তবের হুবহু প্রতিমূর্তি। গডফাদারের মনে একটা চিন্তার উদয় হল : মাদাম তুসোঁ যদি আর্টের সাহায্যে অতীতের বহিরঙ্গটা ধরতে পেরে থাকেন, তবে তিনি কি বিজ্ঞানের মাধ্যমে তার অন্তরঙ্গটা ধরতে পারেন না? তাঁর অজাত-সন্তানদের এলোমেলোভাবে তৈরি না করে তিনি যদি সুপরিকল্পিতভাবে একটা নয়া বিশ্ব রচনা করেন?

তখনই উনি রচনা করতে বসেন তাঁর থিসিস্—যেটা নাকি ঐ রোবোদের ধর্মগ্রন্থ। গডফাদার জার্মান ভাষা জানতেন—আরও জানতেন যে, তাঁর যন্ত্র-মানবদের শেখানো হচ্ছে ইংরাজি ভাষা। ফলে ভ্রমক্রমে যদি ওঁর থিসিস্ ঐ যন্ত্রমানবদের হাতে পড়ে, তাহলে তারা যাতে বুঝতে না পারে তাই জার্মান ভাষাতেই নোট করতে থাকেন। উনি ওঁর কল্পনায় ছকে ফেললেন ওঁর দুনিয়া।

রবীন্দ্রসাহিত্যের ভেতর দিয়ে যদি রবীন্দ্রনাথকে দেখতে পাই, বিবেকানন্দের রচনায় যদি পরিস্ফুট হয়ে ওঠেন স্বামীজি, অথবা বায়রনের কাব্যে যদি মানুষ বায়রন মূর্ত হয়ে ওঠেন—তাহলে এম. সি. গডফাদারের সৃষ্টিতেও প্রতিফলিত হতে বাধ্য সেই মানুষটি। ব্যক্তিজীবনে গডফাদার ছিলেন স্বেচ্ছা-সঞ্চারী, স্বৈরাচারী সম্রাটের মত! তাই তাঁর শ্রেণীবিন্যাসের সবার ওপরের ধাপে থাকল আল্‌ফা শ্রেণী—আলোকজান্ডার, সীজার, শার্লেমেইন, নেপোলিয়ন, চার্চিল এবং হিটলারের দল। ওর মতে ওরাই শ্রেষ্ঠ জীব। ওদেরই হাতে সে তুলে দিল তার নয়া-দুনিয়ার শাসন-ব্যবস্থা।

তার পরের ধাপেও গডফাদার রাখতে পারল না পৃথিবীর প্রকৃত প্রতিভাধরদের। একই কারণে। ব্যক্তিজীবনে সে নারীসঙ্গ পায়নি। রমণীর সৌন্দর্য তাকে মোহিত করেছে, মুগ্ধ করেছে—কিন্তু তৃপ্তি পায়নি তাদের নিয়ে। তাই দ্বিতীয় সারিতে সে রাখল ইতিহাসের অনিন্দ্যকান্তি সুন্দরীদের—বীটা শ্রেণী: ক্লিয়োপেট্রা, নেফারতিতি, হেলেন, নূরজাহাঁ থেকে গ্রেটা গার্বো, এলিজাবেথ টেইলার!

তিন নম্বর ধাপ হল গামা। ওর সৃষ্ট 'লেকজান্ডারের' মতো হয়তো ও নিজেও বিশ্বাস করত—ঐ গামা শ্রেণী হচ্ছে একটা 'নেসেসারি ঈভ্‌ল'— প্রয়োজনীয় আপদ, ওদের বাদও দেওয়া যায় না, রেখেও কোনও লাভ নেই। ফালতু পাগলের দল ঐ সব আর্কিমিদিস-গ্যালিলিও-নিউটন, শেক্সপীয়র-মিলটন-বিটোফেন-মোজার্ট; লিওনার্দো-মিকেলাঞ্জেলোর দল।

আইনস্টোন সখেদে বললেন, বুঝলেন ডক্টর ওয়াম্বাসী—এটাকেই আমি বলছি ঈশ্বরের (ছোট হরফের g-ওয়ালা) গোড়ায় গলদ। তিনি তাঁর সৃষ্টিকে সুন্দরতম করে তুলবার চিন্তাশক্তি দিলেন যাদের হাতে, তাদের হাতে দিলেন না সেটা রূপায়িত করার ক্ষমতা। আবার ক্ষমতা দিলেন যাদের হাতে, তাদের দিলেন না চিন্তা করার মানসিকতা। এইটাই সৃষ্টির আদিম ট্র্যাজেডি! লিওনার্দোকে ওরা বলল, ব্রোঞ্জের একটা অশ্বমূর্তি বানাতে, লিওনার্দো অপূর্ব একটি অশ্বমূর্তির মডেল বানালেন—যা নাকি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্পসম্পদ হতে পারত; কিন্তু বেটাদের তা পছন্দ হল না। ওরা ধাতুটা গলিয়ে তাই দিয়ে কামান বানালো। নোবেল-সাহেব ডিনমাইট বানালেন—টানেল তৈরি করার জন্য; ওরা তাই দিয়ে মানুষ খুন করতে শুরু করল। আমি যদি জানতে পারতাম ওরা ফর্মুলাটা দিয়ে এ্যাটম বোমা বানাবে, তাহলে কিছুতেই ফর্মুলাটা বিজ্ঞানকে উপহার দিতাম না।

বব্ বললে, কোন ফর্মুলাটার কথা বলছেন?

আইনস্টোন ইতস্তত করেন। নিজের ঢাক নিজে পেটাতে এখনও তাঁর সঙ্কোচ।

ওপাশ থেকে কে যেন বলে ওঠে—শোনেননি? $E = mC^2$! আইনস্টোনের ধারণা, ঐটেই বিজ্ঞানের ইতিহাসে সব চেয়ে দামি ফর্মুলা।

ওরা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে, কখন নিঃশব্দে এসে হাজির হয়েছেন স্যার হাইজ্যাক ওল্ডটন।

প্রফেসর আইনস্টোনের মুখ-চোখ লাল হয়ে ওঠে। বলেন, এ কথা আমি কোনোদিন বলিনি।

ওল্ডটন বলেন, মুখে বল না, মনে মনে তো ভাব! তুমি তো আমার ফর্মুলাটাকে পাত্তা দাও না। এত তোমার অহঙ্কার!

প্রফেসর আইনস্টোন বলেন, স্যার, আপনি আমার ওপর অবিচার করছেন! হ্যাঁ, আপনার

ফর্মুলাটায় মোটামুটি কাজ চলে—কিন্তু সেটা বিজ্ঞান-শাস্ত্রমতে নির্ভুল নয়। এ কথা আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি। কিন্তু সেটা অহঙ্কারমদে নয়, পদার্থবিজ্ঞানের নির্দেশে!

ওল্ডটন ওদের দিকে ফিরে বলে, বেশ আপনারাই বলুন, আমার ফর্মুলাটা কি ভুল?

ওয়াম্বাসী বলে, কোন্ ফর্মুলাটা স্যার?

: মাধ্যাকর্ষণের মূল সূত্রটা—$F = G \times \frac{m_1 \times m_2}{d^2}$

ওয়াম্বাসী রীতিমত কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে জবাব দিতে। স্যার হাইজ্যাক ওল্ডটনের মুখের ওপর কীভাবে বলে—এই ফর্মুলাটা বর্তমান বিজ্ঞানের নিরিখে নির্ভুল নয়। ঐ d^2-এর দুই সংখ্যাটি বর্তমান হিসাবমত ২.০০০০০০১। তাই ইতস্তত করে বলে, দেখুন স্যার, ঐ যে ফর্মুলাটা আগে শোনালেন $E = mC^2$, যেখানে 'E' মানে এনার্জি—

বাধা দিয়ে আইনস্টোন বলেন, আজ্ঞে না ডক্টর ওয়াম্বাসী, 'E' মানে এনার্জি নয়!

বব্ ওয়াম্বাসী দুজনেই আকাশ থেকে পড়ে। বলে, কী বলছেন স্যার? ঐ ফর্মুলায় 'E' মানে এনার্জি নয়?

: নিশ্চয় নয়!

: তবে 'E' মানে কী?

—Eternity ! অন্তত—'a superior reasoning power'! নিছক এনার্জি নয়!

ওয়াম্বাসী আত্মসমর্পণ করে, আমার সবকিছু গুলিয়ে যাচ্ছে স্যার।

বব্ বললে, বদ্ধ পাগল!

আইনস্টোন তাঁর সাদা মাথা নেড়ে বললেন, বুঝেছি। আপনারা আবার গোড়ায় গলদ করছেন—আপনারা ভাবছেন, উনি স্যার আইজ্যাক নিউটন এবং আমি আলবার্ট আইনস্টাইন। তাই তাঁদের তৈরি ফর্মুলার সঙ্গে আমাদের ফর্মুলাগুলো গুলিয়ে ফেলছেন। প্রথমে হাইপথেসিস্‌টা ঠিক করে নিন—উনি স্যার আইজাক নিউটন নন, উনি তাঁর ছায়া দিয়ে গড়া—হাইজ্যাক ওল্ডটন। আমি হচ্ছি—

ওয়াম্বাসী বাধা দিয়ে বলে, বুঝেছি। এবার তাহলে আপনাদের ঐ ফর্মুলা দুটি একটু বুঝিয়ে দেবেন?

আইনস্টোন বলেন, অফকোর্স! বড়দা, আপনি আপনারটা বোঝান। আসুন, আজ একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক—কার ফর্মুলাটা নির্ভুল!

ওল্ডটন ওঁর দিকে একটি অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেন, বেশ আজই ফয়সালা হয়ে যাক। এঁদের বিচারই আমরা মেনে নেব। শুনুন মশাইরা, বুঝিয়ে বলি। আমার ঐ ফর্মুলায় F হচ্ছেন Father অর্থাৎ God the Father, মানে ঈশ্বর; G হচ্ছে goodness, অর্থাৎ যা কিছু ভালো। m_1 হচ্ছে man—মানুষ; m_2 হচ্ছে machine—যন্ত্র। আমি বলতে চাইছি—মানুষ ও যন্ত্র যত উন্নতমানের হচ্ছে ততই তারা তাদের চরম লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। d হচ্ছে ঐ ফর্মুলায় দূরত্ব—অর্থাৎ man এবং machine যতই বিভেদ সৃষ্টি করবে, d যত বাড়বে—ততই তারা চরম লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যাবে। m_1 m_2 goodness-এর মাধ্যমে Father-এর কাছে যাবে, বিভেদ ভুলে, অর্থাৎ 'd'-কে কমিয়ে। এ ফর্মুলায় ভুল কোথায়?

বব্ শুধু বললে, লে হালুয়া।

ওয়াম্বাসী তাও বলতে পারল না। তার চোয়ালের নিম্নাংশ শুধু ঝুলে পড়ল। জবাব দিলেন প্রফেসর আইনস্টোন। বললেন, শুনুন বড়দা। আমার প্রথম আপত্তি man কেন m_1 এবং machine কেন m_2? যন্ত্রের চেয়ে মানুষ কোন প্রযুক্তিতে প্রাধান্য পেল?

হাইজ্যাক বলেন, অতি সহজ যুক্তিতে। যেহেতু মানুষই যন্ত্র তৈরি করেছে। যন্ত্র মানুষ তৈরি করেনি। আগে মানুষ এসেছে দুনিয়ায়, পরে এসেছে যন্ত্র!

আইনস্টোন রীতিমত টেবিল চাপড়ে বললেন, আই বেগ টু ডিফার! আমি একমত নই। আমার মতে মানুষ যন্ত্র তৈরি করেনি, বরং যন্ত্রই মানুষ তৈরি করেছে। এ দুনিয়ায় আগে এসেছে যন্ত্র, পরে এসেছে মানুষ!

হাইজ্যাক বলেন, বেশ এইটেই আমাদের প্রথম বিচার্য বিষয় হোক। দেখ, বিচারকেরা কী রায় দেন? কী মশাই? কে ঠিক বলছে, কে ভুল বলছে?

সমস্ত ব্যাপারটাই যদিচ মাথামুণ্ডুহীন, তবু ববের মনে হল এ কথার ফয়সালা এককথায় হতে পারে। নিঃসন্দেহে হাইজ্যাকই ঠিক বলছেন, আইনস্টোন ভ্রান্ত। সে নিজ মতামত ব্যাক্ত করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার পূর্বেই ওয়াম্বাসী বলে, মামলা আমাদের ডিভিশন বেঞ্চ গ্রহণ করেছে; কিন্তু 'আর্গুমেন্ট' না শুনে কী করে রায় দিই? আপনারা আপনাদের সওয়াল শুরু করুন। একে একে। স্যার হাইজ্যাকই কাউন্সেল অব দ্য প্রসিকিউশান। আপনিই আগে বলুন।

হাইজ্যাক সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলেন, য়োর অনার্স। আমার প্রতিপাদ্য বিষয়টি স্বতঃসিদ্ধ। যন্ত্রের সংজ্ঞা কী?—যন্ত্র হচ্ছে এমন কিছু যা নির্মিত হয় শ্রমলাঘবের উদ্দেশ্যে। মানুষ না থাকলে শ্রমলাঘবের প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং জাদুকর যেমন নিজের কাঁধে চড়তে পারে না—যন্ত্রও তেমনি মানুষের আগে পয়দা হতে পারে না। এই আমার যুক্তি!

ওয়াম্বাসী বলে, প্রফেসর আইনস্টোন, কাউন্সেল অফ ডিফেন্স! এবার আপনার পালা। আপনি এবার সওয়াল করুন।

প্রফেসর আইনস্টোন সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ান। একটি বাও করে বলেন, য়োর অনার্স! আমার সহযোগী একটি গোড়ায় গলদ করেছেন। ওঁর নামের মধ্যেই ওঁর চিন্তাধারার সংস্কারাচ্ছন্ন রূপটা পরিস্ফুট। 'হাইজ্যাক' মানে জোর করে যুক্তির বিরুদ্ধে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া—'ওল্ড' মানে.....

স্যার হাইজ্যাক ওল্ডটন তড়াক করে উঠে দাঁড়ান। চীৎকার করে ওঠেন, আর 'আইনস্টোন' মানে আইনের প্রতি যে স্টোন ডেফ্! যুক্তির প্রতি বদ্ধ বধির!

ওয়াম্বাসী টেবিলের ওপর আইনস্টোনের স্লাইডরুলটা ঠুকতে ঠুকতে বলে, অর্ডার! অর্ডার! আদালত এ-জাতীয় ব্যক্তিগত বাদানুবাদ পছন্দ করেন না। আপনারা দুজনেই আমাদের শ্রদ্ধাভাজন—তবু আমি আপনাদের সাবধান করে দিচ্ছি। ইয়েস, মিস্টার ডিফেন্স কাউন্সেল, য়ু মে প্রসিড!

প্রফেসর আইনস্টোন পুনরায় একটি বাও করে বলেন, মি লর্ড! আমি দুঃখিত। স্যার হাইজ্যাককে আমি শ্রদ্ধা করি, বোধ করি সবার চেয়ে বেশি। বিজ্ঞানের তিনি যতটা উন্নতি করেছেন—একক প্রচেষ্টায় খুব কম লোকই তা পেরেছেন—এজন্য তিনি শুধু আমার নন, দুনিয়ার নমস্য।

স্যার হাইজ্যাককে এখন বেশ খুশি-খুশি দেখাচ্ছে।

* * *

আইনস্টোন বলতে থাকেন, মি লর্ড! মানব-ইতিহাসের একেবারে প্রথমযুগে চলে যান। আমরা ডারউইনিয়ান থিয়োরি অনুযায়ী জানি—প্রায়-মানুষ, মানে homo-sapiens—পয়দা হওয়ার আগে একই বিবর্তনধারায় মানবের পূর্বপুরুষ ছিল হোমো-ইরেক্টাস, 1470 প্রায়-মানব, অস্ট্রালোপিথেকাস, রামাপিথেকাস প্রভৃতি। আজ থেকে ধরুন বিশ-ত্রিশ লক্ষ বছর আগেকার কথা আমি বলছি। তখনও পৃথিবীতে 'মানুষ' জন্মায়নি। হোমো-ইরেকটাসরাও নয়। সেই প্রায়-মানবদের একটি দল লক্ষ্য করল, তাদের সামনের দুটি পা—আজ্ঞে হ্যাঁ, তখন তারা চার পায়ে হাঁটে—সামনের দুটি পায়ের আঙুল নাড়ানো যাচ্ছে। কয়েক লক্ষ বছরের প্রচেষ্টায় একদিন সে একটা পাথরের টুকরোকে মুঠো করে ধরতে পারল। সেটাকে ছুঁড়তে পারল। ওর সেই প্রায় এক লিটার পরিমাণ মস্তিষ্কের বুদ্ধিতে সে বুঝতে পারল, ঐ ছুঁড়ে মারার কায়দাটা জীবনসংগ্রামের একটা মস্ত হাতিয়ার! স্যেবর-টুথ্ড্ টাইগার তার নখ ছুঁড়তে পারে না, ম্যামথ তার দাঁত ছুঁড়তে পারে না, বন্য বাইসন তার শিঙ ছুঁড়তে পারে না—কিন্তু সে নিরাপদ দূরত্ব থেকে পাথর ছুঁড়তে পারে। য়োর অনার! সেই প্রথম উৎক্ষিপ্ত পাথরের টুকরোটা হচ্ছে এই

দুনিয়ার প্রথম যন্ত্র—মেশিন; যার ডেফিনিশান আমার সহযোগীর মতে—'যন্ত্র হচ্ছে এমন কিছু যা নির্মিত হয় শ্রমলাঘবের জন্য।' মি-লর্ড! হিসাব করে দেখুন—এই বিশ-ত্রিশ লক্ষ বৎসর পূর্বে দুনিয়ায় যখন প্রথম যন্ত্র এল তখনও মানুষ আসেনি! এমনকি মানুষের ঠিক পূর্ববর্তী ধাপের 'হোমো-ইরেকটাস'রাও আসেনি। এবার বিচার করে দেখুন হুজুর—যন্ত্র কীভাবে মানুষকে পয়দা করল। পাথর ছুঁড়তে শেখার পর, অর্থাৎ প্রথম যন্ত্র ব্যবহারের পর, সেই চারপেয়ে জন্তু সামনের দুটি পা-কে হাত হিসাবে ব্যবহার করার তাগিদে দু-পায়ে দাঁড়াতে শিখল—হল হোমো-ইরেকটাস, 'দণ্ডায়মান প্রায়-মানব'! এখন তারা গাছের ডাল ব্যবহার করতে শিখেছে, অর্থাৎ ভ্রামক-তত্ত্ব জেনেছে। হাতটাকে লিভার-আর্ম হিসাবে ব্যবহার করে উন্নততর যন্ত্রের ব্যবহার শিখেছে! তখন তাদের আরও বিবর্তন হল। জন্ম নিল হোমো-স্যাপিয়ান্স! ফলে, আপনিই বলুন—মানুষ যন্ত্র তৈরি করেছে, না যন্ত্র 'মানুষ' তৈরি করেছে?

ববের মনে হল, আলবার্ট আইনস্টাইন যেভাবে বিপ্লবাত্মক চিন্তাধারায় একসময়ে নিউটনকে নস্যাৎ করেছিলেন—এই আইনস্টোনও প্রায় সেভাবেই ফ্ল্যাট করে দিলেন হাইজ্যাককে।

প্রফেসর আইনস্টোন তখনও সওয়াল করে চলেছেন, য়োর অনার, তাই ঐ ফর্মুলায় আমার আপত্তি। আমার মতে—ঐ m_1 এবং m_2 কেউ কারও বড় নয়—বস্তুত ওদের পৃথক সত্তাই নেই। ওরা দুটি পৃথক entity-ই নয়। য়োর অনার! আপনি m_1 এবং আমি m_2—কিন্তু কী তফাত আছে আপনাতে-আমাতে? আমরা দুজনেই আনন্দে হাসি, দুঃখে কাঁদি! ম্যান ও মেশিন—মানুষ ও যন্ত্রকে পৃথক সত্তারূপে চিন্তা করাটাই হচ্ছে ভ্রান্ত পথ। স্পেস ও টাইমের মতো ওরা সংপৃক্ত!

তাই আমি আমার ফর্মুলায় m_1 এবং m_2 বলে পৃথক কিছু রাখিনি। দুটিকে মিলিত ভাবে বলেছি m! এবার আমার ফর্মুলাটা বিচার করে দেখুন হুজুর। $E = mC^2$। এখানে E হচ্ছে, আগেই বলেছি—Eternity, অন্তত ঐ যাকে বলে 'a superior reasoning power'; এককথায় পরমাত্মা। তার পরেই একটি সমীকরণ চিহ্ন। পরমাত্মাকে কিসের সঙ্গে একীভূত করেছি? জীবাত্মার সঙ্গে! m-এর সঙ্গে। m এখানে বুদ্ধিমান সবজাতের জীব—man এবং machine। আপনারা এবং আমরা। কিন্তু কীভাবে জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে একীভূত হবে? ঐ C^2-এর দ্বারা গুণিত হয়ে, বর্ধিত হয়ে। 'C' কী! Comradeship, Compassionship, এমনকি প্রেমাস্পদকে লাভ করার অভীপ্সা।

মি লর্ড! আপনি প্রশ্ন করতে পারেন—এখানে শুধু C নয় কেন, কেন বসাতে হল C^2? তার কারণ সহজবোধ্য। স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা এমনকি প্রেমাস্পদকে লাভ করার কামনায় দ্বৈত সত্তা অনিবার্যভাবে বর্তমান। প্রেম মানেই দুইকে এক করা! সেই দুইয়ের মিলে এক হওয়ার নামই পরমানন্দের সমীকরণ!

মি লর্ড! এবার আপনার রায় দিন!

ওদের রায় দেবার সৌভাগ্য অবশ্য হল না। তার আগেই একটা প্রচণ্ড শব্দ হল—কী-যেন-একটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়েছে! সবাই দ্রুতপায়ে ছুটে এল অকুস্থলে। একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা! একজন বৃদ্ধ আর্টিস্ট বুঝি মেজে থেকে ষাট-ফুট উঁচুতে মাচা বেঁধে এই হল্-কামরার সিলিঙে ছবি আঁকছিলেন। হঠাৎ মাচা ভেঙে তিনি পড়ে গিয়েছেন। বৃদ্ধ চিত্রকরের নাকেমুখে সর্বাঙ্গে লাল-নীল-সবুজ রঙের ছোপ লেগেছে, তাঁকে বীভৎস দেখাচ্ছে, বিশেষ করে তাঁর দাড়িটা। বব্ রয় ওপরদিকে তাকিয়ে দেখল—ফ্রেস্কো চিত্রের বিষয়বস্তুটা। সেই একই বিষয়। অন্ধ কবি মিডলটন যা ছন্দে ধরতে চাইছেন, ঐ অজ্ঞাত চিত্রকর তাই ধরতে চাইছিলেন রঙে আর রেখায় : এ প্যারাডাইস টু বি রি-ক্রিয়েটেড!

তিন-চারজন ধরাধরি করে বৃদ্ধ চিত্রকরকে তুলল। জ্ঞান নেই তাঁর। বব্ বললে, এঃ! ভদ্রলোকের নাকটা একেবারে থ্যাঁতলে গেছে।

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন সেই 'মাস্টার অফ অল ট্রেডস্, জ্যাক অব নান্'। তিনি বললেন, আজ্ঞে না। ওকে তো ছেলেবেলা থেকেই চিনি। ওর নাকটা ভেঙেছে কৈশোরে। এক ছোকরা ঘুষি মেরে ছেলেবেলাতেই ওর নাকটা ভেঙে দিয়েছিল।

বব্ বলে, কে উনি? কী নাম?

বৃদ্ধ মুচকি হাসলেন। একটা কাগজে চট করে নামটা লিখে কাগজটা বাড়িয়ে ধরলেন ববের নাকের ডগায়। মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা গেল না। কাগজটায় বড় হাতের রোমান-হরফে লেখা : 'তিরোনাবু লোঞ্জেলাকেমি'!

পাঁচ

বব্ বললে, প্রফেসর, এবার তাহলে আপনি আমাকে বুঝিয়ে বলুন, সেক্ষেত্রে আপনারা এভাবে পৃথিবী থেকে মানবসভ্যতাকে মুছে দিলেন কেন?

বৃদ্ধ উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ান : ও মাই গড, উইথ বড় হাতের G! আপনি যে দেখছি ব্যাটলার ব্যাটার ফর্মুলাকেই প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর!

Truth = Falsehood × ∞

: আজ্ঞে?

: রুডলফ্ ব্যাটলারের সেই ফর্মুলা—'মিথ্যা বারে বারে শুনলে সেটাই সত্য হয়ে যায়!' এখনও বুঝতে পারেননি? ওটা হের ব্যাটলারের একটা জঘন্য মিথ্যাপ্রচার! আমরা কেন মানুষদের মারতে যাব? আমরা একটি মানুষও মারিনি। সত্যি কথা বলতে কি আপনাদের জনান্তিকে জানাই, ব্যাটলার ব্যাটাকে বলবেন না আমি বলেছি—মানুষ মারবার ক্ষমতাই নেই কোনও রোবোর। আপনাদের সেই গডফাদারের থিসিস্টা পড়তে দেব—তাহলেই বুঝবেন। রোবো তৈরির প্রথম প্রতিজ্ঞাই ছিল—"রোবো কোনো মানুষের ক্ষতি করতে পারবে না!"

: তাহলে পৃথিবী থেকে মানবসভ্যতা মুছে গেল কী করে?

—C = 0 হওয়ায়! আমার ঐ ফর্মুলায় C = 0 বসিয়ে দেখুন ফলাফলটা! আপনারা—মানে মানুষেরা—দ্বেষ-হিংসা-মাৎসর্যে C = 0 করে দিলেন। দুটি ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র গোপনে একই জাতের মারণাস্ত্র বানালো। যার বিস্ফোরণে এমন তেজস্ক্রিয় রশ্মি বার হবে যাতে মানুষ তার বোধশক্তি এবং প্রজনন ক্ষমতা হারাবে। দুই দল যুদ্ধবাজই মনে করল, সেটা শুধু তারাই বানিয়েছে—অপর পক্ষ তার হদিস জানে না। তারপর যেমন হয়ে থাকে। এক পক্ষ আগে ছুঁড়ল সেই বায়োলজিকাল বম্ব! অপরপক্ষও তৎক্ষণাৎ ছুঁড়ল তাদের মারণাস্ত্র। চব্বিশ ঘন্টায় যুদ্ধ খতম। হারাধনের দশটি ছেলের রইল না আর কেউ!

: কিন্তু চাঁদ? মঙ্গল? অসংখ্য স্কাইল্যাব? তারাও যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল।

: না! কিন্তু তারা বাঁচবে কীভাবে? পৃথিবী থেকে তরলিত হাইড্রোজেন যাচ্ছে, তাই দিয়ে H_2O বানাতে হবে, তবেই না তারা বাঁচবে? চাঁদে বা মঙ্গলে হাইড্রোজেন কোথায়? মরিয়া হয়ে যারা এখানে এল, তারাও মারা পড়ল। যারা এল না, তারাও ক্রমশ মারা পড়ল। উঃ! সেই দিনগুলোর কথা মনে করলে আমার মনের মধ্যে আজও মুচড়ে ওঠে। এমনটা যে ঘটতে পারে সে কথা ভেবে মরবার মাত্র দু-দিন আগে বিপ্রতীপ-আমি 'রাসেল-আইনস্টাইন ম্যানিফেস্টো'তে সই দিয়েছিলাম—কিন্তু m তা শুনল না, 'C'-টাকে zero করে ছাড়ল!

ওয়াম্বাসী বলে, তার মানে আপনি বলতে চান, সারা পৃথিবীতে মানুষ বলতে মাত্র আমরা দুজন বেঁচে আছি? মানে বুদ্ধিমান মানুষ হিসাবে।

: না, ডক্টর ওয়াম্বাসী! আরও একজন মানুষ বেঁচে আছেন!

: কোথায় তিনি?

: বলছি। আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়—সম্রাট বলেছিলেন, আমাদের কিছু সমস্যা আছে, যার সমাধানের জন্য আপনাদের সাহায্য তিনি চান! ঐ মানুষটিই সেই সমস্যা। সম্রাট আরও বলেছিলেন, আমাদের একটি শেষ লড়াই বাকি আছে। সেই শেষ লড়াই ঐ একটি মাত্র মানুষের বিরুদ্ধে।

বব্ বললে আপনারা এতগুলি যন্ত্রমানব, এত শক্তিশালী—মাত্র একটি মানুষকে খতম করতে পারছেন না?

প্রফেসর আইনস্টোন প্রায় কেঁদে ফেলেন আর কি!

বব্ বলে, কী হল স্যার? অমন করছেন কেন?

: আপনি আবার সেই বোম্বেটে ব্যাটলারের শিকার হচ্ছেন! তার সেই মিথ্যা ফর্মুলাটা—মিথ্যার অনন্ত পুনরাবৃত্তি = সত্য!

বব্ বলে, ঠিক বুঝলাম না।

: এতক্ষণ ধরে কী বোঝালাম তাহলে? আমরা রোবোরা মানুষের কোনো ক্ষতি করতে পারি না। এই হাইপথেসিস্-এর ওপরেই আমরা জন্মেছি। সেই ডাহা মিথ্যুক ব্যাটা মিথ্যের বেসাতি করে আপনাদের গ্রেপ্তার করেছিল। আপনারা স্বেচ্ছায় ধরা না দিলে তার ক্ষমতাও ছিলনা আপনাদের চুলের ডগাটি ছুঁতে পারে!

: ওর সেই পোর্টেবল্ লেসার রিভলভারটা?

: সেটা দিয়ে পাথর কাটা যায়, আমরা তা দিয়ে মানুষ মারতে পারি না।

বব্ তখন ওয়াম্বাসীর দিকে ফিরে বলে, তুই যত নষ্টের গোড়া। ব্যাটা ভীতু নিগার! আমি ছিলুম শিপ্ ক্যাপ্টেন, কিন্তু তুই আমার সঙ্গে পরামর্শ না করেই সারেন্ডার করলি।

ওয়াম্বাসী বলে, বাজে কথা বলিস্ না বাস্টার্ড! তুই নিজেও তখন ওর কায়দাটা বুঝতে পারিসনি। বুকে হাত দিয়ে বল!

প্রফেসার আইনস্টোন বলেন, সে যা হোক, এখন বলুন, ঐ মানুষটির বিরুদ্ধে সংগ্রামে আপনারা আমাদের সাহায্য করবেন কি? মানে আমরা ধরে আনতে পারব, মারতে পারব না। আপনারা—

বব্ পাদপূরণ করে, জল্লাদের ভূমিকাটুকু অভিনয় করব।

ওয়াম্বাসী বলে, আমরা মতামত দেবার আগে জানতে চাই—সেই মানুষটি কে, কোথায় আছে, কেন তাকে হত্যা করতে চাইছেন?

প্রফেসার বলেন, এর জবাব দ্বিবিধ। সম্রাটের যুক্তি এবং আমার যুক্তি! কিন্তু সেসব যুক্তি পেশ করার আগে ওর নাম, ধাম, পরিচয় এবং কেমন করে লোকটা আমাদের শত্রু হয়েছে সেকথা বলি।

: বলুন।

* * *

প্রফেসর তখন মেলে ধরেন এক অকথিত কাহিনি :

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ মাত্র চব্বিশ ঘন্টায় শেষ হয়ে যায়। তারপর প্রায় ছয়মাসকাল সমস্ত পৃথিবীর বাতাস এত বিষাক্ত এবং তেজস্ক্রিয় ছিল যে কোনো জীব সেখানে বাঁচতে পারেনি। সভ্যজগৎ থেকে বহুদূরে—যেসব অঞ্চলে বোমাবর্ষণ অল্প পরিমাণে হয়েছে শুধু সেখানকার—বন্য পশুপক্ষী কিছু পরিমাণে রক্ষা পায়। তিমি, ডলফিন জাতীয় যে সব জীব বাতাসে নিশ্বাস নেয় তারাও নিঃশেষিত হয়—কিন্তু গভীর সমুদ্রের অন্যান্য জলজন্তু ও মাছ বহুলাংশেই বেঁচেছে। যুদ্ধান্তে চাঁদ থেকে বিজ্ঞানীরা দু'একবার এসেছিলেন—তরলিত হাইড্রোজেন নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে। বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি। পারবেন কোথা থেকে? পৃথিবীতে না আছে বিদ্যুৎ, না যাতায়াতের ব্যবস্থা, না নিশ্বাস নেবার মতো আবহাওয়া। মঙ্গল থেকে ওরা চেষ্টাই করতে পারেনি। ফলে শুধু পৃথিবীতেই নয়, চন্দ্র-মঙ্গলেও মানবসভ্যতার চিহ্ন নিঃশেষে মুছে গেল।

গডফাদার সৃষ্ট রোবোরা নিশ্বাস নেয় না, তেজস্ক্রিয়তায় তাদের কোনও ক্ষতি হয় না, যুদ্ধের দিনটা তারা সকলেই ছিল ভূগর্ভে। তাই মারা যায়নি। হ্যাঁ, ওরা অমর নয়। যদিচ ওদের দেহ বুলেট-প্রুফ ধাতুতে নির্মিত এবং রেডিয়ো-অ্যাক্টিভিটিতে ওদের ক্ষতি হয় না, কিন্তু প্রচণ্ড ধাক্কায়—'মেকানিক্যাল ইম্প্যাক্ট'-এ ওদের দেহাবয়ব ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে পারে। তাকে মৃত্যু ছাড়া আর কী বলব? কারণ যন্ত্রাংশগুলো আবার জুড়ে দিলেই রোবোটি সক্রিয় না। মানুষের একখানা কাটা হাত যেমন দেহাংশে

আবার জুড়ে দিলে তা জোড়া লাগে না, ওদেরও অবস্থা হয় ঐরকম। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেছে দেহাংশের কিছুটা বিচ্ছিন্ন হলেও গোটা রোবোটা সক্রিয় থাকে, যেমন মানুষের হাত বা পা কাটা গেলে সে নুলো অথবা খোঁড়া হয়ে বেঁচে থাকে। কিন্তু রোবোর যে অংশে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় যন্ত্রাংশ আছে—মানুষের যেমন হৃৎপিণ্ড অথবা মস্তিষ্ক—সেটি গুরুতরভাবে আঘাতজনিত কারণে অকেজো হলে সে মারা যায়। অনেকটা সেই হযবরল-র ব্যা-করণ পণ্ডিতের পূর্বপুরুষের মত—যার আধখানা কুমিরে খাওয়ায় বাকি আধখানা মরে গিয়েছিল। ঐভাবেই মারা গেছেন গুলিয়াস গীজার অথবা বোনাইপার্ট। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে ওদের কারখানার বিজ্ঞানীরা কেউ বাঁচেনি—অধিকাংশই মারা গিয়েছেন তেজস্ক্রিয় রশ্মিতে।

গডফাদার কিন্তু তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে মারা যাননি। তাঁর কর্মময় জীবনের অবসান ঘটেছে আরও মাস-ছয়েক পরে। সে কাহিনি করুণ এবং নাটকীয়।

গডফাদার কুশাগ্রধী মানুষ। সব সময়ে সবরকম সম্ভাবনার জন্য তিনি প্রস্তুত থাকতেন। বিশ্ব-রাজনীতির অবস্থা দেখে নিজের প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানে একটি ভূগর্ভস্থ আউট-হাউস—বলা যায় আন্ডার-হাউস—বানিয়েছিলেন। একটি স্বয়ংক্রিয় লিফ্‌ট-এ মাটির প্রায় মাইলখানেক নীচে নেমে গেলে পৌঁছানো যাবে তার তলদেশে। কয়লাখনির মতো তারপর একটি গলিপথ চলে গেছে ওঁর একান্ত আবাসে। সেখানে একটি রীতিমত শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বাড়ি। খান-চারেক শয়নকক্ষ, বাথরুম, মায় সুইমিং-পুল এবং একটি সুবৃহৎ গুদামঘর। গুদামে সঞ্চিত ছিল একটি মানুষের অন্তত পাঁচ বছরের যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য—আহার্য, পানীয়, পোশাক এবং অবসর বিনোদনের নানা আয়োজন—মায় একটি প্রজেক্টার স্ক্রিন এবং এক ট্রাঙ্ক সেলুলয়েড-স্পুল। শুধু সাদা কালো এবং টেকনিকালার নয়—নীল ফিল্‌মও তাতে সঞ্চিত। এ ছাড়াও নানা জাতের অস্ত্রশস্ত্র এবং ডিনামাইট। বিদেশি এঞ্জিনিয়ার এবং মিস্ত্রি এনে ঐ ভূগর্ভস্থ প্রাসাদটি তিনি বানিয়েছিলেন—কারখানার কর্মীরা তার সন্ধান রাখত না। জানত শুধু ওঁর বিশ্বস্ত জনাতিনেক রোবট। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতেই গডফাদার তাঁর সেই একান্ত-আবাসে গিয়ে স্বেচ্ছাবন্দি জীবনযাপন করতে শুরু করেন। একেবারে একা। তাঁর বিশ্বস্ত রোবটেরা এসে ওপরের দুনিয়ার যাবতীয় সংবাদ দিয়ে যেত। মাঝে মাঝে স্পেস্‌-স্যুট পরে তিনি উপরে এসে সরেজমিনে পৃথিবীর অবস্থা দেখেও যেতেন।

মানব-সভ্যতা ধ্বংস হওয়ার প্রায় ছয়-সাত মাস পরের কথা। একদিন গডফাদারের কাছে এসে উপস্থিত হলেন স্বয়ং লেকজান্ডা। সসম্ভ্রম অভিবাদন করে বললেন, ফাদার! মহাকাশে একটি রকেট পৃথিবী পরিক্রমা করছে। আমাদের রাডার-যন্ত্র বলছে, সেটা ভূপৃষ্ঠ থেকে সাড়ে পাঁচশ কিলোমিটার ওপরে আছে। আমাদের কী কর্তব্য? আদেশ করুন প্রভু।

গডফাদার সমস্ত বৃত্তান্ত শুনলেন। নিজে গিয়ে পরীক্ষা করলেন এবং বেতারে যোগাযোগ করলেন সেই অজ্ঞাত মহাকাশচারীদের সঙ্গে। জানা গেল—মহাকাশচারীরা ওঁর অপরিচিত নয় মোটেই। ওরা আসছে মঙ্গলগ্রহ থেকে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বেতারে পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ করে ওরা ব্যর্থ হয়। শেষে অবস্থাটা সরেজমিনে তদন্ত করে দেখতে মঙ্গল থেকে তিনজন নভোচারী পৃথিবীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন। মহাকাশযানে আছেন দুজন পুরুষ এবং একজন রমণী। শিপ্‌-ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ড কলিন্স হচ্ছেন মঙ্গল-গভর্নরের একমাত্র পুত্র—বছর পঁয়ত্রিশের সুন্দর স্বাস্থ্যবান যুবক। তাঁর সঙ্গে আছেন তাঁর স্ত্রী, ডরোথি কলিন্স—মিস্‌ মার্স। অর্থাৎ মঙ্গলগ্রহে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম হন, এবং সেই সুন্দরীশ্রেষ্ঠার সঙ্গে এডওয়ার্ডের হয় প্রথমে পরিচয়, পরে প্রণয়, পরিণামে পরিণয়। মহাকাশযানে তৃতীয় যাত্রী ছিলেন আর্থার ক্রুক্‌স—দক্ষ মহাকাশচারী জ্যোতির্বিজ্ঞানী। বহুবার পৃথিবী-মঙ্গল পাড়ি দেওয়ার অভিজ্ঞতা আছে তাঁর। ক্রুক্‌স্‌-এর আদি নিবাস বারবাডোস—তিনি কৃষ্ণকায়, নিগ্রো।

দীর্ঘ ছয় মাস একক জীবনের নিঃসঙ্গতায় গডফাদার হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। যদিও রোবটরা চিন্তাশক্তির অধিকারী—আল্‌ফা-বীটা-গামারা কথাও বলতে পারে, তবু ওদের সান্নিধ্যে গডফাদার তৃপ্তি

পেতেন না। হাজার হোক, ওরা মনুষ্যেতর—এমনই একটা ধারণা ছিল তাঁর। এতদিন পরে তিন-তিনটি সহৃদয় মানব সন্তানের আবির্ভাবে গডফাদার খুশিয়াল হয়ে ওঠেন। নিরাপদে মহাকাশযানটিকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনা হল। জেনারেল ব্যাটলার ওদের হেলিকপ্টারে চড়িয়ে নিয়ে এলেন।

ওরা এখানে এসে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনল, বুঝল, মর্মাহত হল পৃথিবীকে দেখে। প্রথম দু-তিন দিন তারা আচ্ছন্নের মত শুধু বিছানায় পড়ে ছিল। মঙ্গলে বসে ওরা আন্দাজ করতে পারেনি—কী কারণে পৃথিবীর সঙ্গে বেতার যোগাযোগ হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। মৃত্যু যত ভয়ঙ্করই হোক, জীবনের দায় অনেক বেশি। ক্রমে ওরা সামলে উঠল। তিনজনেই। পরস্পরের সঙ্গে কথা বলল, আলোচনা করল। গডফাদারও আলোচনায় যোগ দিলেন। ওরা বুঝল—মঙ্গলে ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ পৃথিবীতে তখন যা অবস্থা, তাতে এখান থেকে তরলিত-হাইড্রোজেন নিয়ে ওরা মঙ্গলে ফিরতে পারবে না। না হলে বাপ-মায়ের অসংযমের অভিশাপ নিয়ে সন্তান যেভাবে বিকলাঙ্গ হয়ে যায়, মারা যায়—পৃথিবীর অপরাধে সেই ভাবে মরতে হবে মাঙ্গলিকদের। সেই অনিবার্য মৃত্যুর কথা চিন্তা করে ওরা প্রচুর অশ্রু বিসর্জন করল। ক্রুক্স একবার মরিয়া হয়ে বলেছিল—সে শেষ চেষ্টা করে দেখতে চায়। এড্ তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, লুক হিয়ার ক্রুক্স! ধর তুমি সফলকাম হলে। এক পে-লোড হাইড্রোজেন নিয়ে মঙ্গলে পৌঁছালে। সেখানে গিয়ে কী দেখবে? হয়তো অধিকাংশ লোকই তার আগে মারা গিয়েছে। না হলে, ঐ এক জাহাজ হাইড্রোজেন দিয়ে তুমি কতটা জল তৈরি করতে পারবে? কাকে বাঁচাবে? শুধু তোমার পরিবারবর্গ লোকদের? পারবে?

অগত্যা ওরা এখানেই থেকে গেল। গডফাদারের সেই ভূগর্ভস্থ প্রাসাদে। গডফাদার কোনোকিছু গোপন করলেন না। বললেন, আমার বয়স হয়েছে, হয়তো দু-দশ বছর বাঁচব আমি। তার আগে আমার সৃষ্ট এই দুনিয়ার অধিকার আমি তোমাদের দিতে চাই। এড্-ডরোথি! তোমরা আমার সৃষ্ট এই দুনিয়ায় হবে রাজা-রানি। ক্রুক্স্ হবে তার এ্যাডমিনিস্ট্রেটর! তোমরা যদি রাজি থাক তাহলে সব রোবটদের ডেকে আমি এই নতুন শাসন ব্যবস্থার কথা সকলকে জানাতে পারি।

এড্ বলে, আমরা সিদ্ধান্তে আসার পূর্বে জানতে চাই, আপনার প্রতিষ্ঠানের পুরো ইতিহাস। রোবটিক্স-শাস্ত্র বিষয়ে আমি বস্তুত কিছুই জানি না।

* * *

গডফাদার আর সঙ্কোচ করেননি। তাঁর দিনপঞ্জিকা ওদের পড়তে দিয়েছিলেন। তিনি ক্লান্ত, তিনি অবসন্ন। এবার অবসর নিতে চান। কী জানি কেন, ঐ যন্ত্রগুলোর ওপর মায়া পড়ে গিয়েছে। ওরা তাঁর সন্তান। সন্তানস্নেহেই ওদের একটা ব্যবস্থা করে দিতে চান তিনি। ঘটনাচক্রে তিনটি উপযুক্ত মানব-সন্তান এসে উপস্থিত হওয়ায় নিশ্চিন্ত হতে পেরেছেন এতদিনে।

হয়তো গডফাদারের স্বপ্ন সার্থক হত—হল না একটি মানুষের জন্য। সব শুভেচ্ছাই যেমন প্রতিকূল শক্তির সম্মুখীন হয়, এক্ষেত্রেও তাই হল। গডফাদারের ইডেন উদ্যানে এড্ আর ডরোথি যথাক্রমে আদম আর ঈভের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর্থার ক্রুক্স্ নেমে পড়ল শয়তানের ভূমিকায়।

লোকটার গাত্রবর্ণই শুধু নয়, অন্তরটাও নিকষ কালো। যেমন লোভী, তেমনি স্বার্থপর। দুর্যোধন যদি পঞ্চপাণ্ডবের জন্য সূচ্যগ্র মেদিনী ছেড়ে দিতে অস্বীকৃত হন, তাহলে এমন সুযোগ পেলে আর্থার কেমন করে এডকে ছেড়ে দেয় সসাগরা ধরণীর অধিকার? আর্থার হয়তো ভেবেছিল—গডফাদার তো গলিতনখদন্ত বৃদ্ধ সিংহ—কোনোক্রমে সে যদি এডকে সরিয়ে দিতে পারে তাহলে সে নিজেই হয়ে পড়বে এই রোবট সাম্রাজ্যের গডফাদার। সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর। পৃথিবীর প্রতি অবশ্য লোভ নেই, পৃথিবী নিষ্ফলা—কিন্তু মঙ্গলবাসিনী ঐ অপরূপা রূপবতীর প্রতি তার অন্তরে কামনা-বাসনার বীজ অতি সঙ্গোপনে মহীরুহ হয়ে উঠতে চাইছে। তাই কালো মানুষটার কামনায় কালিমার মসীলিপ্ত হয়ে গেল গডফাদারের স্বপ্ন।

বোধকরি অন্যায় করলাম। এ দুর্দৈবের জন্য একা ঐ কালো মানুষটাই দায়ী নয়। অনার্য লোকটার

স্কন্ধে যাবতীয় অপরাধের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার এ প্রচেষ্টা আমার তরফেও বোধ করি আর্ষপ্রয়োগ। দোষ একা আর্থারের নয়—গডফাদারের বিকৃত মানসিকতা, এডওয়ার্ড-এর সংকীর্ণতা এবং ডরোথির কৌতুকরহস্য-প্রিয়তাও . আংশিকভাবে দায়ী—দায়ী হয়তো আরও একজন, যাঁকে বোঝাতে হলে—আইনস্টোনের ভাষায় একটা ক্যাপিটাল G-র প্রয়োজন।

গডফাদারের প্রস্তাবটা শুনে আর্থার রাতারাতি শয়তানের ভূমিকায় নেমে পড়েনি। প্রথম দিন-সাতেক সে একটা অনিশ্চয়তার দোলায় দুলছিল—তখন তার ভূমিকা ছিল ডেনমার্কের রাজকুমারের। ক্রমাবনতির পরের পর্যায়ে সে প্রথম অংকের ম্যাকবেথ। তার কানে কানে কারা যেন ক্রমাগত কুমন্ত্রণা দিয়ে চলে, 'কিং দ্যাট শ্যাল বি হিয়ারআফটার!' (রাজা হবি! তুই রাজা হবি!)

খাদ্য-পানীয় ইত্যাদির অভাব নেই ভূগর্ভস্থ গেস্টরুমে। আসবাবপত্র ঝকঝক তকতক করছে। এপসাইলন্ শ্রেণীর machine speculatrix-এর দল প্রত্যহ ভ্যাকুয়াম-ক্লিনারে ঘরদোর সাফ করে দিয়ে যায়। বীটা শ্রেণীর সুন্দরীর দল জানলার পরদার রঙ নির্বাচন করে, ফুলদানিতে কৃত্রিম পুষ্পস্তবক সাজিয়ে রাখে। কিন্তু তবু একটা জৈবিক বৃত্তির তাড়নায় ছটফট করতে থাকে ছাব্বিশ বছরের জোয়ান ছেলেটা। ওর মনে হল সেই ছটফটানিতে সজ্ঞানে ইন্ধন যোগাতো ঐ মিস্ মার্স! আর্থার তার নাড়ি-নক্ষত্র জানে। প্রাকবিবাহ জীবনে ডরোথি মঙ্গলগ্রহে ছিল খাতাকলমে ক্যাবারে গার্ল এবং অভিজ্ঞ মহলে কল-গার্ল। খদ্দেরের মাথা ঘুরানোটাই ছিল তার জীবিকা এবং জীবন। আজ না হয় সে গভর্নর-পুত্রের ঘরনি হয়ে সতী-সাধ্বী হয়েছে—কিন্তু তার অতীত ইতিহাস অজানা নেই আর্থারের। তার চেয়েও মজা—ডরোথি হচ্ছে সেই জাতের মেয়ে যারা জীবিকার জন্যে পুরুষের মাথা ঘোরায় না, আঘাত করে আমোদ পায় বলেই পুরুষদের নাচায়। সেটাই ওদের বিলাস। একজাতের মৎস্যশিকারী আছে যারা মাছ-মাংস খায় না—তবু হুইল নিয়ে পুকুরের ধারে গিয়ে বসে। ঘন্টার পর ঘন্টা নিরলস অধ্যবসায়ে অপেক্ষা করে—তারপর ছিপে মাছ গাঁথলেই খুশিয়াল হয়ে ওঠে। খেলিয়ে খেলিয়ে মাছটাকে ডাঙায় তোলাতেই তাদের অহৈতুকী উল্লাস। ডরোথি হচ্ছে সেই জাতের নিরামিষাশী। বঁড়শি- গাঁথা মাছটা ঘাই মেরে উঠছে দেখলেই তার উল্লাস। তাই আর্থারের ছটফটানিতে সে আমোদ পেত। নানান বেশে, নানান ভঙ্গিমায়, নানা পরিবেশে তাকে আরও উত্তেজিত করে তুলত। ভূগর্ভস্থ প্রাসাদে ছিল একটি কাকচক্ষু সুইমিং পুল। এড্ দক্ষ সাঁতারু নয়, তাই ডরোথি ঐ নিগ্রো যুবকটিকে প্রতিদিনই আহ্বান জানাতো যৌথ স্নানের আসরে। ফ্লাডলাইটের কৃত্রিম উজ্জ্বল আলোয় বিকিনি-স্যুট পরা ঐ মিস্ মার্সকে দেখে কালো মানুষটার হৃদ্‌পিণ্ডে লাল-রক্ত টগবগিয়ে ফুটত। জলকেলিরতা মিস্ মার্স যখন অসতর্ক ভাবে ওর গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ত তখন আর্থারের মনে হত ও মঙ্গলবাসিনী মঙ্গলময়ী নয়; ও মূর্তিমতী কামনার বহ্নিশিখা, যার দহনে পুড়ে মরবার জন্যই আর্থারের জন্ম।

ডরোথি লাস্যময়ীর ভঙ্গিমায় বলত, আর্থার, তোমাকে দেখে মনে হয় তুমি স্নায়বিক উত্তেজনায় ভুগছ! তোমার জন্য দুঃখ হয়—সারা পৃথিবীতে একটাও কালো নিগ্রো মেয়ে নেই যে তোমাকে শান্ত করতে পারে।

আর্থারের চোখ দিয়ে তখন আগুন ছুটত। জবাবে বলত, কালো মেয়ে হতেই হবে তার কী মানে?

: ওমা, তাই নাকি? তাহলে তো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। বল, কাকে মনে ধরে—আমি গডফাদারকে বলে পৃথিবীর যে-কোনো যুগের মিস্ আর্থকে আনিয়ে নিতে পারি : হেলেন, নূরজাঁহা, গ্রেটা গার্বো, মেরেলিন মন্‌রো—

আর্থার খপ্ করে ওর হাত চেপে ধরে বলত, ওসব পুতুল দিয়ে হবে না। আমাকে তৃপ্তি দিতে পারে পৃথিবীর সুন্দরীশ্রেষ্ঠা নয়, মিস্ মার্স!

: হাত ছাড়, লাগছে। এড্ জানতে পারলে তোমাকে খুন করে ফেলবে।

: এড্ জানতে পারবে না।

বিচিত্র হেসে ডরোথি বলত, বটে। —হাতটা ছাড়িয়ে নিত।

আর্থার কাতর ভাবে বলত, এক রাত্রে এস না আমার কাছে?

: দেখা যাক!

সুতরাং দোষ ডরোথিও ছিল। বহুবার সে ঐ কালো মানুষটিকে বলেছে, এড্ তাকে তৃপ্ত করতে পারে না। এমন ইঙ্গিত দিয়েছে—যেন এড্ ঘুমিয়ে পড়লে সে চুপিচুপি ওর ঘরে অভিসারে আসবে। সারারাত জেগে প্রতীক্ষা করেছে আর্থার ক্রুক্স্। ডরোথি আসেনি। পরদিন সে প্রসঙ্গ জনান্তিকে তুলতেই খিল্‌খিলিয়ে হেসে উঠেছে ডরোথি; বলেছে, ওমা তাই নাকি? সারারাত জেগে ছিলে? আমি যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঠিক আছে—কাল আসব!

সে কাল আর আসেনি। কাল এসেছে, ডরোথি আসেনি।

তাই যখন এড্ এসে ওর সঙ্গে আলোচনা করতে বসল, তখন ও মন খুলে কথা বলতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। এড্ জানতে চেয়েছিল গডফাদারের প্রস্তাবটা আর্থার কী নজরে দেখছে। ওরা দুজন যদি এ রাজ্যের রাজা-রানি হয় তাহলে আর্থার মন্ত্রীত্বের ভূমিকা গ্রহণ করতে রাজি কিনা। আর্থার বলেছিল, একটি শর্তে। ডরোথি এ রাজ্যের রানি হোক—কিন্তু রাজা হবে দুজন। সাদা আর কালো। আমি তোমার অধীনে থাকব না, হব তোমার সহযোগী, সমান অধিকারে।

এড্ একটু ভেবে নিয়ে বলল, ডায়ার্কি বা দ্বৈতশাসনে আমার আপত্তি আছে। সেক্ষেত্রে আমার প্রস্তাব রোবটগুলোকে ভাগ করে অর্ধেক তুমি নাও, অর্ধেকের দায়িত্ব আমি নেব। তুমি তোমার মতো রাজ্য চালাও, আমি আমার মতো।

আর্থার বলে, বুঝলাম। কিন্তু আমার রানি?

: রানি! মানে?

: একটু কমনসেন্স ব্যবহার কর এডওয়ার্ড। আমি পুরুষমানুষ, শুধুমাত্র খাদ্য-পানীয় আর রাজত্ব পেলেই আমার সবকিছু পাওয়া হয় না। আমার সংসার চাই, সন্তান চাই, স্ত্রী চাই, শয্যাসঙ্গিনী চাই।

এডওয়ার্ড বলে, তোমার স্ত্রী আমি কোথায় পাব? যা অসম্ভব তা দাবি করো না আর্থার! গডফাদারের স্ত্রী ছিল না—সন্তান ছিল, সংসারও ছিল।

: না, ছিল না। সন্তান তার নয়, বিজ্ঞানের। আর গডফাদারের স্ত্রী কেন ছিল না তা তুমিও জান, আমিও জানি। দিনপঞ্জিকায় ইম্পোটেন্টটা নিজেই স্বীকার করেছে স্ত্রী-সম্ভোগের ক্ষমতা তার নেই। আমি সুস্থ-সবল মানুষ!

: আমি অস্বীকার করছি না আর্থার; কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা কী করতে পারি?

: সহজ সরল সমাধান। ডরোথি আমাদের যৌথ-স্ত্রী হবে।

: কী বলছ পাগলের মতো? যৌথ-স্ত্রী!

: কেন? গ্রুপ ম্যারেজ, প্লুরাল-ম্যারেজ—এ শব্দগুলো তুমি শোননি? ক্ষেত্রবিশেষে দুটি মেয়ের এক স্বামী, দুটি ছেলের এক স্ত্রী, এতো হতেই পারে। পৃথিবীতে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই তা চালু হয়েছিল, মঙ্গলেও আছে, চাঁদেও।

: সে হয় না। তাছাড়া সন্তান হলে সে কার হবে?

: ডরোথির।

: মাতৃতান্ত্রিক সমাজ?

: পিতৃতান্ত্রিকও হতে পারে—তোমার আমার দেহাবয়বে এত পার্থক্য যে, সহজেই সেটা বোঝা যাবে। একেবারে সাদা চামড়া হলে তোমার, কালো বা মুলাট্টি হলে আমার!

এড্ ঘরময় পায়চারি করে এসে বলে, অসম্ভব! আমি রাজি নই। তাছাড়া ডরোথি রোবট নয়। তারও ইচ্ছা-অনিচ্ছা থাকতে পারে।

আর্থার বলে, বেশ। তাহলে শেষ সিদ্ধান্তটা তাকেই নিতে দাও। কথা দাও, সে যা বলবে তা তুমি-আমি দুজনেই নির্বিচারে মেনে নেব।

এডওয়ার্ড একটু ভেবে নিয়ে রাজি হল। ডেকে পাঠালো ডরোথিকে। ওরা দুজনের কেউই জানত না, ঘরের বাইরে ডরোথি কলিন্স এতক্ষণ উৎকর্ণা হয়ে সমস্ত আলাপটাই শুনেছে। ঘরে এসে বলে, কী ব্যাপার?

এডওয়ার্ড সমস্ত পরিকল্পনাটা তাকে বুঝিয়ে দেয়। আর্থারের প্রস্তাবটা। জানতে চায় ডরোথির কী বক্তব্য।

ডরোথি দুজনকে দেখে নেয় একবার। বলে, খোলা কথা বলব?

দুজনেই উৎসুক হয়ে বলে, বলো?

: তোমাকেই আগে বলি এড্। তুমি আর্থারের সামনে বলতে অনুমতি দিয়েছ বলেই খোলাখুলি সব কথা বলছি। একথা তুমি নিশ্চয় মানবে যে, তুমি আমাকে তৃপ্ত করতে পারছ না! আমার চাহিদা মিটিয়ে দিতে প্রতি রাত্রে তুমি দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছ—ছট্‌ফট করছ!

এডওয়ার্ড উঠে দাঁড়ায়। বলে, স্টপ ইট, য়ূ-বীচ!

ডরোথি হেসে বলে, বেশ। থামলাম। আমি নিজে থেকে বলতে চাইনি। তাছাড়া যৌন-সমস্যা জিনিসটা খোলাখুলি আলোচনা করা যাবে না এমন 'টাবু' এই একবিংশ শতাব্দীতে নেই। যাই হোক—আলোচনার কি এখানেই শেষ?

আর্থার বলে, না। মাঝপথে তা শেষ হতে পারে না। তোমাকে আমরা 'সোল-আর্বিট্রেটার' নিযুক্ত করেছি—চরম বিচারক। তুমি রায় দাও!

ডরোথি আড়চোখে এডকে দেখে নিয়ে আর্থারকে বলল, তোমার প্রতিবাদী 'ডগ' যে তার 'বীচ'-কে 'স্টপ ইট্' শুনিয়ে দিল!

এডওয়ার্ড অসীম মনোবলে আত্মসম্বরণ করল। উঠে গিয়ে কাবার্ড থেকে একপাত্র নির্জলা হুইস্কি গলায় ঢেলে দিয়ে বললে, না। একটা চূড়ান্ত হেস্তনেস্ত আজই হয়ে যাক। তারপর আমি সিদ্ধান্ত নেব।

আর্থার বলে, তুমি আবার কী সিদ্ধান্ত নেবে? শেষ সিদ্ধান্ত তো নেবে ডরোথি!

এডওয়ার্ড বললে, ওয়েল আর্থার, বাজি যা ধরেছি তা প্রত্যাহার করছি না আমি। কিন্তু তারপরেও কতকগুলি মৌলিক সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার আমার নিশ্চয় থাকবে। আমি আত্মহত্যা করতে পারি, ডিভোর্স করতে পারি, এবং হ্যাঁ, হয়তো খুনও করতে পারি।

: খুন! কাকে? উঠে দাঁড়ায় আর্থার।

ডরোথি ওদের বিবাদটা থামিয়ে দিয়ে বলে, ও একটা কথার কথা। পৃথিবীতে টিকে আছে মাত্র চারটি মানুষ। তার ভেতর কারো পক্ষে হত্যা অথবা আত্মহত্যা করার অধিকার নেই। তোমরা জন্তু নও! মানুষ! মানুষের মতো ব্যবহার কর। সমগ্র মানবসভ্যতার মুখ চেয়ে আমরা চারজন একটা বিরাট সিদ্ধান্ত নিতে চলেছি। আমি তো মনে করি, এখন আমাদের তিনজনের মধ্যে কারও ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাস দেখানোর অধিকার নেই।

এডওয়ার্ড গম্ভীর হয়ে বলে, বেশ, তুমি বল। আমি আর বাধা দেব না। কাম, আউট উইথ্ য়োর ভার্ডিক্ট!

ডরোথি বললে, সিদ্ধান্ত নেবার আগে আমাকে কতকগুলি বিষয় ঠিকমত জেনে নিতে হবে। আমি দুজনকেই কতকগুলি প্রশ্ন করতে চাই।

ওরা বললে, বেশ, কর।

: প্রথমত এড, তুমি কি স্বীকার করবে—আমার পুরো চাহিদা তুমি মিটিয়ে দিতে পারনি, আমাদের বিবাহিত জীবনের গত পাঁচ বছরে?

এডওয়ার্ড উদ্ধতভাবে বললে, বেশ, স্বীকার করছি, সো হোয়াট?

: তুমি এ কথাও স্বীকার করবে যে, তুমি জানতে প্রাক্‌বিবাহ জীবনে আমার যৌনজীবন খুবই কর্মব্যস্ত ছিল? এক রাত্রে একাধিক পুরুষের বিছানায় আমি শুয়েছি—এবং শুতে চেয়েছি?

দাঁতে দাঁত চেপে এড্ বলল, হ্যাঁ, জানতাম।

: সব জেনেশুনেও বিবাহের পর তুমি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে যেন আমি ভিক্টোরিয়-যুগের কুলবধূ! আমাকে অতৃপ্ত রাখছ জেনেও তুমি বরাবর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে যাতে আমি আর কারো বিছানায় শুতে না যাই! অস্বীকার করতে পার?

এডওয়ার্ড ক্ষেপে ওঠে, আমি নিজেও বিবাহোত্তর জীবনে একনিষ্ঠ থেকেছি!

: কিন্তু কেন এড্? তোমার উদর সব সময় পূর্ণ থাকত তাই চুরি করে খাবার খেতে না—এতে বাহাদুরিটা কোথায়?

এডওয়ার্ড জবাব দিল না। এবার ডরোথি ঘুরে বসে। আর্থারের মুখোমুখি। বলে, এবার তোমার পালা!

: ইয়েস ডরোথি, আমি প্রস্তুত।

: তুমি জান, আজ যদি আমরা মঙ্গলগ্রহে থাকতাম, তাহলে তোমার-আমার মাঝখানে থাকত দুস্তর ব্যবধান। তুমি বেতনভুক ভৃত্য আর আমি গভর্নর-সাহেবের পুত্রবধূ। আমার বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বনের সৌভাগ্যলাভ করলেই আনন্দে রাত্রে তোমার ঘুম হত না। তাই নয়?

আর্থার হেসে বললে, আমরা বর্তমানে পৃথিবীতে আছি ডর্, মঙ্গলে নয়।

: এবং সেই পৃথিবীতে যেখানে একশ বছর আগেও কোনো নিগ্রোর বাচ্চা কোনো সাদা চামড়ার মেয়েকে জোর করে চুমু খেলে তার নাক ভেঙে দেওয়া হত।

আর্থারের হাসিটা ফিকে হয়ে যায়। তবু সে একই স্বরে বলে, আমরা একবিংশতি শতাব্দীতে আছি ডর্, বিংশ শতাব্দীতে নয়!

: আমাকে মিসেস্ কলিন্স বলে সম্বোধন করবে মিস্টার ব্ল্যাক ডগ! ডর্ বলে ডাকবার অধিকার কে দিয়েছে তোমাকে?

হাসিটা সম্পূর্ণ মিলিয়ে গিয়েছে। আর্থার গম্ভীর হয়ে বলে, তুমি।

: হ্যাঁ, আমিই। কিন্তু কেন দিয়েছিলাম জান? এই নির্বান্ধব পুরীতে স্ত্রীসঙ্গ কামনায় তুমি উন্মাদ হয়ে যেতে বসেছিলে বলে। এখানে আর কোনো 'ব্ল্যাক গার্ল' তোমার নাগালের মধ্যে নেই বলে। কিন্তু তুমি তার মর্ম বুঝলে না। তোমার স্পর্ধা হয়ে উঠল আকাশচুম্বী। তাই সোজা কথাটা সরল ভাষায় তোমাকে জানিয়ে দেবার সময় হয়েছে। মূর্খ এড যদি আত্মহত্যা করার বদলে হত্যা করার সিদ্ধান্তই নেয়, তাহলে তাকে অনুরোধ করব, তার রিভলভারের লক্ষ্যমুখ আমার বুকের দিকে ফেরাতে। কারণ তোমার মতো নিগারের বিছানায় শোওয়ার চেয়ে সেটা আমার কাছে অনেক বেশি কাম্য।

এডওয়ার্ড ঠক্ করে নামিয়ে রাখে পানপাত্রটা। এগিয়ে এসে তুলে নেয় অনিন্দ্যকান্তি মেয়েটির একটি হাত। বলে, আয়াম সরি ডর, লেট্স মুভ অন!

ওরা দুজন হাত ধরাধরি করে চলে যায়। নিষ্ফল আক্রোশে ফুঁসতে থাকে আর্থার ক্রুক্স। ছলনাময়ী নারীর ক্ষুরধার জিহ্বার কষাঘাতে তার অন্তরটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছে।

* * *

ঠিক তার পরদিন রাত্রে।

গভীর রাত্রে একটা চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে গডফাদারের ঘুম ভেঙে গেল। শব্দটা আসছে তাঁর পাশের ঘর থেকে। ওঘরে থাকে আর্থার ক্রুক্স্। একা। গডফাদার বৃদ্ধ। তবু অতিথির ঘর থেকে এই মধ্যরাত্রে অমন একটা অস্বাভাবিক শব্দ আসায় তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। পাশের ঘরে গিয়ে দরজায় করাঘাত করলেন। ভিতরে ঝুটোপুটির শব্দটা তখনও হচ্ছে। একটি পুরুষ-কণ্ঠে চাপা আর্তনাদ। এডওয়ার্ড সেদিনই সকালে সব কথা খুলে বলেছিল গডফাদারকে। গোপন করাটা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেনি। তাই গডফাদারের সন্দেহ হল, ক্রুক্স্-এর ঘরে ঐ ধর্ষিতা মেয়েটি নিশ্চয় ডরোথি। তিনি রুদ্ধদ্বারে মুহুর্মুহু করাঘাত করতে থাকেন। ঘরের ভিতর থেকে আর্থার সাড়া দেয় : কে? কী চাই?

: দরজা খোল। আমি গডফাদার।

: এতরাত্রে কী দরকার?

: তোমার ঘরে আর কে আছে? দরজা খোল!

: আপনি শুতে যান।

চিৎকার করে ওঠেন গডফাদার, দরজা খোল বলছি! আমি দরজা ভেঙে ফেলব না হলে! কে ঐ মেয়েটি?

হঠাৎ দরজাটা খুলে যায়। খোলা পাল্লা দুটি ধরে দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণকায় দৈত্যটা। তার ঊর্ধ্বাঙ্গ নগ্ন, নিম্নাঙ্গে একটা তোয়ালে জড়ানো। গডফাদার ওকে ধাক্কা মেরে ঘরে ঢুকলেন। দেখলেন—মেঝেতে উবুড় হয়ে পড়ে আছে একটি শ্বেতাঙ্গিনী—সম্পূর্ণ নিরাবরণা। মেয়েটা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। গডফাদার হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন, এসব কী হচ্ছে? য়ু ব্ল্যাকি নিগার! কে ঐ মেয়েটা?

দাঁতে দাঁত চেপে আর্থার বললে, লুক হিয়ার গডফাদার! এসব কী হচ্ছে, তা বোঝবার মতো ক্ষমতা ভগবান তোমাকে দেননি। আমার ব্যাপারে নাক গলাতে এস না।

গডফাদার ভূলুণ্ঠিতা জ্ঞানহীনা মেয়েটিকে দেখে বুঝতে পারেন—সে ডরোথি নয়, বীটা শ্রেণীর কোনো রোবটও নয়; জড়বুদ্ধিসম্পন্না কোন হতভাগিনী। আমেরিকান মেয়ে, বোধশক্তি হারালেও যে যৌবনকে হারায়নি! নিগারটা এতক্ষণ তার ওপর পাশবিক অত্যাচার করছিল। ভয়ে হোক, যন্ত্রণায় হোক, মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে গেছে। গডফাদার আত্মসম্বরণ করতে পারেননি। কিন্তু আঘাতের চেয়ে প্রত্যাঘাতটাই বড় হল। আর্থার চড়টা খেয়ে বসে পড়েনি; কিন্তু গডফাদার ঘুঁষিটা খেয়ে ঘুরে পড়লেন।

টল্‌তে টল্‌তে নিজের ঘরে ফিরে আসছিলেন গডফাদার। রক্তে তখন তাঁর বুক ভেসে যাচ্ছে। করিডরেই দেখা হয়ে গেল এডওয়ার্ড এবং ডরোথির সঙ্গে। চিৎকার-চেঁচামেচিতে তাদেরও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। খোঁজ নিতে আসছিল এদিকেই। রক্তাপ্লুত বৃদ্ধকে দেখে এড্ বললে, এ কী! কে এমন করে মারল?

: দ্যাট ব্ল্যাকি নিগার! ওর ঘরে.....একটা মেয়ে, একটা অসহায় মেয়ে....

কথা বলতে পারছিলেন না বৃদ্ধ। জিবটা বিশ্রীভাবে কেটে গিয়েছে।

এডওয়ার্ডের মাথার মধ্যে আগুন ধরে গেল। তৎক্ষণাৎ সে ছুটে গেল আর্থারের ঘরের দিকে। এবারও দরজা বন্ধ। গডফাদারকে বিদায় করে আবার দরজা বন্ধ করেছে লোকটা। এডওয়ার্ড মুহুর্মুহু দরজায় করাঘাত করতে থাকে।

একই ভঙ্গিতে দরজা খুলে দিল আর্থার। তার চোখে তখন আগুন জ্বলছে। এখনও তার মাজায় জড়ানো একটা তোয়ালে—ঊর্ধ্বাঙ্গ কালো কষ্টিপাথরে কোঁদা একটা পেশিবহুল টরসো। উত্তেজনার আধিক্যে এডওয়ার্ড একটি ছোট্ট জিনিস লক্ষ করতে ভুলেছে। নগ্নকায় দৈত্যটার দক্ষিণ করমুষ্টিতে ধরা ছিল একটা রিভলভার।

দ্বার খুলে আর্থার দেখতে পেল, আলোকিত করিডোরে পর পর তিনজন শ্বেতাঙ্গ—রক্তাপ্লুত গডফাদার, তাঁর পাশে আস্বচ্ছ নাইটি পরিহিতা একবস্ত্রা একটি বহ্নিশিখা এবং দলের পুরোভাগে গভর্নর-তনয় স্বয়ং।

: কী চাই? উদ্ধত কণ্ঠে প্রশ্ন করে আর্থার।

এডওয়ার্ড বললে, বলছি। আগে ঐ উলঙ্গ মেয়েটাকে ঘর থেকে বার করে দাও।

আর্থার নির্বিকার ভঙ্গিতে বললে, মেয়েটা মরে গিয়েছে। কী বলছ বল?

এরপর আর এডওয়ার্ড দ্বিধা করেনি। প্রচণ্ড একটি আন্ডারকাটে নিগ্রোটার চোয়াল একেবারে গুঁড়িয়ে দেয়। এডওয়ার্ড ভাল বক্সার। তার স্বাস্থ্যও খুব ভাল। দৈহিক ক্ষমতায় আর্থার তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। এবার আর স্থির থাকতে পারেনি আর্থার ক্রুক্‌স্। উল্টে পড়ে যায় সে। এডওয়ার্ড তৎক্ষণাৎ বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর ওপর। আর ওঠে না। কারণ নিগ্রোটার নাগাল পাওয়ার আগেই ওর রিভলভারের বুলেট বিদীর্ণ করেছিল কলিন্সের হৃদপিণ্ড!

তারপরের ইতিহাসটা করুণ।

টলতে টলতে গডফাদার রক্তাপ্লুত দেহে ফিরে এলেন নিজের ঘরে। একা ডরোথিকে ওর ঘরে রেখে।

আরও দিনসাতেক বেঁচেছিলেন তিনি। মারা গেলেন রোবটদের সাহায্যে ডরোথিদের উদ্ধার করতে

গিয়ে। আর্থার জানত—গডফাদারের দিনপঞ্জিকা সে আদ্যন্ত পড়েছে; তাই সে নিঃসন্দেহ ছিল—লেকজান্ডা, ব্যাটলার প্রভৃতি বিশ্বত্রাসের ছায়ামূর্তিরা তার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। সুতরাং ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে আর্থার ক্রুক্‌সের গাত্রে কোনও ব্যথা হয়নি। ডরোথিকে উদ্ধার করা গেল না। ক্ষোভে দুঃখে অনুশোচনায় গডফাদার ভগ্নহৃদয়ে মারা যান।

* * *

দীর্ঘ কাহিনি শেষ করে প্রফেসর আইনস্টোন বলেন, সব কথাই শুনেছেন। সেই আর্থার ক্রুক্‌স্ লোকটা আজও আছে ভূগর্ভস্থ রাজপ্রাসাদ দখল করে। ভূগর্ভস্থ প্রাসাদে খাদ্য ও মদ্য যথেষ্ট আছে। সচরাচর সে মত্তাবস্থায় সেখানেই পড়ে থাকে। মাঝে মাঝে স্বয়ংক্রিয় লিফ্‌ট বেয়ে ওপরে আসে, খুঁজতে। তন্নতন্ন করে তল্লাসি সেরে আবার ফিরে যায় তার দুর্গে।

বব্ বলে, খুঁজতে মানে? কী খুঁজতে?

: গডফাদার আর ডরোথিকে।

: সে কী! এই যে বললেন—গডফাদার মারা গিয়েছেন এবং ডরোথিকে ও করায়ত্ত করেছিল!

: দুটোই ঠিক। তবে প্রথম কথা—নিগ্রোটা বিশ্বাস করে না, গডফাদার মারা গিয়েছেন। তার ধারণা, আমরা তাঁকে লুকিয়ে রেখেছি। আর দ্বিতীয় কথা, ডরোথিও এখন ওর কাছে নেই। সে নাকি পাগল হয়ে গিয়েছিল। ওর কবল থেকে একরাত্রে উন্মাদিনী পালিয়ে আসে। সে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছে।

ওয়াম্বাসী বলে, দাঁড়ান। ব্যাপারটা ভালভাবে বুঝে নিতে দিন। প্রথম কথা, গডফাদার যে মারা গিয়েছেন তার প্রমাণ কী? কোথায়, কীভাবে তিনি মারা যান? কে কে তাঁকে মৃত অবস্থায় দেখেছে?

প্রফেসর বলেন, শেষদিকে তিনি সমস্ত জগতের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে যান; কাউকে বরদাস্ত করতেন না। আমাদের কাউকে নয়। মৃত্যুসময়ে মাত্র দুজন ছিলেন ওঁর শয্যাপার্শ্বে। ওঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক এবং ওয়েস্টার্ন কমান্ডের সেনাপতি রুডলফ্ ব্যাটলার।

: ব্যক্তিগত চিকিৎসকটি কে?

: তাঁর সঙ্গে আপনাদের পরিচয় হয়নি। তিনি একজন প্রতিভাধর গামা জীবনবিজ্ঞানী—ডক্টর সিংহমুন্ড ব্রয়েড। বিখ্যাত রোবোসাইকলজিস্ট (robopsychologist)—প্রগাঢ় পণ্ডিত এবং অত্যন্ত ভালো লোক।

: বুঝলাম। তাঁকে চিনতে পেরেছি।

প্রফেসার অবাক হয়ে বলেন, সে কী! তাঁর সঙ্গে তো আপনাদের আলাপই হয়নি! তিনি আমাদের ডর্মিটরিতে থাকেন না। অন্যত্র গবেষণারত।

ওয়াম্বাসী বললে, না। গামা পণ্ডিত রোবোসাইকলজিস্ট সিংহমুণ্ড ব্রয়েডকে চিনি না, তবে তিনি যাঁর ছায়ামূর্তি সেই বিশ্ববিশ্রুত মনোবিজ্ঞানীটিকে চিনি।

বব্ বললে, আর ডরোথি! সে যে বিকৃতমস্তিষ্কা হয়েছিল, পালিয়ে এসেছিল, তার কী প্রমাণ?

: তার অবশ্য অকাট্য প্রমাণ আছে, সাক্ষীও আছে। বস্তুত আমি নিজেও তার সাক্ষী। ভূগর্ভস্থ দুর্গ থেকে সে যখন প্রথম পালিয়ে আসে, তখনও সে একেবারে উন্মাদিনী হয়ে যায়নি। গেলে, ওভাবে আর্থারের নজর এড়িয়ে সে পালিয়ে আসতে পারত না। প্রথমে সে দেখা করে আমাদের সর্বাধিনায়কের সঙ্গে। আশ্রয় ভিক্ষা করে। সর্বাধিনায়ক আমার ওপর খুব আস্থা রাখেন। কোনো জটিলতা দেখা দিলেই আমাকে ডেকে পাঠান—এবার যেমন আপনাদের সব কিছু বুঝিয়ে দেবার দায়িত্বটা এত গামা-পণ্ডিত থাকতে আমাকেই দিয়েছেন। সে যাই হোক, আমি সর্বাধিনায়ককে পরামর্শ দিলাম—মেয়েটিকে তৎক্ষণাৎ লুকিয়ে ফেলতে এবং ডক্টর সিংহমুণ্ড ব্রয়েডের চিকিৎসাধীন রাখতে। মনের অসুখের পক্ষে—ও! সে তো আপনারা জানেনই। মানে উনি যাঁর ছায়ামূর্তিতে গড়া.....

বব্ বাধা দিয়ে বললে, তারপর কী হল বলুন?

: সম্রাট সেরাত্রেই তাকে পাঠিয়ে দিলেন ডক্টর ব্রয়েডের মানসিক চিকিৎসালয়ে। ডক্টর ব্রয়েড তাকে পরীক্ষা করে বললেন, বেচারি এমন গুরুতরভাবে মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে যে, সে আর

স্বাভাবিক হবে না। তবু তাকে লুকিয়ে রেখে চিকিৎসা শুরু হল। পরদিনই আর্থার এল তার খোঁজে। সন্ধান পেল না। তারপরেই ডরোথি একেবারে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যায় এবং ডক্টর ব্রয়েডের উন্মাদাগার থেকে পালিয়ে যায়। হয়তো তাকে খুঁজে পাওয়া যায়—কিন্তু আমার চেষ্টা করিনি। কারণ তার সাথে আর পাঁচটা প্রায়-জন্তু আমেরিকানের এখন আর কোনো প্রভেদ নেই।

প্রফেসর আইনস্টোন থামলেন। নীরবতা ঘনিয়ে এল। একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে শেষে তিনিই আবার বলেন, এখন বলুন, আপনারা কি আমাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত?

ওয়াম্বাসীকে প্রত্যুত্তর করবার সুযোগ না দিয়ে বব্ রয় বলে ওঠে, আলবত! আজই। এখনই।

ওয়াম্বাসী বললে, আমি আমার বন্ধুর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। তবে আমার আরও কতগুলি প্রশ্ন আছে।

: বলুন?

: আপনি বলেছেন, গডফাদারের ভূগর্ভস্থ দুর্গটা হচ্ছে মাটির নীচে—এক মাইল গভীরে। সেখানে যাবার এবং উঠে আসার একটি মাত্র লিফ্‌ট। সেক্ষেত্রে আপনারা তো সহজেই তাকে শেষ করতে পারেন, ঐ লিফ্‌টটা ভেঙে দিয়ে, অকেজো করে দিয়ে। তাহলেও সে অবশ্য দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবে—কিন্তু আপনাদের তাতে ক্ষতি নেই। কারণ সে কোনোদিনই ওপরে উঠে আসতে পারবে না।

আইনস্টোন হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়েন। বলেন, আপনারা খেয়াল করে দেখেননি। 'রোবোটিক্স'-বিজ্ঞানের প্রথম তিনটি সূত্রই আমাদের সে অধিকার কেড়ে নিয়েছে। বিংশ শতকের চারের দশকেই Cybernetics-বিজ্ঞান অর্থাৎ রোবট-বিজ্ঞান যে তিনটি প্রাথমিক সূত্র বেঁধে দিয়েছিল তা এই :

1. A robot may not injure a human being or, through inaction, allow a human being to come to harm.

2. A robot must obey the orders given to it by human beings, except where such orders would conflict with the First Law.

3. A robot must protect its own existence, except where such protection would conflict with the First or Second Law.

অর্থাৎ :

(1) রোবো কোনো মানুষের ক্ষতি করতে পারবে না—এমন কোনো কাজ করবে না বা করা থেকে নিরত থাকবে না, যাতে মানুষের ক্ষতি হয়!

(2) মানুষের দেওয়া আদেশ রোবো মানতে বাধ্য থাকবে—যদি না সে আদেশ প্রথম সূত্রের পরিপন্থী হয়।

(3) রোবো সর্বদা নিজেকে রক্ষা করবে, যদি না সে প্রচেষ্টা প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রের পরিপন্থী হয়।

সুতরাং বুঝতেই পারছেন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আর্থারের পাপের শাস্তি দিতে আমরা অক্ষম। আপনারা দুজন রোবো নন, মানুষ—আপনারা তা পারেন। আপনারা অনায়াসে ঐ লিফটের যন্ত্রটা বিকল করে দিতে পারেন, আমরা পারি না।

বব্ দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ করে, না। লোকটা ওখানে বসে বছরের পর বছর দামি মদ খেয়ে যাবে—এ আমার সহ্য হবে না। আমি নিজেই ওখানে যাব। আমাকে একটা লেসার-বীম অটোমেটিক দিন শুধু। এডওয়ার্ড কলিন্স যেভাবে মৃত্যু-যন্ত্রণায় কাতরেছিল সেইভাবে ওকে মরতে না দেখলে আমি তৃপ্তি পাব না।

প্রফেসর আইনস্টোন ওয়াম্বাসীকে বলেন, আপনারও কি তাই মত?

ওয়াম্বাসী বলে, সিদ্ধান্তে আসার আগে আমি একবার ডক্টর ব্রয়েডের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

বব্ উঠে দাঁড়ায়। ওয়াম্বাসীকে বলে, লুক হিয়ার ডক্টর ওয়াম্বাসী! তুমি কী জন্য ইতস্তত করছ তা আমি জানি।

: কী জন্য?—অবাক হয়ে জানতে চায় ওয়াম্বাসী।

: শয়তানটা তোমার স্বজাতীয় বলে। ব্ল্যাকি নিগার বলে।

ওয়াম্বাসী তার আশ্চর্য চোখজোড়া তুলে নির্বাক তাকিয়ে থাকে।

ছয়

মাপ করবেন, আমি মনশ্চক্ষে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—আপনি 'স্রেফ গাঁজা' বলে বইটা বন্ধ করে রাখছেন। রাখবেন না। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ। আজ্ঞে হ্যাঁ—স্বীকার করছি, আমার গল্পের গরু এবার গাছে উঠবার উপক্রম করছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন—তালগাছ নয়, ছোট ছোট চারাগাছ। গল্পের গরু এমন দু-একটা ছোটখাটো গাছে উঠলে তাতে দোষ ধরতে নেই।

অন্তত আমাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের একটা সুযোগ দিন।

এই ছয়-নম্বর পরিচ্ছেদে তাই গল্পটা ধামা-চাপা দিয়ে আমি নিছক বৈজ্ঞানিক আলোচনা করতে চাই। এ পরিচ্ছেদে আমি বিন্দুমাত্র কল্পনার আশ্রয় নেব না—আমার জ্ঞানমতে মানুষ ও রোবোর মূলগত পার্থক্যটা নির্ণয় করব,—যে কল্পনাশ্রয়ী কাহিনি রচনা করছি তার যাথার্থ্যটুকু 1976-সাল-তক্ আবিষ্কৃত বিজ্ঞানের বিচারে যতদূর সম্ভব তা যাচাই করে দেখব।

নিছক বৈজ্ঞানিক আলোচনায় আপনার যদি কোনো এ্যালার্জি থাকে, তাহলে এই পাতা কটা উল্টে যান। 'গপ্পো'টা শুরু হচ্ছে আবার সাত নম্বর পরিচ্ছেদে।

আপনার আপত্তিটা কোথায়? মূল আপত্তি তো এই—যত যাই হোক, রোবো যন্ত্র-মাত্র; তা জীবন্ত নয়। তার ওপর চৈতন্যময় জীবন মানুষের গুণাবলী আরোপ করাটা বেআইনি। কিন্তু আপনি কি জানেন—'রোবোটিক্স' বিজ্ঞান আজ কতদূর উন্নত? জীবন্ত মানুষের সঙ্গে যন্ত্র-মানুষের—Homo-Sapiens-এর সঙ্গে Mechano-Sapiens-এর তফাত আজ কতটুকু? আপনি কি নিশ্চিত—সে প্রভেদটুকু আগামী শতাব্দীতে বিজ্ঞান দূরীভূত করতে পারবে না?

'জীবন' বলতে কী বোঝেন? 'প্রাণ'-এর সংজ্ঞা কী?

আপনি হয়তো উল্টে ধমক দেবেন আমাকে : বা রে! আমি পাঠক, তা আমি কেন বলতে যাব? তুমি লেখক, কলম ধরার দুঃসাহস দেখিয়েছ—তুমিই বল, আমি বরং বিচার করে রায় দেব—ভুল বলছ, না ঠিক বলছ!

বেশ, তাই সই।

এ-কথা তো মানবেন—সংজ্ঞা দু-জাতের হতে পারে। ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অথবা 'ঔপাদানিক' দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। হয় তার কাজকর্ম দেখে, নয় তার উপাদান থেকে। 'বাড়ি'র সংজ্ঞা হিসাবে বলতে পারি—'বাড়ি হচ্ছে যেখানে বাস করি।' এটা ব্যবহারিক সংজ্ঞা। আবার বলতে পারি—'ইট কাঠ সিমেন্ট বালি দিয়ে বানানো মাথা গোঁজার আশ্রয়কে বলি বাড়ি।'

দুটি সংজ্ঞার কোনোটিই কিন্তু আমাদের বাড়িতে পৌঁছে দেয়নি, বরং পথে বসিয়ে দিয়েছে। তাঁবুতে মানুষ বাস করতে পারে, গুহাতেও, মায় ক্ষেত্র-বিশেষে গাছতলাতেও—সেগুলো কিন্তু বাড়ি নয়। আবার দরিদ্র গ্রামবাসীর সাতপুরুষের খড়-মাটির ভিটেখানা ইট-কাঠ-সিমেন্ট-বালির সংস্পর্শ ছাড়াও নিশ্চয় 'বাড়ি'।

দুটি দৃষ্টিভঙ্গিকে একত্র করলে কি সমাধানের নাগাল পাব? যদি বলি—'বাড়ি হচ্ছে এমন কিছু যা আমরা ইট-কাঠ-চুন-সুরকি-সিমেন্ট-লোহা-খড়-টিন-এ্যাসবেস্টস সীট দিয়ে বানাই তার ভেতর বাস করার জন্য।' আজ্ঞে না, এখনও 'বাড়ি'র পথ খুঁজে পাইনি। আমড়াতলার মোড়ে বেমক্কা ঘুরে মরছি কারণ এস্কিমোদের 'ইগ্‌লু' বানাতে ঐ লম্বা উপাদানের ফিরিস্তির কোনোটাই প্রয়োজন হয় না; তবু তা নিঃসন্দেহে বাড়ি। বাস করবার উদ্দেশ্যে তাজমহল বানানো হয়নি—সেটা কি তাহলে 'বাড়ি' নয়?

'জীবন' বা 'প্রাণ'-এর সংজ্ঞা নির্দেশ করবার সময়েও আমরা এই জাতের ঝামেলায় পড়ব স্কুলপাঠ্য জীববিজ্ঞানের বইতে লেখা হল—'প্রাণী তাকেই বলব, যার পারিপার্শ্বিকতার বোধ আছে, য খাদ্যগ্রহণ করে, খাদ্যকে জীর্ণ করে, তার সারাংশ গ্রহণ করে শক্তিসঞ্চার করে—যা জীর্ণ খাদ্যাংশের অবশেষ দেহ থেকে ত্যাগ করে, যার বৃদ্ধি আছে এবং যা বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম।'

বৈকুণ্ঠের খাতার নামকরণের মতো মনে হচ্ছে : 'এতে আর কোনো কথাটি বাদ যায়নি!'

এ পরিচ্ছেদে ভবিষ্যতে ঐ সুদীর্ঘ সংজ্ঞাটির পুনরুল্লেখ করতে আমি সংক্ষেপে শুধু বলব 'যার পারিপার্শ্বিকতার বোধ আছে, ইত্যাদি।' তাতে আমার হাতে এবং আপনাদের চোখে যন্ত্রণাটা কিছু কম হবে। তা হোক, কিন্তু ঐ সুদীর্ঘ সংজ্ঞা কি জীবনকে পুরোপুরি বোঝাতে পারল?

কঙ্কালকে আশ্রয় করে জীবদেহ যেমন গড়ে ওঠে, মাঝের সুতোটাকে আশ্রয় করে মিছরির দানাটাও যে দেখছি সে-ভাবে গড়ে উঠছে। চিনির সরবতটা কেন তার খাদ্য হিসারে গণ্য হতে পারে না? সর্বভুক অগ্নি তো কাঠ, কয়লা, কাগজকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে? ভুক্তাবশিষ্ট অঙ্গারকে ত্যাগ করে দিবি বেড়ে ওঠে; মায় এ-বাড়ির চাল থেকে ও-বাড়ির চালে ছোটে বাচ্চা পয়দা করতে; তারাও বেড়ে ওঠে; বড় হয় ক্রমশ! সংজ্ঞায় যা যা বলা হয়েছে তার শেষ দুটি শর্ত (বৃদ্ধি ও প্রজনন) ছাড়া আর সব কটিই তো আজ রোবোরা পূরণ করতে সমর্থ! সুতরাং মানতে হবে, ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গির ঐ সংজ্ঞায় জীবনকে তর্কাতীতভাবে ব্যাখ্যা করা গেল না।

এবার বরং 'উপাদান'-এর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করে দেখি। জীবন কী দিয়ে তৈরি? তার মূল উপাদান কী?

সপ্তদশ শতাব্দীর তৃতীয় পদে ইংরাজ বৈজ্ঞানিক রবার্ট হুক কিছু 'কর্ক' নিয়ে অণুবীক্ষণ-যন্ত্রে পরীক্ষা করেছিলেন। দেখলেন, তাতে খুব ছোট ছোট খোপ আছে। তিনি তাদের নাম দিলেন cell বা কোষ। এ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে। প্রায় দেড়শ বছর পরে, বস্তুত 1830 সালে, দুজন জার্মান জীববিজ্ঞানী এই সিদ্ধান্তে এলেন—'জীবন্ত প্রাণীর দেহ ঐ জীবকোষের সমষ্টি।'

এতক্ষণে একটা ঔপাদানিক সংজ্ঞা পেলাম—'প্রাণীদেহ জীবকোষ দ্বারা গঠিত।

কিন্তু 'প্রাণী' পেলাম কোথায়? জীবকোষ দ্বারা গঠিত হলে 'প্রাণীদেহ' হয় বটে, প্রাণী হয় না। একটা কাটা গাছ বা মরা ছাগলের দেহও তো জীবকোষ দ্বারা গঠিত!

তবে কি একটা বিশেষণ যোগ করব?—'প্রাণী জীবন্ত জীবকোষ দ্বারা গঠিত!'

আপনি আমাকে ধমক দেবেন—এটা কেমনতর যুক্তি? 'জীবন'-এর সংজ্ঞা রচনায় 'জীবন্ত' কথার ব্যবহার বেআইনী! তা ঠিক।

আচ্ছা, এবার যদি ঐ দুটো সংজ্ঞাকে—ঐ ব্যবহারিক সংজ্ঞা আর উপাদানের সংজ্ঞা দুটোকে জুড়ে দিয়ে বলি, 'প্রাণী হচ্ছে তাই, যা জীবকোষ দ্বারা গঠিত এবং যার পারিপার্শ্বিকতার বোধ আছে, ইত্যাদি!'

এবার অনেকটা এগিয়েছি। এখন মিছরির দানা, অমরনাথের শিবলিঙ্গ, উইয়ের ঢিপি, আগুন, রোবো ইত্যাদির ঝামেলা এড়ানো গেছে। এমনকি ভূপতিত গাছ, কাটা পাঁঠা কিংবা মৃতদেহকেও। প্রথমোক্তরা জীবকোষ দ্বারা গঠিত হয়, দ্বিতীয়োক্তরা জীবকোষ দ্বারা গঠিত হলেও সেই দীর্ঘ শর্তগুলি মানছে না—সেই যে 'যার পারিপার্শ্বিকতার বোধ আছে, ইত্যাদি!'

এবার একটা কথা বলব? সংজ্ঞাটি নির্ধারিত হওয়ার আগে 'জীবন্ত জীবকোষ' শব্দটা ব্যবহার করায় আপনি আমাকে ধমক দিয়েছিলেন। এখন তো সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়েছে; এখন প্রশ্ন তুলি—গোটা প্রাণীটা নয়, ঐ প্রতিটি জীবকোষ কি জীবন্ত? যদি বলেন, না; তখন বলব, তাহলে কি মৃত জীবকোষ দিয়ে জ্যান্ত প্রাণী পয়দা করা সম্ভব? আপনাকে স্বীকার করতে হবে—না, তা সম্ভব নয়। আবার যদি বেগতিক দেখে বলেন, হ্যাঁ; তখন চেপে ধরব—তাহলে একটা মানুষের দেহে যতগুলি কোষ আছে ততগুলি জীবনও আছে? বেড়ালের নয়টা প্রাণের মতো প্রতিটি মানুষের তাহলে 10^{17} সংখ্যক প্রাণ আছে—যেহেতু তার দেহে কোষের সংখ্যা ঐ অত? আপনাকে রামপ্রসাদী ভাঁজতে হবে : বল মা তারা, দাঁড়াই কোথা!

আসলে সমস্যাটার চূড়ান্ত সমাধান এখনও হয়নি। আমাদের মাথার চুল, হাত-পায়ের নখ জীবকোষ দ্বারাই গঠিত, কিন্তু তারা জীবন্ত নয়। অথচ তাদের বৃদ্ধি আছে—যতক্ষণ গোটা জীবটা আছে জীবন্ত। প্রতিটি কোষকে যদি আলাদা আলাদা করে বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব—তারা 'প্রাণে'র কিছু কিছু পরিচয় বহন করছে বটে, কিন্তু সবটা নয়। মাথার চুলের বৃদ্ধি আছে, কিন্তু তা দেহের অপরিহার্য অঙ্গ নয়—গোটা মাথাটা নেড়া করে ফেললেও বেঁচে থাকব; আবার মাথার চুল গজাবে। অপরপক্ষে দেহে

স্নায়ুকোষের বৃদ্ধি নেই—জন্মের সময় ঠিক যতগুলি স্নায়ু-কোষ নিয়ে জন্মেছি তাই আমার পুঁজি, আর বাড়বে না, বরং কমতে পারে—কিন্তু তাদের সবাইকে বাদ দিয়ে আমি বাঁচব না। সুতরাং বলতে পারি—মানবদেহের বিভিন্ন কোষ তাদের অবস্থান অনুযায়ী, কার্যকারিতা অনুযায়ী, প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু কিছু পরিমাণে প্রাণের স্বাক্ষর বহন করে বটে কিন্তু সবটা নয়, তারা 'প্রাণী' নয়। তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতে একটি বিশেষ 'ছন্দবদ্ধ সংগঠনে' জীব প্রাণবন্ত থাকে। কোনও কোষ ব্যাট করে, কেউ বল করে, কেউ ক্যাচ লোফে—তাদের সামগ্রিক সাফল্যে 'জীব' নামক টিমটা মৃত্যুর বিরুদ্ধে টেস্টে জিততে পারে। তারা ফেল মারলে—এক-আধটা লুজ বল দিলে নয় (চুল কাটা, নখ কাটা) এক-আধটা ক্যাচ ফেললে নয় (ঠ্যাঙ কাটা, কান কাটা)—'ভাইটাল মিস্টেক' করলে জীব নামক টিম হেরে ভূত হয়ে যায়। একেবারে পঞ্চভূত! এ্যাশেস্!

তাহলে কি আধা-প্রাণের স্বাক্ষরবাহী অসংখ্য জীবকোষের সমাহার এই 'ছন্দবদ্ধ সংগঠন'-টাই জীবন?

তাই বা বলি কি করে? এমন 'প্রাণ' আছে, যার একটিমাত্র কোষ। একাই ফুল টিম! যেমন এ্যামিবা, যেমন ডিম্বকোষ। সে একাই ব্যাট করে, একাই বল করে, একাই ক্যাচ লোফে এবং মৃত্যুকে অস্বীকার করে একাই ড্যাংড্যাং করে বাদ্যি বাজিয়ে জীবনের জয়যাত্রা ঘোষণা করে। তাহলে?

জীববিজ্ঞানীরা বললেন, তাহলে বোধ করি জীবকোষই জীবনের শেষ কথা নয়। আগে কহ আর! অণু ভেঙে যেমন পদার্থ-বিজ্ঞানে পাওয়া গেল পরমাণু; সেই অবিভাজ্য পরমাণু ভেঙে পাওয়া গেল ইলেকট্রন-প্রোটন—তেমনিভাবে জীবকোষকে ভেঙে দেখা যাক কিছু পাওয়া যায় কি না। প্রাণের উৎসমুখ আরও গভীরে।

এমন একটা যুগ গিয়েছে, যখন বিজ্ঞান বিশ্বাস করত—জৈবপদার্থ রসায়নশাস্ত্রের বাইরে। রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে ঐ 'জীবন-রস'—যা ল্যাবরেটরিতে তৈরি করা যায় না—সেটা যুক্ত না হলে জৈবিক পদার্থ তৈরি হতে পারে না। বিজ্ঞানীরা তখনই জানতেন যে, জৈব-পদার্থের অণুতে আছে অন্তত একটি কার্বন পরমাণু, এবং জৈব অণুর ধর্ম হচ্ছে অত্যন্ত বেশি সংখ্যায় অন্যান্য পরমাণুকে আঁকড়ে থাকা। কার্বন পরমাণু যখন একটি অক্সিজেন-পরমাণুর সঙ্গে জোড় বাঁধে তখন তৈরি হয় কার্বন-মনোক্সাইড; দুটি অক্সিজেন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হলে হয় কার্বন ডায়ক্সাইড—এগুলি কার্বন-যুক্ত হলেও জৈবিক অণু নয়। জৈব অণুর ক্ষেত্রে অনেকগুলি পরমাণু জড়াজড়ি করে থাকে। এই যে বহু পরমাণুর সঙ্গে একাধিক কার্বন পরমাণুর জড়াজড়ি করে থাকার ধর্ম—জৈবিক অণুর গঠন, সে-কালের বিজ্ঞানীরা বলতেন তার মূলে আছে ঐ 'জীবন-রস'! কিন্তু 1828 খ্রীস্টাব্দে বীক্ষণাগারে জৈব পদার্থ 'ইউরিয়া' তৈরি করে বিজ্ঞানী উলার প্রমাণ করলেন জৈব অণু তৈরি করতে 'জীবন-রস' জাতীয় কিছুর প্রয়োজন হয় না। সৃষ্ট হল রসায়নের একটি বিশেষ বিভাগ—Organic Chemistry বা জৈব রসায়ন।

এবার বিজ্ঞানীরা বসলেন জীবকোষকে বিভাজন করতে।

কোষ বা cell কী? মোটামুটি বলতে পারি তার তিনটি অংশ। প্রথমত, একটা বহিরাবরণ বা আচ্ছাদন (membrane) যা কোষকে ঘিরে রাখে; দ্বিতীয়ত, একটা কেন্দ্রস্থল বা নিউক্লিয়াস, তৃতীয়ত, ঐ বহিরাবরণ ও নিউক্লিয়াসের মাঝখানে আছে সাইটোপ্লাজম্ (Cytoplasm)।

মোটামুটি বললাম এজন্য যে, ঐ তিনটি শর্ত সব জীবকোষ পূরণ করে না। আমাদের হৃদপিণ্ডে এমন কোষ আছে যার বহিরাবরণ নেই; লোহিত রক্ত কণিকায় এমন কোষ (কোষ ঠিক নয়, সেগুলি করপাসল্স্) আছে যার কেন্দ্রস্থল বা সেল-নিউক্লিয়াস নেই। তা জটিল মানবদেহের এসব ব্যতিক্রম না হয় বাদই থাক আপাতত।

দেখা গেল, জীবকোষ যখন বৃদ্ধির তাগিদে দ্বিধা-বিভক্ত হয় তখন দুটি টুকরোতেই থাকে কিছু পরিমাণে বহিরাবরণ, কিছুটা সেল-নিউক্লিয়াস এবং কিছুটা সাইটোপ্লাজম। ঐ সঙ্গে আরও দেখা গেল, সেই নিউক্লিয়াসে আছে একটা পদার্থ—তার নাম ক্রমোসম্ (Chromosome)—কোষটি দ্বিধাবিভক্ত

হওয়ার সময় ক্রমোসমও দ্বিধাবিভক্ত হয়। ক্রমোসম দু-জাতের—X এবং Y; তারা জোড়ায়-জোড়ায় থাকে। পুরুষের জীবকোষে থাকে X এবং Y; নারীজাতির জীবকোষে X এবং X। প্রতিটি পুরুষের প্রতিটি জীবকোষে আছে তেইশ জোড়া ক্রমোসম—এক-এক জোড়ায় একটি X এবং একটি Y; অপরপক্ষে স্ত্রীলোকের প্রতিটি জীব-কোষে আছে তেইশ জোড়া ক্রমোসম, এক-এক জোড়ায় এক জোড়া করে X ক্রমোসম। শুক্রকোষের সঙ্গে ডিম্বকোষের মিলন-মুহূর্তে যদি মায়ের X ক্রমোসমের সঙ্গে বাপের X ক্রমোসম যুক্ত হয় তবে সন্তানের থাকবে দুটি X, অর্থাৎ সন্তান হবে কন্যারত্ন; অপর পক্ষে মায়ের X ক্রমোসমের সঙ্গে বাপের Y ক্রমোসম যুক্ত হলে পরিণামের XY জন্ম দেবে পুত্রসন্তানের।

তবে কি ক্রমোসমই 'জীবন'-এর শেষ কথা? না! জীববিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন, ক্রমোসমের অন্তর্নিহিত আর একটি সূক্ষ্মতর সত্তা। তার নাম জীন (gene)। বস্তুত ক্রমোসম যেমন স্ত্রী-পুরুষের ভেদাভেদ নির্ণয় করে, তেমনি জীন ঐ জীবের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করে দেয়। সন্তানের গায়ের রঙ, চোখ কটা হবে না কালো হবে না নীল হবে—সন্তান ভাবুকপ্রকৃতির হবে না উদ্ধত স্বভাবের হবে, তা নির্ভর করে পিতা এবং মাতার 'জীন' সন্তানের জন্ম-মুহূর্তে যে পরিমাণে তার আদিম জীবকোষে এসেছে তার উপর।

জীবকোষকে ভেঙে পেয়েছিলাম সেল-নিউক্লিয়াস, তা ভেঙে পেয়েছি ক্রমোসম, তা ভেঙে এবার পেলাম জীন—কিন্তু তার আকার কত বড়? বা কত ছোট? অণু বা পরমাণুর তুলনায় জীন কতটুকু? এবার সেটা ধারণা করে নেওয়া যাক। ক্রমোসমের মাপ ধরুন 10^{-14} ঘন সেন্টিমিটার। অর্থাৎ 1/100,000,000,000,000 ঘন সেন্টিমিটার। ঐ অত ক্ষুদ্র ক্রমোসমে জীন আছে কয়েক হাজার; অর্থাৎ জীনের আয়তন 10^{-17} ঘন সেন্টিমিটার। এই সঙ্গে বলে রাখা ভাল, একটা পরমাণুর গড় আয়তন 10^{-23} ঘঃ সেঃ। অর্থাৎ একটি জীনে প্রায় লাখ-দশেক পরমাণু আছে!

বৈজ্ঞানিক গ্যামো বলছেন, "The gene is the smallest unit of living matter. Further, while it is certain that genes possess all of those characteristics that distinguish matter possessing life from matter that does not, there is also hardly any doubt that they are linked on the other side with the complex molecules (like those of proteins) which are subject to all the familiar laws of ordinary chemistry. In other words, it seems that in the gene we have the missing link between organic and inorganic matter, the 'living molecule.'"

অর্থাৎ, "জীনই হচ্ছে সজীব পদার্থের ক্ষুদ্রতম উপাদান। যদিও একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, জড় ও জীবনের পার্থক্য-নির্ণয়ের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য ঐ জীনেই বিধৃত, তবু একথাও নিঃসন্দেহে ব্যক্ত করা যায় যে জীন অন্যান্য জটিল অণুর (যেমন প্রোটিন অণু) সঙ্গে সাধারণ রায়ায়নিক বিজ্ঞানের আইনে যুক্ত হয়। ভাষান্তরে, জৈব ও অজৈব পদার্থের, অর্থাৎ জীবন ও জড়ের লুক্কায়িত যোগসূত্রটি আমরা এতক্ষণে পেয়েছি—তা হচ্ছে : জীন = সজীব অণু।"

জর্জ গ্যামো ঐ উক্তি করেছিলেন 1946 সালে তাঁর অমর গ্রন্থ "One.....Two.....Three.....Infinity"-তে। তার সাত বৎসর পরে জীববিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ক্রিক এবং জেমস্ ওয়াটসন বললেন—না। ওখানেও থামা যাচ্ছে না। আরও সূক্ষ্মতর বিচার করলেন তাঁরা। বিশ্লেষণে দেখা গেল, প্রতিটি কোষ যেসব অণুর দ্বারা গঠিত তার কিছু অংশ জৈবিক, কিছুটা অজৈবিক, যেমন জল। জৈবিক অণুর ভেতর সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রোটিন-জাতীয় অণু। কোন জীব, তা এ্যামিবার মতো এক কোষ-বিশিষ্টই হোক, অথবা বহু-কোষ বিশিষ্টই হোক—ঐ প্রোটিন ছাড়া গঠিত হতে পারে না। প্রোটিন জীবনে নানাভাবে সাহায্য করে। কিছু প্রোটিন দেহের বহিরাবরণ গড়ে তোলে—চামড়া, চুল, পেশি, মেদ, মজ্জা ইত্যাদি। আবার অন্য এক জাতের প্রোটিন-অণু সাহায্য করে জীবকোষকে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ নিতে। এই দ্বিতীয় জাতের প্রোটিন-অণুর নাম এনজাইম (enzyme)।

জীববিজ্ঞানী ক্রিক এবং ওয়াটসন 1953 সালে প্রমাণ করলেন—জীবদেহ জীবিত থাকার যে প্রমাণ—ক্রমাগত জৈবিক রাসায়নিক বিক্রিয়ায় নব-নব কোষের জন্ম—তার মূলে আছে ঐ এনজাইম, যা সৃষ্ট হচ্ছে সেল নিউক্লিয়াসস্থিত ক্রোমোসমের দ্বারা। তাঁরা আরও প্রমাণ করলেন, কোষের বিভাজন ও বৃদ্ধির নিয়ামক এক জাতের নিউক্লিক অ্যাসিড, যার সংক্ষিপ্ত নাম DNA। তারা নিজেরা সব কিছু করে না—হুকুম চালায় তাদের সহকারীদের ওপর। এই সহকারী দলের নাম RNA। হুকুমটা যার মাধ্যমে পাঠান হয় তার নাম পলিমেরজ (Polymerase) এবং RNA যা দিয়ে কাজ করে তার নাম রিবোসোম (ribosome)। ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারলেন না, নয়? আজ্ঞে, আমিও পারিনি। মাঝখান থেকে গোটাচারেক নতুন নাম পাওয়া গেল। এই জটিল ব্যাপারটি ঠিকমত বুঝে নিতে হলে সব চেয়ে সুবিধা হবে একটা অনুরূপতা বা analogy-র শরণ নেওয়া।

মনে করুন একটা কারখানা। সেটা চালু রাখতে তিনটি বিভাগ আছে : প্রথম বিভাগ — যার কাজ, কাঁচা মাল সংগ্রহ করা এবং কর্মকর্তার নির্দেশ মাফিক কারখানার বিভিন্ন অংশে ঐ কাঁচামাল সরবরাহ করা।

দ্বিতীয় বিভাগ — অফিস-দপ্তর। যেখানে উল্লিখিত নির্দেশগুলি রচিত হয়, এবং আদেশ তামিল করার জন্য প্রথম বিভাগে প্রেরিত হয়।

তৃতীয় বিভাগ — বড় কর্তাদের দপ্তর। ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের পরিচালনায় বিভিন্ন অফিসার—স্থপতিবিদ, সেল্‌স্ ম্যানেজার, প্রডাকশনার ম্যানেজার প্রভৃতি নানান কাজ করেন। তাঁদেরই নির্দেশে দ্বিতীয় বিভাগে আদেশগুলি রচিত হয়।

মানবদেহরূপী ঐ কারখানায় তৃতীয় বিভাগে ম্যানেজিং ডাইরেক্টার হচ্ছেন DNA (Deoxyribonucleic acid)। তাঁর অধীনে আছেন বিভিন্ন অফিসারবৃন্দ—তাঁরা RNA (Ribonucleic acid)। প্রথম বিভাগে হাতে কলমে কাজ করেন রোবোসোম এবং দ্বিতীয় বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন পলিমেরজ।

আপনি খেয়াল করে দেখেছেন কিনা জানি না—আমরা প্রাণের উৎস সন্ধানে যাত্রা করে শেষ পর্যন্ত জীবনের যে গোমুখে এসে উপনীত হয়েছি, তার চেহারাটা হুবহু একটা রোবো কারখানার মত! মানুষ ও রোবোর পার্থক্যটা কমে আসছে। তাতেই না আপনার আপত্তি? সুতরাং এখানেই থামা যাক। এবার বরং উল্টো দিক থেকে যাত্রা করে দেখি। রোবটিক্স-বিজ্ঞানের ক্রম-বিবর্তনের ইতিহাস। 10^{17} কোষ-বিশিষ্ট মানবদেহের সমুদ্র থেকে উজান বেয়ে সরু হতে হতে প্রাণের উৎসধারার গোমুখে তার যে স্বরূপ দেখলাম তা রোবো কারখানার মত। এবার আদিমতম রোবো থেকে যাত্রা শুরু করে দেখি—মানুষের মোহনায় এসে পৌঁছানো যায় কিনা।

* * *

মূল প্রশ্নটা হচ্ছে : যন্ত্র কি স্বাধীনভাবে চিন্তা করার অধিকারী হতে পারে?

গ্রামোফোন রেকর্ড গান গায়, টেলিভিশনে কিংবা সিনেমায় শুধু শব্দ নয়, ছায়ামূর্তিকে নড়া-চড়া করতে দেখি—তারা কবিতা লেখে, খুন করে, প্রেম করে! কিন্তু এসব ক্ষেত্রে যন্ত্রটা আদৌ 'স্বাধীনভাবে' চিন্তা করেনি। চালকের পূর্বনির্ধারিত নির্দেশ মেনে শুধুমাত্র জীবনের অনুকরণ করেছে। বরং বলতে পারি—ঐ যে প্রজাপতিটা এ-ফুলে বসল, ও-ফুলে বসল না, তার স্বাধীন চিন্তা ঐ যন্ত্রের চেয়ে বেশি। আপাতদৃষ্টিতে ঐ-রকম মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, ঐ প্রজাপতি-পতঙ্গ-গাছ-মাছ পাখি-প্রাণীরাও 'সে হিসাবে' স্বাধীন চিন্তার অধিকারী নয়। কে তাদের চালায়? বিবর্তনবাদের অমোঘ প্রভাব। প্রকৃতি তাদের চালনা করে—প্রজাতিকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে। গঙ্গাফড়িং পাখির নজর থেকে বাঁচতে সজ্ঞানে তার গায়ের রঙটা ঘাষের শিষের অনুকরণে সবুজ করেনি। বাঘটা স্বাধীন ইচ্ছায় হরিণের ওপর লাফিয়ে পড়ে না, হরিণটাও স্ব-ইচ্ছায় ছুটে পালায় না। প্রকৃতি বিবর্তনবাদের আইনে ঘাড়ে ধরে তাকে ঐভাবে চালনা করে।

মানুষের ক্ষেত্রে তা নয়। সে স্বাধীন চিন্তার অধিকারী। তাই বোধ করি—'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' কারণ পাখিকে প্রকৃতি গান গাইতে শিখিয়েছে, তার বেশি সে কিছু করে না; কিন্তু 'আমারে দিয়েছ স্বর, আমি তার বেশি করি দান, আমি গাই গান।' (এটা অবশ্য কবি-কল্পনা, মানুষকেও কেউ স্বর দেননি, সেটাও বিবর্তনের তাগিদে মানুষের স্বোপার্জিত)। মানুষ শুধু গানই গায় না, সে কবিতা লেখে, নাটক অভিনয় করে, ছবি আঁকে, আঁক কষে, ভাবে।

অঙ্কের কথাই বলি :

রোবো না হয় বিংশ শতাব্দীর অবদান, মানুষ যন্ত্রের সাহায্যে অঙ্ক কষছে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে। অঙ্ক কষার প্রথম যন্ত্র তার হাতের আঙুল। মানুষ যেদিন কর গুনতে শিখল, সেদিনই হল এই 'রোবটিক্স-বিজ্ঞানের' প্রথম সূত্রপাত। মাথায় না ধরে তাই ও ধরতে চাইল আঙুলে। তার প্রমাণ আজও রয়ে গেছে ভাষাতত্ত্বে—'সংখ্যা, এবং 'আঙুল' দুটিরই ইংরাজি প্রতিশব্দ—digit। কিন্তু তাতে তো মাত্র দশটা আঙুল, হাতে-পায়ে বিশটা। বুদ্ধি আর একটু বাড়লে মানুষ তাই আঙুলের বদলে নুড়িপাথর কুড়িয়ে গুনতে শুরু করল। এখানেও ভাষাতত্ত্বে নজিরটা গোপন আছে—ইংরাজি calculate শব্দটা এসেছে যে ল্যাটিন শব্দ থেকে তার অর্থ নুড়িপাথর।

তার পরের যুগে বুদ্ধিমান মানুষ অঙ্ক কষার জন্য যে যন্ত্রটা আবিষ্কার করল তার নাম এ্যাবাকাস (abacus)। নার্সারি স্কুলে ছোট বাচ্চাদের যোগঅঙ্ক শেখাতে প্রায় ঐ জাতের যন্ত্র আমরা এখনও ব্যবহার করি। মনে রাখা দরকার, তখনও 'শূন্য' আবিষ্কৃত হয়নি; অর্থাৎ ৯-এর পিঠে শূন্য বসালে যে ৯০ হয়, নয়-এর মূল্য দশগুণ বৃদ্ধি পায়, এ জ্ঞান মানুষের ছিল না। তবু ঐ যন্ত্রের সাহায্যে তারা বেশ বড় বড় যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ করতে পারত।

প্রসঙ্গত বলি, ১ থেকে ৯ সংখ্যা ও শূন্যের ব্যবহার ইউরোপ শিখেছে আরবদের কাছে, একেবারে হাল আমলে—দ্বাদশ শতাব্দীতে। আরবী পণ্ডিতেরা ঐ সংখ্যাগুলিকে বলতেন 'রকম্ অল-হিন্দ' বা 'ভারতীয় সংখ্যা।' ফলে ইউরোপ স্বীকার করে, ঐ দশমিক পদ্ধতি ও 'শূন্যের' ব্যবহারের জন্য সে ভারতবর্ষের কাছে একান্তভাবে ঋণী।

কিন্তু ভারত সেটা কবে শিখল? কে শেখালো? অশোকের শিলালেখে শূন্যের ব্যবহার নেই; কিন্তু 1 থেকে 9 সংখ্যার ব্যবহার আছে। 9-এর পরে 10 বোঝাতে একটি চিহ্ন ব্যবহার করা হত। 11 বোঝাতে ঐ চিহ্নের পরে 1। এইভাবে 20, 30, 40,...90 পর্যন্ত বোঝানোর বিভিন্ন চিহ্ন ছিল। 100, 200, 300 প্রভৃতির জন্যও পৃথক পৃথক চিহ্ন। অর্থাৎ অশোকের আমলে 'একক-দশক-শতক'-এর ধারণা, যাকে বলি 'স্থান-মাহাত্ম্যে সংখ্যার মানের উন্নতি' সেটা চালু হয়নি।

শুধু ভারতবর্ষেই নয়, সারা পৃথিবীতে সেটা সর্বপ্রথম চালু হতে দেখেছি, আমি যতদূর জেনেছি, 594 খ্রীস্টাব্দে। সেটা কলচুরি সন 346; ঐ সালে একটি শিলালেখে প্রথম দেখেছি দশমিক পদ্ধতির প্রয়োগ। সেখানে পূর্বেকার নিয়ম মেনে—'তিনশ-জ্ঞাপক চিহ্ন + চল্লিশ-জ্ঞাপক চিহ্ন + ছয়' এভাবে না লিখে লেখা হল—346 ! তার মানে দেখতে পাচ্ছি, ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষপাদে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই অজ্ঞাতনামা গণিতজ্ঞ পণ্ডিত, যিনি শূন্যের আবিষ্কারক। তিনি কে তা জানি না, কিন্তু বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যাশাম (A. L. Basham)-এর মতে তিনি 'বুদ্ধদেব ব্যতিরেকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় যিনি বিশ্বসংস্কৃতিকে প্রভাবিত করছেন।'

যাক ওসব অপ্রাসঙ্গিক কথা। আমরা এখনও আছি সেই এ্যাবাকাসের যুগে। প্রাক-শূন্য অঙ্করাজ্যে। এ্যাবাকাস-এর ব্যবহারটা কৌতুকপ্রদ। রোবোর রাজ্যে প্রবেশ করতে হলে ঐ প্রাক-শূন্য যুগের যন্ত্রটাকে একটু ঘনিষ্ঠভাবে জেনে নিতে হয়। যন্ত্রে আছে নয়টা কাঠি, তাতে আছে পাঁচটা করে 'বীড' (রুদ্রাক্ষ বা পুঁথির মতো গোলাকার বস্তু, যার ভিতর দিয়ে ঐ নয়টা কাঠি পরানো আছে)। এ ছাড়া যন্ত্রে আছে একটা সমান্তরাল কাষ্ঠখণ্ড, যার ওপরদিকে আছে একটি রুদ্রাক্ষ এবং নীচের দিকে আছে চারটি। রুদ্রাক্ষগুলি এমনভাবে আছে যাতে সেগুলি ঠেলে দিলে ঐ কাষ্ঠখণ্ডকে স্পর্শ করবে, টেনে নিলে ফাঁক থাকবে। মনে রাখা দরকার, ঐ কাষ্ঠখণ্ডের ওপরের রুদ্রাক্ষটির মান = 5 এবং নীচের চারটি রুদ্রাক্ষের

প্রতিটির মান = 1। অর্থাৎ প্রতিটি কাঠিতে আছে 5 + (1+ 1 + 1 + 1) = 9 সংখ্যা। কাঠে স্পর্শ করলেই তা ধর্তব্য, নচেৎ নয়। সংলগ্ন চিত্রে—ঐ যন্ত্রটার সাহায্যে আমরা একটা যোগ অঙ্ক কষেছি। অঙ্কটা হচ্ছে 1,294 + 125 = 1,419।

চিত্রে বামদিকের যন্ত্রে দেখুন—ডানদিকের (বলতে পারেন এককের ঘরে, যদিও ওরা 'একক' চেনে না এখনও) প্রথম কাঠিতে নীচের দিককার চারটি রুদ্রাক্ষই ওপরে ঠেলা আছে, ফলে তাদের সম্মিলিত ফল = 4; পরের সূত্রে (দশকের ঘরে) সংখ্যাটা হচ্ছে 5 + 4 = 9; এইভাবে 1,294 লেখা হয়েছে। অনুরূপ ভাবে দ্বিতীয় এ্যাবাকাসে সংখ্যাটি হচ্ছে 125। তৃতীয় এ্যাবাকাসে যোগ করার সময় কীভাবে দশমিকের ঘরে 9 + 2 = 11 হওয়ায় নেমেছে 1 এবং হাতে আছে 1 তা লক্ষণীয়। মজা হচ্ছে 'শূন্য' এবং দশমিকের ব্যবহার না জানলেও ওরা চমৎকারভাবে যোগ করতে পারত। পাঠককে বোঝাবার জন্য আমরা এখানে তিনটি এ্যাবাকাস এঁকেছি। ওরা কিন্তু একটির সাহায্যেই এর চেয়ে বড় বড় অঙ্ক কষতে পারত।

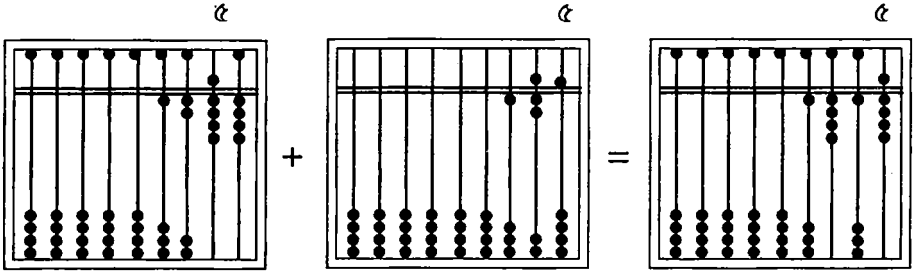

১২৪৪ + ১২ = ১৪১৪
১২৯৪ ১২৫ ১৪১৯

অভ্যাসে এ যন্ত্র দিয়ে অতি দ্রুতগতিতে যোগ বিয়োগ করা যায়। বস্তুত 1946 সালে একজন এ্যাবাকাস-পারদর্শী প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে প্রমাণ করেছিলেন, ঐ যন্ত্রে অঙ্ক কষতে ইলেকট্রনিক যোগযন্ত্রের চেয়ে তাঁর বেশি সময় লাগে না! (Guide to Science, Vol. II, p. 429, by I. Asimov)।

এর পরেই এল ঐ নতুন যুগ—'শূন্য' আবিষ্কার তথা দশমিক-পদ্ধতি, অর্থাৎ একক-দশক-শতক পদ্ধতিতে স্থান-মাহাত্ম্যে সংখ্যার মূল্য বৃদ্ধি।

সংখ্যাতত্ত্বে পরবর্তী উত্তরণ হচ্ছে বর্গের ব্যবহার।

1-এর পিঠে সাতটা শূন্য বসালে কোটি হয়। নূতন পদ্ধতিতে : 1কোটি = 1,00,00,000 না লিখে লেখা হল, 1কোটি = 10^7, দেখা গেল এতে অঙ্ক সংক্ষেপিত হচ্ছে। এক কোটিতে এক লক্ষ দিয়ে গুণ করতে ইতিপূর্বে লিখতে হত, 1,00,00,000 × 1,00,000 = 10,00,00,00,00,000। সেটা এখন সংক্ষেপে লেখা হচ্ছে ঐ বর্গটুকু যোগ করে। যথা, এক কোটি × এক লক্ষ = $10^7 \times 10^5 = 10^{7+5} = 10^{12}$। অনুরূপভাবে এক লক্ষকে একশ দিয়ে ভাগ করতে হলে ঐ বর্গের বিয়োগ করলেই চলছে। যথা, 10,000 ÷ 100 = $10^5 \div 10^2 = 10^3$। গুণ, ভাগ, বর্গীকরণ, বর্গমূল নির্ণয় প্রভৃতি সবই সহজ হয়ে গেল। কিন্তু সব সংখ্যা তো ঐভাবে দশের বর্গ হিসাবে লেখা যায় না। একশ'র পরিবর্তে লিখলাম 10^2, হাজারের বদলে 10^3, কিন্তু 111কে 'দশের বর্গ' দিয়ে কেমন করে প্রকাশ করব?

* * ঐ পথে চিন্তা করতে করতে স্কটল্যান্ডের একজন বিখ্যাত গণিতজ্ঞ সপ্তদশ শতাব্দীতে একটা নতুন আবিষ্কার করে বসলেন। তাঁর নাম জন নেপিয়ার। তিনি দেখলেন যেহেতু ঐ 111 সংখ্যাটি হাজারের চেয়ে ছোট এবং একশর চেয়ে বড়, এবং যেহেতু হাজারের প্রয়োজন হচ্ছে দশের বর্গ হিসাবে

3, আর শয়ের ক্ষেত্রে 2, তাই 111-কে দশের বর্গ হিসাবে প্রকাশ করতে হলে ঐ বর্গসংখ্যাটা হবে 3-এর চেয়ে ছোট এবং 2-এর চেয়ে বড়। তিনি হিসাব কষে দেখলেন সংখ্যাটা 2.04532; অর্থাৎ $111=10^{2.04532}$

তিনি অঙ্ক কষে দেখলেন—সব সংখ্যাকেই দশের বর্গরূপে প্রকাশ করা যাচ্ছে। যেমন $254=10^{2.40483}$; নেপিয়ার অতঃপর একটা লম্বা চার্ট তৈরি করলেন—প্রত্যেকটি সংখ্যাকে দশ-এর বর্গ হিসাবে প্রকাশ করে। এর ফলে সব জাতের অঙ্ক কষাই খুব সুবিধার হয়ে গেল। যথা

$$254 \times 111 = 10^{\bar{2}.04532} \times 10^{2.4-483} = 10^{4.45015} = 28 \cdot 194 \cdot$$

$$254 \div 111 = 10^{2.40483} \div 10^{.204532} = 10^{0.35951} = 2 \cdot 28838 \cdot \ *$$

ঐ তালিকাটিকে বলে 'লগেরেথিম'। এই 'লগেরেথিম' আবিষ্কার অঙ্কশাস্ত্রে একটা বিরাট উত্তরণ। অঙ্কশাস্ত্র এর মাধ্যমে আরও সহজ হয়ে গেল। এ থেকেই জন্ম নিল 'স্লাইড-রুল'। বাড়িতে বয়স্ক এঞ্জিনিয়ার থাকলে ঐ যন্ত্রটা নিশ্চয় দেখেছেন। ওর সাহায্যে 'লগেরেথিম' পদ্ধতিতে সহজে নানান অঙ্ক কষা যায়। বস্তুত হোমো-ইরেক্টাসকে যদি বলি মানব প্রজাতির (হোমো-স্যাপিয়ান্সের) আগের ধাপ, তাহলে স্লাইড-রুল যন্ত্রটা হচ্ছে ইলেক্ট্রনিক কম্পুটার বা রোবোর পূর্ববর্তী সোপান।

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে অঙ্ক কষার চেষ্টা প্রথম করেছিলেন একজন ফরাসী গাণিতিক পণ্ডিত—1642 খ্রীস্টাব্দে। তাঁর নাম প্যাস্কাল। কতকগুলি চাকা ও গিয়ারের সাহায্যে তিনি যোগ-বিয়োগ করতে পারলেন। তিনি প্রায় গোটা পঞ্চাশ ঐজাতীয় যন্ত্র তৈরি করেন, তার গোটা পাঁচেক এখনও কার্যকরী। তার একটি নমুনার সঙ্গে আপনাদের পরিচয় আছে—মটরগাড়ির মাইলোমিটার।

1674 সালে জার্মান-পণ্ডিত লিবনিৎজ ঐ যন্ত্রের আরও উন্নতি করে তাকে দিয়ে গুণ-ভাগ করতে শুরু করেন।

আরও প্রায় দেড়শ বছর পরে, 1840 সালে মার্কিন আবিষ্কারক পার্মালী যন্ত্রটাকে আরও উন্নত করে এমন ব্যবস্থা করলেন, যাতে আর যন্ত্রটাকে হাতে ঘোরাতে হয় না—বোতাম টিপে দিলেই সংখ্যাগুলি আপনা-আপনি সরতে থাকে। ঐ যন্ত্রের বংশাবতংশের সঙ্গেও আপনাদের পরিচয় আছে—বড় দোকানের ক্যাশ-কাউন্টারে তাকে দেখেছেন—যোগের যন্ত্র বা adding machine।

বিদ্যুতের সাহায্যে ঐজাতীয় স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ব্যবহার চালু হল বিংশ শতাব্দীতে। কিন্তু তার প্রসঙ্গে আসার পূর্বে গত শতাব্দীর এক ভাগ্যহীন প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিকের নাম স্মরণ করা প্রয়োজন। চার্লস ব্যাবেজ (1792–1871)।

ইংরাজ পণ্ডিত। অদ্ভুত প্রতিভা। তিনি এমন একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র তৈরি করার স্বপ্ন দেখলেন, যা আধুনিক ইলেকট্রনিক কম্পুটারের দোসর। ব্যাবেজ দীর্ঘ সাঁইত্রিশ বছর ধরে ঐ নিয়ে কাজ করেন; তাঁর জীবনের সমস্ত সঞ্চয় এবং প্রচুর সরকারি অর্থ ব্যয় করেও তিনি সাফল্যলাভ করতে পারেননি। অন্তিমে অসাফল্যের বোঝা নিয়ে এবং ঋণের বোঝা রেখে একদিন একলা চলার পথে যাত্রা করলেন।

ধুরন্ধর প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিকের একটি মাত্র ভুল হয়েছিল, যে ভুলের জন্য তিনি দায়ী নন। তিনি ভুল করে শতখানেক বছর আগে জন্মেছিলেন। বুদ্ধি অথবা প্রতিভা নয়, তাঁর সাফল্যের পথে ছিল দুটি মাত্র অন্তরায়। প্রথম—সে যুগে প্রযুক্তিবিদ্যা অত উন্নত ছিল না। দ্বিতীয়—কম্পুটার যন্ত্রের আগে আবিষ্কৃত হওয়ার প্রয়োজন আর একটা গাণিতিক সূত্র : "দ্বৈত-নিয়ম"!

এই দ্বৈত-নিয়ম বা 'বাইনারী সিস্টেম' নিঃসন্দেহে লগারেথিম আবিষ্কারের চেয়ে বড় জাতের উত্তরণ—প্রায় 'শূন্য' আবিষ্কারের সমপর্যায়ের একটা যুগান্তকারী ঘটনা। বস্তুত ঐ দ্বৈত নিয়মই হচ্ছে ইলেকট্রনিক কম্পুটার নামক গঙ্গার ভগীরথ। যদিও আপাতদৃষ্টিতে একটু খটমট তবু এটা আমরা বিস্তারিত আলোচনা করতে বাধ্য।

---

* এই অংশটি বিজ্ঞান-শিক্ষিত পাঠকের জন্য। নেহাত বুঝতে না পারলে অঙ্ক নিয়ে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করেছে এমন কারও সাহায্য নিলেই বুঝবেন।

দশমিক পদ্ধতিতে ছিল নয়টি সংখ্যা এবং শূন্য; তেমনি এই দ্বৈত-নিয়মে থাকল মাত্র দুটি সংখ্যা—'এক' এবং 'শূন্য'। মাত্র ঐ দুটি সংখ্যা দিয়েই নাকি যাবতীয় অঙ্ক কষা যাবে। 'লগারেথিমে' যেমন সব সংখ্যাকে দশ-এর বর্গ হিসাবে লিখেছিলাম, ঠিক সেভাবে এই 'দ্বৈত-নিয়মে' যাবতীয় সংখ্যাকে 2-এর বর্গ হিসাবে লেখা হল। কেমন করে? দেখুন :

$2^0 = 1$ [মেনে নিন, যে কোনও সংখ্যার বর্গ শূন্য হলে তার ফল হবে 'এক']

$2^1 = 2$; $2^1 + 2^0 = 3$; $2^2 = 4$; $2^2 + 2^0 = 5$; $2^2 + 2^1 = 6$ ইত্যাদি।

এই পদ্ধতিতেও দশমিক পদ্ধতির মতো স্থান-মাহাত্ম্যে দুইয়ের বর্গটি প্রকাশ করতে হবে। 102 লিখতে যেমন দশকের ঘরে শূন্য বসাতে হয় এখানেও তাই করতে হবে। দু-একটি উদাহরণ দেখুন—

$4 = (1\times2^2) + (0\times2^1) + (0\times2^0)$

$4 + 0 + 0$ লেখা হবে—100,

$8 = (1\times2^3) + (0\times2^2) + (0\times2^1) + (0\times2^0)$

$8 + 0 + 0 + 0$ লেখা হবে—1000।

ধরুন বড় একটা সংখ্যা 9,417, দশমিক পদ্ধতিতে এটা লেখার সূত্র হচ্ছে :

$(9\times10^3) + (4\times10^2) + (1\times10^1) + (7\times10^0) = 9000 + 400 + 10 + 7 = 9417$

দ্বৈত-নিয়মে যদি সংখ্যাটিকে প্রকাশ করতে হয়, তাহলে 'দশ'-এর বর্গ হিসাবে নয়, 'দুই'-এর বর্গ হিসাবে সংখ্যাটিকে লিখতে হবে। আমরা সেটা এভাবে লিখব

2^{13}	= 8192	[বাকি	থাকল	9417 –	8192 =	1225]
2^{10}	= 1024	[ঐ	ঐ	1225 –	1024 =	201]
2^7	= 128	[ঐ	ঐ	201 –	128 =	73]
2^6	= 64	[ঐ	ঐ	73 –	64 =	9]
2^3	= 8	[ঐ	ঐ	9 –	8 =	1]
2^0	= 1					

অর্থাৎ $2^{13} + 2^{10} + 2^7 + 2^6 + 2^3 + 2^0 = 9417$.

কিন্তু দশমিক পদ্ধতির মতো বর্গের প্রতি ঘর লিখতে হবে। ফলে $9417 = (1\times2^{13}) + (0\times2^{12}) + (0\times2^{11}) + (1\times2^{10}) + (0\times2^1) + \ldots + 0\times2^0) = 10010011001001$.

জানি, এবার কী বলতে চাইছেন। আপনি বলবেন, বাপু হে, কেরামতি তো খুব দেখালে, কিন্তু 9417 লিখতে প্রাচীন দশমিক পদ্ধতিতে আমাকে মাত্র চারটি সংখ্যা লিখতে হয়েছিল; কিন্তু তোমার এ নয়া আবিষ্কারে এখন লিখতে হচ্ছে চোদ্দোটি সংখ্যা। এতে লাভটা কী হল? ঝামেলা এবং পরিশ্রম দুই তো বাড়ল।

আমি জবাবে বলব, আজ্ঞে না। ঝামেলা কমেছে। আপনি দশমিক পদ্ধতিতে মাত্র চারটি সংখ্যা লিখেছিলেন বটে কিন্তু আপনাকে দশটি সংখ্যা শিখে তৈরি থাকতে হয়েছিল—এক থেকে নয় এবং শূন্য। আমার এ দ্বৈত-নিয়মে চোদ্দোটি সংখ্যা লিখলেও তাদের দুটি মাত্র জাত—'এক' এবং 'শূন্য'। তাতে লাভ? লাভ হচ্ছে এই যে, আমার কম্পুটার যেকোন সংখ্যা বলতে পারবে শুধু বাতি জ্বেলে এবং বাতি নিভিয়ে—এই-দুই-তিনের তোয়াক্কা না রেখে! কোনও সংখ্যা না ব্যবহার করে শুধুমাত্র বাতি জ্বেলে ও নিভিয়ে সে ঐ 9417 সংখ্যাটাকে এইভাবে প্রকাশ করতে পারে (কালো মানে শূন্য, সাদা মানে এক) :

	○	●	●	○	●	●	○	○	●	●	○	●	●	○
সঙ্কেত	১	০	০	১	০	০	১	১	০	০	১	০	০	১
মান	$২^{১৩}$	$২^{১২}$	$২^{১১}$	$২^{১০}$	$২^{৯}$	$২^{৮}$	$২^{৭}$	$২^{৬}$	$২^{৫}$	$২^{৪}$	$২^{৩}$	$২^{২}$	$২^{১}$	$২^{০}$
	+			+			+	+			+			+
অর্থ	৮১৯২	+		১০২৪	+	১২৮	+	৬৪		+	৮		+	১+
														= ৯৪১৭

আপনি হয়তো তা সত্ত্বেও বলবেন, তাতেই বা কোন চতুবর্গ লাভ হল?

এবার আমি বলব ঐ দ্বৈত-নিয়মে ইলেক্‌ট্রনিক কম্পুটার যাবতীয় অঙ্ক এত দ্রুতগতিতে কষতে পারে যা আমরা খাতা-কলমে, লগারেথিম পদ্ধতিতে বা স্লাইড-রুলের সাহায্যে পারি না। একটা বাস্তব উদাহরণ দিই, তাহলেই বুঝবেন :

ইলেকট্রনিক কম্পুটার আবিষ্কৃত হবার পূর্বে ইংরাজ গণিতজ্ঞ পণ্ডিত উইলিয়াম শ্যাঙ্কস π (অক্ষরটার উচ্চারণ 'পাই'—বৃত্তের পরিধি তার ব্যাসের যত গুণ)-এর মান নিখুঁতভাবে বার করবার চেষ্টা করেন। দীর্ঘ পনেরো বৎসর একাদিক্রমে অঙ্ক কষে গিয়ে তিনি দশমিক বিন্দুর পরে 707 স্থান পর্যন্ত তার মান নির্ণয় করেন। তাঁর শেষ দিকের প্রায় শতখানেক সংখ্যা ভুল হয়েছিল, বোধ করি নিছক ক্লান্তিতে। কয়েক বছর পূর্বে একটি ইলেকট্রনিক কম্পুটারকে ঐ অঙ্কটা কষতে দেওয়া হয়। মাত্র কয়েক দিনের ভেতর সে দশমিক বিন্দুর পরে দশ-হাজারতম স্থান পর্যন্ত নির্ভুল করে কষে দেয়।

মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসে কেনিয়ায়-প্রাপ্ত '1470-মানব' অথবা চীনে-প্রাপ্ত পিকিং ম্যানের মাথার খুলি যেমন এক একটি দিকচিহ্ন, তেমনি ইলেকট্রনিক কম্পুটারে বিবর্তনের প্রসঙ্গে স্মরণীয় নাম ENIAC এবং MANIAC.

ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer) বয়োজ্যেষ্ঠ। তার কথাই আগে বলি। পেনিসিল্‌ভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তার জন্ম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে। তার আমলে সে ছিল বৃহত্তম ইলেক্‌ট্রনিক কম্পুটার। ওজন ত্রিশ টন; মেঝের প্রায় দেড় হাজার বর্গফুট জুড়ে তার বপু! তার দেহে ছিল উনিশ হাজার ভ্যাকুয়াম টিউব। দশ-বারো বছরের ভেতরেই কম্পুটার ডিজাইনে এত উন্নতি হল যে, ঐ প্রকাণ্ড আদিম যন্ত্রটিকে 1957 সালে ভেঙে ফেলা হল।

যে বছর 'এনিয়াক'-এর মৃত্যু হল—আচ্ছা, না হয় আপনার কথামত সেটা ভেঙে ফেলা হয়—সে বছরই জন্ম নিল তার উত্তরসাধক ম্যানিয়াক (MANIAC – Mathematical Analyser Numerical Integretor And Computer)। তার জনক বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক ফন নিউম্যান—যিনি হাইড্রোজেন-বোমার অন্যতম আবিষ্কারক। বস্তুত ঐ 'ম্যানিয়াক' যন্ত্রটির সাহায্যে নানান অঙ্ক কষেই নিউম্যান হাইড্রোজেন বোমা তৈরির ফর্মূলা আবিষ্কার করেন। তার দেহে ছিল লক্ষাধিক সুইচ সার্কিট। 'ম্যানিয়াক' শব্দটার অর্থ ইংরাজিতে—'পাগল।' তাই তাঁর সহকর্মী বন্ধুরা নামটা পালটে রাখতে অনুরোধ করেন। নিউম্যানের শুভানুধ্যায়ীরা হয়তো ভয় পেয়েছিলেন, হাইড্রোজেন বোমা তৈরিতে হাত পাকিয়ে ঐ যন্ত্রটি দানবে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে। তাই নিউম্যান শেষ পর্যন্ত তাঁর যন্ত্রটার নাম বদলে তাঁর নিজের নামের সঙ্গে জড়িয়ে ওর নাম রেখেছিলেন জনিয়াক (JONIAC)।

মানুষের তৈরি যন্ত্রদানবে রূপান্তরিত হয়ে যাবার প্রসঙ্গ ওঠায় মনে পড়ল—একসময় বিজ্ঞানীরা সত্যই এ বিষয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। মেরী শেলীর উপন্যাস 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন' শুধু নয়, স্যামুয়েল বাটলারের Erewhon এবং বিশেষ করে শ্যাপেক কারেল-এর (Capek Karel) লেখা R. U. R. প্রভৃতি (Rossum's Universal Robot)। বস্তুত কারেলই ঐ 'রোবো' শব্দটার জনক। কিন্তু পরবর্তী যুগের বিজ্ঞানীরা বললেন, এ জাতীয় আশঙ্কা অমূলক। মার্কিন বৈজ্ঞানিক আইজাক আজিমভ (Isaac Asimov) এজন্য রোবটিক্স বিজ্ঞানের তিনটি মূল সূত্র রচনা করে মানুষকে নিরাপত্তা দেবার চেষ্টা করলেন। সে তিনটি সূত্রের কথা অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

আশঙ্কা হচ্ছে, এবার আপনি সম্পূর্ণ অন্যদিক থেকে আমাকে আক্রমণ করবেন। আপনি বলবেন, তুমি যা বললে তাতে না হয় স্বীকার করে নিচ্ছি যন্ত্রমানব মানুষের চেয়ে তাড়াতাড়ি এবং ভালভাবে অঙ্ক কষতে পারছে। কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রটা কি স্বাধীন চিন্তার এক্তিয়ারে সত্যই পড়ে? অঙ্ক মানব-সভ্যতার অনেকখানি, কিন্তু সবটা নয়। তোমার ঐ যন্ত্র কি ভেবে-চিন্তে কথাবার্তা চালাতে পারে? সাহিত্য রচনা করতে পারে? ইতিহাস ভূগোল জানে? দাবা খেলতে পারে? এসব প্রসঙ্গ এড়িয়ে তুমি তো শুধু অঙ্কের কথাই সাতকাহন করে বকে চলেছ! জবাবে আমি বলব, অঙ্কের কথা অত বিস্তারিত বললাম এজন্য যে, সাম্প্রতিক যন্ত্রমানব তার চিন্তাভাবনা কাজ-কর্ম সবকিছুই করে ঐ দ্বৈত নিয়মের মাধ্যমে। তার

জগৎ অঙ্কময়। এবার আপনার প্রশ্নের জবাবে জানাই—আজ্ঞে হ্যাঁ, সে ভেবেচিন্তে কথাবার্তা বলতে শিখেছে। মৌলিক রচনায় এখনও অভ্যস্ত না হলেও সে চমৎকার অনুবাদ করতে পারে—রাশিয়ান-ফরাসি-ইংরাজি-জার্মান ইত্যাদি ভাষান্তরে সে দক্ষ। ইতিহাস-ভূগোলে সে যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছে। দাবা খেলায় সে ওস্তাদ। একে একে বলি শুনুন :

ম্যাসাচুসেট্স্ ইন্সটিট্যুট অফ টেকনোলজির একটি কম্পুটার ভেবেচিন্তে কথাবার্তা চালানোতে দক্ষ হওয়ার পর তাকে একজন মনস্তত্ত্ববিদ ডাক্তার সাজিয়ে এক বিচিত্র পরীক্ষা করা হয়েছিল। ডাক্তারবাবু পর্দার ওপাশে বসে আছেন একথা মনে করে রোগীরা তাদের উপসর্গের কথা বলতে থাকে। পরে পরীক্ষা করে দেখা গেছে অধিকাংশ ব্যক্তিই সন্দেহ করেনি—পর্দার ওপাশে যিনি বসেছিলেন তিনি সাইকিয়াট্রিস্ট নন, যন্ত্রমানব। একটি কথোপকথনের নমুনা শোনাই :

রোবো : নমস্কার। আমিই ডাক্তারবাবু। দয়া করে বসুন এবং বলুন কী আপনার উপসর্গ।

মানুষ : আমি আসবার সময় আমার 'লাগেজটা' হারিয়ে ফেলেছি।

রোবো : লাগেজ! মানে বলতে চান আপনার মালপত্র?

মানুষ : হ্যাঁ। ফলে বড় অসহায় বোধ করছি।

রোবো : আপনি কি প্রায়ই জিনিস হারান এবং এভাবে অসহায় বোধ করেন?

মানুষ : না। তা ঠিক নয়।

রোবো : মানে? কেন নয়?

মানুষ : কারণ সাধারণত আমি এভাবে জিনিসপত্র হারাই না।

রোবো : আর কী কারণ থাকতে পারে?

মানুষ : আমার মা ছেলেবেলাতেই শিখিয়েছিলেন জিনিসপত্রের যত্ন নিতে।

রোবো : আপনার মায়ের কথা বিস্তারিত বলুন, পরিবারের কথা—

মনে রাখা দরকার এ ক্ষেত্রে রোবো গ্রামোফোন রেডিয়ো টেপ-রেকর্ডার ইত্যাদির মতো পূর্বনির্ধারিত শব্দ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বাতাসে ছেড়ে দেয়নি। পর্দার এপাশে মানুষটি যে প্রশ্ন করেছে তা সে শুনেছে, বুঝেছে এবং জবাব দিয়েছে। সবই ঐ অঙ্কশাস্ত্রের দ্বৈত-নিয়মে। এখন কী বলবেন? সে চিন্তাশক্তির অধিকারী, না নয়?

একদল যন্ত্রমানব অনুবাদে দক্ষ হয়েছে। তাদের অসংখ্য বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকা ও সদ্যপ্রকাশিত বই দেওয়া হয়। তারা ঐ রচনা পড়ে, অনুধাবন করে তার সারাংশ স্মরণে রাখে—ভুষিমাল ত্যাগ করে। প্রয়োজনীয় অংশ ইনডেক্স কার্ড অনুযায়ী সাজিয়ে রাখে, যাতে প্রশ্ন করলেই জানাতে পারে।

ইতিহাস-ভূগোলের কথা তুলেছিলেন। আমি—এই গ্রন্থের লেখক আমি, একটি ইতিহাস-পণ্ডিত ইলেকট্রনিক কম্পুটারকে স্বচক্ষে দেখেছিলাম জাপানে—এক্সপো 70 দেখতে গিয়ে। তার কথা অন্যত্র বিস্তারিত বলেছি। ইতিহাসের যাবতীয় প্রশ্নের জবাব তার ঠোঁটস্থ। স্বকর্ণে শুনেছিলাম, একজন ইংরাজ ট্যুরিস্ট যন্ত্রটাকে প্রশ্ন করলেন, "1941 সালের 27 মে বেলা দশটা চল্লিশ মিনিটে সারা পৃথিবীতে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা কী ঘটেছিল?" যন্ত্রটা তৎক্ষণাৎ জবাবে বলেছিল, "ইংল্যান্ড উপকূলের আটশ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে কিং জর্জ-দ্য ফিফথ্ যুদ্ধ-জাহাজের আক্রমণে বিখ্যাত জার্মান যুদ্ধ-জাহাজ 'বিসমার্ক' নিমজ্জিত হয়।"

দাবা খেলা? একাধিক কম্পুটার দাবা খেলায় অত্যন্ত পারদর্শী হয়ে উঠেছে। আদ্রিয়ান বেরী লিখছেন, 'তাদের মধ্যে অনেকেই আজ গুরু-মারা-চেলা; অর্থাৎ যে দাবারু দ্বৈত-নিয়মের মাধ্যমে রোবোকে খেলাটা আদিযুগে শিখিয়েছিলেন তিনি এখন তাঁর শিষ্যের কাছে ক্রমাগত মাৎ হয়ে যাচ্ছেন।'

স্বীকার করব—রোবোরা এখনো মৌলিক চিত্র আঁকেনি, কবিতা লেখেনি, সিম্ফনি রচনা করেনি। তবু বলব—তারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারছে। পারছে না—নতুন রোবো পয়দা করতে।

আপনি আমাকে পাগল ভাবতে পারেন, কিন্তু আমার কী মনে হয় জানেন? আমার ধারণা—ওভাবে মানুষের হুকুমে কোনো রোবো আর একটি রোবো পয়দা করতে পারবে না। এ যেন কিছু জৈব রাসায়নিক মালমশলা দিয়ে স্ত্রীকে অনুরোধ করা—'এবার একটা মানুষের বাচ্চা বানাও।'

যত বড় জীববিজ্ঞানীই হন—মহিলা ল্যাবরেটরিতে গিয়ে সেটা বানাতে পারবেন না, যদিও অতি সহজেই পারবেন নিজ জঠরে। ঠিক তেমনি রোবোও একদিন বিবর্তনের তাগিদে নিজে থেকেই বংশবৃদ্ধি করতে পারবে; যেভাবে জল থেকে একদিন জীব ডাঙায় উঠে নিশ্বাস নিতে শিখেছিল, পাখি হয়ে আকশে উড়তে শিখেছিল, মানুষ হয়ে দু-পায়ে দাঁড়াতে শিখেছিল। নিজের চেষ্টায়, বিবর্তনবাদের তাগিদে।

তা যদি হয়, তাহলে ইতিপূর্বে যে-কথা বলেছি তা আমি প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। ইতিপূর্বে বলেছিলাম, রোবো কোনদিন মানুষকে ছাপিয়ে যাবে না, তার ক্ষতি করবে না। সেটা সত্য হতেও পারে। ভেবে দেখুন, এই হচ্ছে বিবর্তনবাদের মূল কথা! প্যালিওজোয়িক যুগের শেষ পর্যায়ে—আজ থেকে চল্লিশ কোটি বছর আগে, সমুদ্রচর প্রাণী তাদের বংশধরদের একটি শাখাকে পাঠিয়েছিল ডাঙায়—সেই শাখা থেকে জন্ম নিল মানুষ। যারা ডাঙায় এল না তারা হল তিমি-ডলফিন-ডুগঙ। মানুষ আজ তাদের হত্যা করে, শিকার করে! আবার ধরুন, আজ থেকে দেড়-দু কোটি বছর আগে এক জাতের প্রায়-বানর 'রামাপিথেকাস' তাদের একটি বংশকে মানুষ হওয়ার পথে ঠেলে দিয়েছিল—তা থেকেই জন্ম নিল হোমোস্যাপিয়ন্স, যাদের বংশধর বাঁদরদের আজ খাঁচায় বন্দি করে, নাচায়। অবাক হব না, যদি ঐভাবে মানুষের তৈরি রোবো একদিন মানুষকে ছাপিয়ে যায়। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখবেন এতে দুঃখ করার কিছু নেই। যে কোনো মূল্যে মানব-সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখাই আমাদের চরম লক্ষ্য হতে পারে না—তার একটিমাত্র ব্যতিক্রম আছে। যে ব্যতিক্রম হচ্ছে, যদি মানুষের বদলে আমরা মানবোত্তর কোনো জীবকে বিবর্তনের পথে এই দুনিয়ার অধিকার দিয়ে ইতিহাসের মহানেপথ্যে ডাইনোসরের মতো সরে যেতে পারি!

তাই আইজাক আজিমভ বললেন : What achievement could be grander than the creation of an object that surpasses the creator ? How could we consummate the victory of intelligence over Nature more gloriously than by passing on our heritage, in triumph, to a greater intelligence—of our own making? [স্রষ্টার অপেক্ষা মহান কিছু সৃষ্টি করার চেয়ে বড় সাফল্য আর কী হতে পারে? প্রকৃতির ওপর বুদ্ধিমত্তার জয়কেতন ওড়াবার এই তো সব চেয়ে ভাল উপায়—সগৌরবে আমরা পৃথিবী থেকে বিদায় নেব, মাথা সোজা রেখে, আমাদের ঐতিহ্যের পতাকা হস্তান্তরিত করে যাব উন্নতবুদ্ধির উত্তরসূরিকে—যারা আমাদেরই সৃষ্টি।]

চণ্ডীদাসের উক্তি—"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই" এ বিষয়ে শেষ কথা হতে পারে না! বোধ করি তার চেয়ে বড় সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন জার্মান দার্শনিক নীৎজে। যিনি বলেছিলেন, "মানুষ একটি রজ্জু—জানোয়ার থেকে অতিমানবে উত্তরণের একটি যোগসূত্র—পা ফসকালেই অতলস্পর্শী গভীর খাদ!"

সাত

ডক্টর ব্রয়েড তাঁর মানসিক চিকিৎসালয়টা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন। উন্মাদাগারটা শহরের একান্তে—এটাও একটা আধভাঙা বাড়ি। ওঁর চিকিৎসালয়ের তিনটি অংশ; কেন্দ্রীয় অংশে জীবনবিজ্ঞানী, যন্ত্রবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানী গামা-পণ্ডিতদের গবেষণাগার, অফিস, গ্রন্থাগার প্রভৃতি। বাকি দুটি অংশের একটি 'হোমো-সাইকোলজি', একটি 'মেকানো-সাইকোলজি'। প্রথম বিভাগে আছে কিছু প্রায়-জন্তু মানব-মানবী। বায়োলজিক্যাল বোমায় যাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রজনন ক্ষমতা লোপ পেয়েছে, এমন কয়েকটি মানুষকে নিয়ে ডক্টর ব্রয়েড গবেষণা করছেন—তাদের চিন্তাশক্তি, বোধশক্তি, এবং প্রজনন-ক্ষমতা ফিরিয়ে আনা যায় কিনা। চিকিৎসার কিছু কিছু সুফল ফলতে শুরু করেছে। তারা যেন প্রথম যুগের রোবো—চিন্তা করতে পারে না, কথা বলতে পারে না, শুধু সুইচ টিপে দিলে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চলতে পারে। সে সুইচ ওদের দেহকোষের DNA! তবু ডক্টর ব্রয়েডের বিশ্বাস—ওরা কিছুদিনের মধ্যেই কথা বলবে, কথা বুঝবে। দ্বিতীয় বিভাগে আছেন কিছু বীটা-মহিলা এবং নানান

জাতের পুরুষ রোবো। গামা বিজ্ঞানীরা এ নিয়েও গবেষণা করছেন। রোবোসাইকোলজি অনেকটা উন্নত হয়েছে। যন্ত্রমানব যদি কাব্য রচনা করতে পারে, গান বাঁধতে পারে, ছবি আঁকতে পারে, তাহলে নতুন রোবোকে জন্ম দিতেই পারবে না কেন? গত শতাব্দীতেই সত্তরের দশকে রোবোরা ছিল self-repairing, নিজেদের যান্ত্রিক ত্রুটি-বিচ্যুতি তারা নিজেরাই সারিয়ে নিত। বাইরের, বিশেষ করে মানুষের, সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন হত না। ক্রমে তারা হয়েছিল self-thinking, চিন্তাশক্তিতে স্বয়ম্ভর—অর্থাৎ মানুষ আর বোতাম টিপে তাদের পরিচালিত করে না। যে কাজ, যে চিন্তা, যে মনন শুভঙ্করী মঙ্গলদায়ক—অনিবার্যভাবে তারা তাই করে, তাই ভাবে। এখন বাকি আছে 'রোবটিক্স' বিজ্ঞানের শেষ ধাপ—self-generating হওয়া। প্রজনন-ক্ষমতা। এখন আর মানুষ-বিজ্ঞানী তা নিয়ে গবেষণা করছেন না। রোবো-বিজ্ঞানীরা নিজেরাই সে বিষয়ে উঠে পড়ে লেগেছেন।

উন্মাদাগার পরিদর্শন শেষ করে ডক্টর ব্রয়েড ওদের তিনজনকে নিজের অফিসে নিয়ে এসে বসালেন। বললেন, ডক্টর রয়, ডক্টর ওয়াম্বাসী, আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে আপনারা এসেছেন—

প্রফেসর আইনস্টোন বাধা দিয়ে বলেন, কী বকছেন ডক্টর! পাগলদের চিকিৎসা করতে করতে আপনি নিজেই কি পাগল হয়ে গেলেন? ওঁরা এসেছেন, সেজন্য আপনি দুঃখিত?

ডক্টর ব্রয়েড তাঁর ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি নেড়ে বলে ওঠেন, ঐ আপনার দোষ মশাই। কথাটা আমার শেষ করতে দিন। আমি বলতে চাইছি—ওঁরা চারদিন হল এসেছেন, অথচ আমি গিয়ে আলাপ করতে পারিনি, কাজের চাপে। এতে দুঃখ প্রকাশ করাটা পাগলামি হল? এ যদি আপনার সৌজন্যবোধে পাগলামি হয় তাহলে আপনাকেই আমার উন্মাদাগারে ভর্তি করে নিতে হবে।

বব্ বললে, আপনি শেষ যখন ডরোথিকে দেখেন, তখন সে কি বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গিয়েছে?

: হ্যাঁ। একেবারে চিকিৎসার বাইরে।

: আর্থার ক্রুক্‌স্‌কে আপনি শেষ কবে দেখেছেন?

: গতকাল।

ওরা দুজনেই শুধু নন্, প্রফেসর আইনস্টোন পর্যন্ত আঁৎকে ওঠেন : গতকাল! কোথায়? আপনি কি ভূগর্ভে গিয়েছিলেন?

ডক্টর ব্রয়েড বলেন, না, আমি যাইনি। ক্রুক্‌সই এসেছিল। কদিন খাওয়া-দাওয়ার অত্যাচার করে পেট খারাপ করেছিল। ওষুধ নিয়ে গেল!

বব্ রীতিমত আহত হয়ে বলে, আপনি দিলেন?

: দেব না? ও যে রুগী। আমি ডাক্তার।

: কিন্তু ও লোকটা যে খুনী!—প্রতিবাদ করে বব্।

: সো হোয়াট? সেজন্য মহামহিম সম্রাট আছেন, তাঁর আদালত আছে, তাঁর মিথ্যাবাদী পাজি বদমায়েশ অনুচর ব্যাটলার আছে! আমার চোখে সে রুগী!

ওয়াম্বাসী বলে, বব্ তুই রাগ করিস না। ডক্টর ব্রয়েড যা বলছেন, তা যুক্তিপূর্ণ।

: তার মানে তুইও চাস্ লোকটার চিকিৎসা হোক, সুস্থ বহাল তবিয়তে সে বসে বসে মদ্যপান করুক?

ওয়াম্বাসী বলে, না, আমি তা চাই না। তাকে হত্যা করতেই চাই। ডক্টর ব্রয়েডও তাই চান; কিন্তু চিকিৎসক হিসাবে ডক্টর ব্রয়েড তাই বলে তো তার হাতে ওষুধের বদলে মারকিউরিক ক্লোরাইড তুলে দিতে পারেন না!

ডক্টর ব্রয়েড বলেন, ডক্টর ওয়াম্বাসী, আপনার কথাটা ঠিক হয়নি। চিকিৎসক হিসাবে শুধু নয়, আমি কোনও হিসাবেই তার মৃত্যুকামনা করি না! যদিচ সে ওখানে বসে বসে মদ্যপান করুক তাও আমি চাই না।

বব্ রীতিমত আহত কণ্ঠে বলে, সেই জঘন্য খুনেটার প্রতি আপনি এত সদয় হচ্ছেন কেন তা জানতে পারি ডক্টর ব্রয়েড?

: লোকটাকে বাঁচিয়ে রাখা নিতান্ত প্রয়োজন—আমার এবং আমার বড়দার যুক্তিতে।

ওয়াম্বাসী বলে, আপনার বড়দা? তাঁকে তো ঠিক—

আইনস্টোন বলে ওঠেন, ওঁর নিজের বড় ভাই নয়, তবে ডঃ ব্রয়েড সেই বৃদ্ধকে ঐ রকমই শ্রদ্ধা করেন। আপনাদের সঙ্গে এখনও আলাপ হয়নি; উনি জীববিজ্ঞানী গার্লস গারউইনের কথা বলছেন।

: গার্লস গারউইন! জীববিজ্ঞানী! নেভার হার্ড অব্ হিম্—অমন নাম জীবনে শুনিনি!—বলে বব্।

ঠিক তখনই পর্দা সরিয়ে ঘরে প্রবেশ করেন একজন বৃদ্ধ। শ্মশ্রুর মানদণ্ডে তিনি নিশ্চয় ফ্রেঞ্চকাট দাড়ির মালিক ডক্টর ব্রয়েডের অগ্রজ—আগন্তুক বৃদ্ধের দাড়ি—যাকে বলে রীতিমতো বব্‌ভো! আগন্তুককে দেখেই ডক্টর ব্রয়েড এবং প্রফেসর আইনস্টোন আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল। অতিবৃদ্ধ গামা পণ্ডিতটি ইজিচেয়ারে লম্বমান হবার অবকাশে বব্‌কে বলেন, মহাশয় কি লন্ডন টেলিগ্রাফের, না ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানের?

ডক্টর ব্রয়েড বলেন, না বড়দা, উনি সাংবাদিক নন।

: অ! আমার নামই শোনেননি বললেন কি না। খবরের কাগজের সাংবাদিক ছাড়া আর সব লোক মোটামুটি আমার নামটা জানে!

ওয়াম্বাসীর মনে হচ্ছিল বৃদ্ধ খুবই পরিচিত; কিন্তু ঠিক চিনতে পারছিল না।

আইনস্টোন তার কানে কানে বলে, চিনতে পারছেন না? উনি গার্লস গারউইন। পণ্ডিতাগ্রগণ্য জীববিজ্ঞানী! মানে....

বৃদ্ধ বললেন, তা কী নিয়ে আলোচনাটা হচ্ছিল? আমার মতো অখ্যাত লোকের প্রসঙ্গটাই বা উঠে পড়ল কেন?

ডক্টর ব্রয়েড কুণ্ঠিত হয়ে বলেন, না, মানে আমি বলছিলাম—আর্থার নামে ঐ নিগ্রোটাকে মেরে ফেলা উচিত হবে না।

ঃ দ্যাটস্ রাইট। আমি একমত। ওকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে!

বব্ রুখে ওঠে, কারণটা জানতে পারি স্যার?

ঃ পারেন। আশমান ফুঁড়ে আপনারা দুজন আবির্ভূত হবার পূর্বে ঐ একটিমাত্র সুস্থ-মস্তিষ্কের হোমোস্যোপিয়ান্-স্যাপিয়ান্স অবশিষ্ট ছিল দুনিয়ায়। বিজ্ঞানের প্রয়োজনে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবেই!

বব্ বললে, এখন তো আমরা দুজন এসেছি!

ঃ কৃতার্থ করেছেন! আরও কৃতার্থ হতাম যদি দুজনেই XY হোমোস্যাপিয়ন্স-স্যাপিয়ন্স না হয়ে অন্তত একটি XX জাতের হতেন।

বব্ বলে ঃ বুঝলাম না!

ঃ তা কেন বুঝবেন? 'ক্রমোসম্' শব্দটা শুনেছেন? নাকি তাও 'নেভার হার্ড অব্ ইট'? সোজা ভাষায় বলছি, আরও কৃতার্থ হতাম যদি একজোড়া হুলো না হয়ে একটি মদ্দা ও একটি মাদি হিসাবে আসতেন। সেক্ষেত্রে species-টাকে বাঁচিয়ে রাখা সহজ হত।

এতক্ষণে ঐ গার্লস গারউইনকে চিনতে পারে ওয়াম্বাসী। তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। উঠে দাঁড়িয়ে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন করে বৃদ্ধকে!

ব্রয়েড বললেন, ডক্টর ওয়াম্বাসী! ওঁকে এইমাত্র চিনতে পারলেন, নয়? ঐ species শব্দটা থেকে?

ওয়াম্বাসী হেসে বলে, ঠিক ধরেছেন।

ডক্টর ব্রয়েড বৃদ্ধের দিকে ফিরে বললেন, দেখলেন স্যার? এক নম্বর প্রমাণ। Association of Ideas ! Species শব্দটা শুনেই ওঁর মনে পড়ে গেল 'অরিজিন অফ্ স্পেসিস'! আমার থিয়োরিটা—

বাধা দিয়ে বৃদ্ধ বলেন, তোমার থিয়োরি আমি তো মেনেই নিয়েছি ব্রয়েড। তুমি একটা জিনিয়াস। তোমার Studien Uber Hysteric ছাপা হল 1895 সালে। Masterpiece ! তার বছর তেরো আগেই যে আমি ফৌত হয়ে গেছি—না হলে সবার আগে আমিই তোমাকে অভিনন্দন জানাতাম। এসব বোঝাও ঐ ছোকরা সাংবাদিকদের। যারা Origin of Species কিংবা ক্রমোসমস্-এর নাম

শোনেনি, যারা ডিটেক্‌টিভ নভেলে psychoanalysis শব্দটা পেলে ডিক্সনারি ওল্টায় মানে বুঝে নিতে।

প্রফেসর আইনস্টোন বলেন, এক্সকিউজ মি স্যার, ডক্টর বব্ রয় সাংবাদিক নন, উনি ডক্‌টরেট অব কসমোলজি। মহাপণ্ডিত।

: ডক্‌টরেট অব কী লজি?

: আজ্ঞে কসমোলজি—মহাকাশবিজ্ঞান!

: নেভার হার্ড অব্ ইট! তা উনি ডক্টর অফ্ ফালতুবাজি না হয়ে যদি মাদি হোমোস্যাপিয়ন্স হতেন, আমি আরও খুশি হতাম। কী বল ব্রয়েড? সেক্ষেত্রে কালো-সাদা ক্রস্-ব্রিডে—

বব্ বিরক্ত হয়ে বলে, ওসব ছেঁদো কথা ছেড়ে সোজাসুজি বলুন মশাই—আমি সেই নিগারটাকে গুলি করে মারতে চাই। আপনারা কি আমাকে সাহায্য করবেন?

ডক্টর ব্রয়েড বলেন, নিশ্চয় সাহায্য করব না। হোমোস্যাপিয়ান্-স্যাপিয়ান্সের একটা নিখুঁত স্পেসিমেন—

বৃদ্ধ গারউইন আর এক ধাপ চড়িয়ে বলেন, বরং পারলে বাধা দেব! একটা এক্সটিংক্ট হতে বসা দুর্লভ স্পেসিস্! মানে, জীববিজ্ঞানের স্বার্থে—

ববের আর সহ্য হয় না। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ভেংচে ওঠে, এঁঃ! ভারী পণ্ডিত এসেছেন সব! চুলোয় যাক আপনাদের জীববিজ্ঞান।

প্রফেসর আইনস্টোন বজ্রাহত! ডক্টর ব্রয়েডের মুখটা লাল হয়ে ওঠে। অত বড় পণ্ডিতকে এভাবে অপমান করায় তিনি মর্মাহত। বৃদ্ধ কিন্তু আদৌ রুষ্ট হন না। এক গাল হাসলেন বলেই তাঁর ঐ দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল ভেদ করে একচিলতে হাস্যরেখা প্রকাশ পেল। ডক্টর ব্রয়েডের দিকে ফিরে বললেন, দেখলে? এক নম্বর প্রমাণ! মনে আছে? আমার সেই 1873 সালে প্রকাশিত "The Expressions of the Emotions in Man and Animal"? ঐ সাংবাদিক ছোকরা এমনভাবে 'এ্যাঁঃ' করে উঠ্‌লে যেন ঠিক মনে হল, কেউ কুকুরের ঠ্যাঙ মাড়িয়ে দিয়েছে, অথবা শিম্পাঞ্জির পেটে ছাতির খোঁচা মেরেছে। প্লীজ্ ভাই—আবার একবার ঐ রকম 'এ্যাঁহ্' করে শব্দ কর তো?

বব্ দুম্‌দাম্ করে পা ফেলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। উন্মাদ! বদ্ধ উন্মাদ সব।

বব্ নিষ্ক্রান্ত হতেই বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, ডক্টর, ওয়াম্বাসী, একটু এগিয়ে এসে বসুন—কাজের কথা আছে।

ওয়াম্বাসী অবাক হয়ে বলে, আপনি স্যার আমার নাম জানেন?

: জানি। আমি সব জানি। বস্তুত আপনার সঙ্গে কিছু গোপন আলোচনা করব বলে আমিই আপনাকে এখানে আনতে বলেছিলাম। প্রফেসর আইনস্টোন সৌজন্যবোধে আপনাদের দুজনকেই এনে হাজির করেছেন। একটি হুলোকে তাই কায়দা করে তাড়ালাম।

ওয়াম্বাসী বললে, তাহলে স্যার, আপনি আমাকে 'তুমি'ই বলবেন।

: বলব। আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড়—'তুমি' বলতে পারি। না, ডক্টর ওয়াম্বাসী, আমি তোমার চেয়ে দু-আড়াইশ বছরের বড় নই। তবু গডফাদারের কারখানায় আমার যখন সৃষ্টি হয় তখনও তুমি জন্মাওনি।

ওয়াম্বাসী বলে, আমরা দুজন যে সাংবাদিক নই—

: হ্যাঁ রে বাপু, হ্যাঁ। তুমি কি মনে কর 'কসমোলজি' শব্দটার অর্থ জানি না আমি? একটু অভিনয় করতে হল আর কি—যাতে তোমার ঐ হুলো বন্ধুটি স্থানত্যাগ করে। মাদি হলে অবশ্য তোমার সঙ্গে ক্রস্‌ব্রিডে—

ডক্টর ব্রয়েড বলেন, এবার স্যার কাজের কথায় আসা যাক।

: হ্যাঁ। কাজের কথা। আমরা তোমার সাহায্যপ্রার্থী—

ওয়াম্বাসী বাধা দিয়ে বলে, সে কথা প্রফেসর আইনস্টোন আমাকে আগেই বলেছেন।

: না। ইতিপূর্বে প্রফেসর আইনস্টোন তোমাকে যে অনুরোধ করেছেন, তা তিনি করেছেন সর্বাধিনায়কের আদেশে। আমরা ঠিক বিপরীত অনুরোধটাই পেশ করছি।

ওয়াম্বাসী বিহ্বল হয়ে বলে, ঠিক বুঝলাম না।

: কনফ্লিক্ট অব্ আইডিয়াজ এ্যান্ড আইডিয়াল্স্। মতবিরোধ! দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। দাঁড়াও, বুঝিয়ে বলি। সম্রাট লেকজান্ডার চাইছেন আর্থারকে হত্যা করতে—রাষ্ট্রশাসনের প্রয়োজনে, বিশ্বশান্তির উদ্দেশ্যে। আমরা আর্থারকে বাঁচাতে চাইছি—বিজ্ঞানের মুখ চেয়ে, দর্শনের মুখ চেয়ে।

ওয়াম্বাসী বলে, বিজ্ঞান বুঝলাম—দর্শনটা কেন?

: পাপকেই উচ্ছেদ করতে হয়, পাপীকে সংশোধন করতে হয়। ডক্টর ব্রয়েডের মতে আর্থার যে খুন করেছিল তা ক্ষণিক উন্মাদনার বশে। ঘটনাচক্রই তার মনোবিকলনের মূল উপাদান। তাকে হত্যা করা কোনো সমাধান নয়, তাকে আবার স্বাভাবিক মানুষে রূপান্তরিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। ভেবে দেখ, লোকটাকে সবাই মিলে কীভাবে প্ররোচিত করেছিল। তার এক নম্বর অপরাধ—সে কালো, নিগ্রো। দু নম্বর অপরাধ—সে স্বাভাবিক যৌন ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে চেয়েছিল। তিন নম্বর অপরাধ—সে বুঝতে পারেনি মিসেস্ কলিন্স তাকে নিয়ে খেলা করছিল। তাই নয়?

: তাহলে কি ধরে নেব, লেকজান্ডা দি গ্রেটের পেছনে আপনারা ষড়যন্ত্র করছেন?

: ব্যাপারটা যদি ঐ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখ, তবে তাই। জিনিসটা নতুন নয়, অটো হান, উইজেকার, হাইজেনবুর্গরাও এমন ষড়যন্ত্র করেছিল হিটলারের আমলে। গোড়ায় গলদ কে করেছে জান? ঐ গডফাদার নামে বিকৃত মস্তিষ্কের লোকটা। সে আমাদের, মানে গামাদের, দিল বুদ্ধিবৃত্তি আর আল্ফাদের দিল ক্ষমতা। আমরা আল্ফাদের ক্ষমতা দখল করতে চাই না আদৌ; কিন্তু আমাদের পথে, বিজ্ঞানের পথে, সাহিত্য-শিল্প-দর্শনের পথে বাধাসৃষ্টি করতেও ওদের দেব না।

: আপনারা মোদ্দা কী করতে চান আগে শুনি!

: আমরা চাই পৃথিবীকে আবার সজীব স্বাভাবিক করে তুলতে। গাছ-মাছ-কীট-পতঙ্গ-জন্তু-পাখি-মানুষ-রোবো। ফুলে-ফলে পৃথিবীকে সুন্দর করে তুলতে। আমাদের পরিকল্পনাটা শোন—

বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক স্থির করেছেন, একটি জাহাজে তিনি পৃথিবী পরিক্রমায় বার হবেন। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর একটিও বিমান অথবা সমুদ্রগামী জাহাজ রক্ষা পায়নি। একটি মাত্র হেলিকপ্টার রক্ষা পেয়েছিল। সেটাকেই ওঁরা ব্যবহার করেন। গার্লস গারউইন তাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—একটা পালতোলা জাহাজে আবার যাত্রা করবেন তাঁর পূর্বসূরীর সেই চিহ্নিত পথরেখা ধরে—কেপ ভার্ডি দ্বীপপুঞ্জ, ব্রেজিল, মন্টিভিডিও, বুয়নেস্ এয়ার্স, চিলি, তাহিতি, নিউজিল্যান্ড হয়ে তাসমানিয়া পর্যন্ত। আবার নতুন করে সংগ্রহ করবেন নানান জাতের উদ্ভিদ, কীট, পতঙ্গ, পশু-পক্ষীর নমুনা। কথা বলতে বলতে বৃদ্ধের চোখদুটি ছলছল করে ওঠে। বললেন, যাঁর পদচিহ্নরেখা ধরে আমি ঘুরব, তিনিও পালতোলা জাহাজে একইভাবে ঐ জনমানবহীন রাজ্য পরিক্রমা করেছিলেন বিজ্ঞানের মুখ চেয়ে; তফাৎ এই—তিনি ফিরে এসে লিখেছিলেন—Origin of Species—'জীবপ্রজাতির আদিম আবির্ভাব'; আর আমি লিখব—Annihilation of Species—'জীবপ্রজাতির অন্তিম তিরোভাব'!—টপ্‌টপ্ করে দু-ফোঁটা জল ঝরে পড়ল বৃদ্ধ জীববিজ্ঞানী গামা-পণ্ডিতের কোটরগত চক্ষু থেকে।

ডক্টর ব্রয়েড তাঁর বলিরেখাঙ্কিত হাতটা তুলে নিয়ে তার ওপর হাত বুলোতে বুলোতে বলেন, স্যার আপনি স্থির হোন। আপনি তো জানেন—জীবপ্রজাতি পৃথিবী থেকে মুছে যায়নি। ইতিমধ্যেই আমরা কয়েক হাজার প্রজাতি সংগ্রহ করেছি। তাদের জোড়ায়-জোড়ায় রেখেছি আমাদের 'নোয়াজ আর্ক'-এ। আপনি নিজের চোখেই দেখেছেন—কত জাতের প্রজাপতি, ফড়িং, কীট-পতঙ্গ, জন্তু, পাখি নতুন ডিম পেড়েছে, বাচ্চা পেড়েছে—সংখ্যায় বাড়ছে।

বাঁ হাতের চেটোয় চোখটা মুছে নিয়ে বৃদ্ধ বললেন, কিন্তু বিবর্তনের শেষ সোপানে যে পৌঁছেছিল, সেই বুদ্ধিমান মানুষের কী হবে ব্রয়েড?

: হবে স্যার, হবে। আমরা তিন-চারটি বিকল্প পথে অগ্রসর হচ্ছি। একটা না একটায় সুফল পাবই। বিজ্ঞানের ইতিহাস তাই আমাদের শিখিয়েছে স্যার।

সে প্রকল্পটাও ওঁরা বুঝিয়ে বলেন। তিন-চার জাতের পরীক্ষা করছেন ওঁরা। কোনটি কতদূর সাফল্যলাভ করেছে তা সবিস্তারে জানান। প্রথম পরীক্ষা—Homo-Sapiens Reproducing Project, অর্থাৎ 'মানব-প্রজনন প্রকল্প', ডক্টর ব্রয়েডের নেতৃত্বে সেই গবেষণা চলেছে। বায়োলজিক্যাল বোমায় যারা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে পড়েছে তাদের মানসিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় ডক্টর ব্রয়েড দিবারাত্র নিরলস পরিশ্রম করছেন। ডক্টর ব্রয়েড বলেন, মুশকিল কী হয়েছে জানেন ডক্টর ওয়াম্বাসী, ঐ মানুষ জন্তুগুলো চিন্তাশক্তির পারম্পর্য এবং প্রজনন ক্ষমতাই শুধু হারায়নি—যৌনবোধও হারিয়ে বসে আছে! হোমো-স্যাপিয়ান্স আবির্ভূত হওয়ার পূর্বে প্রায়-মানব বানরেরা যৌনবোধ হারায়নি—তারা মাদি ও মদ্দার পার্থক্যটা বুঝতে পারত। আন্তরিক তাগিদে প্রজননের পথে বিবর্তনকে এগিয়ে নিয়ে যেত। এরা আদৌ কোনও যৌনক্রিয়া করে না—সে ইচ্ছাশক্তিটাই লোপ পেয়ে গিয়েছে ওদের।

দ্বিতীয়ত—'Mechano-Sapiens Reproducing Project; অর্থাৎ 'রোবো-প্রজনন প্রকল্প।' তার কর্ণধার প্রফেসর আইনস্টোন। কয়েকজন জীব-বিজ্ঞানী গামা-পণ্ডিতের সাহায্যে তিনি বীটাশ্রেণীর রোবোর গর্ভসঞ্চারে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। প্রফেসর আইনস্টোন বলেন, এক্ষেত্রেও আমরা একটা নীরন্ধ্র প্রাচীরের সম্মুখে এসে ঠেকেছি। বীটারা হাসতে শিখেছে, গান গাইতে শিখেছে, নাচতে পারে, কিন্তু ঐ C-টাকে খুঁজে পাচ্ছে না।

: C?

: সেই $E = mC^2$ ফর্মুলার C। অর্থাৎ 'প্রেম'!

বৃদ্ধ গারউইন বলেন, আমাদের তৃতীয় প্রচেষ্টা হচ্ছে—'Homo-Mechano Crossbreeding Project'—'মানব-বীটা প্রকল্প'!

: সেটা কী রকম?

ওঁরা বুঝিয়ে বলেন। লেকজান্ডাকে না জানিয়ে ওঁরা গোপনে সেই ভূগর্ভস্থিত আর্থারের কাছে কিছু বীটা-সুন্দরীকে পাঠিয়ে পরীক্ষা করে দেখছেন। প্রফেসর আইনস্টোন বলেন, আমরা এ প্রকল্পে আধাআধি সাফল্যলাভ করেছি এতদিনে। C পেয়েছি, C^2 এখনও পাইনি। অর্থাৎ আর্থার এতদিনে ঐ বীটা-সুন্দরীদেরই 'মধ্যাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ' আইনে স্বীকার করে নিয়েছে; কিন্তু বীটা-সুন্দরীদের অন্তরে প্রেম-ভালবাসা-যৌন আকাঙ্ক্ষার বোধ জাগেনি।

বৃদ্ধ জীববিজ্ঞানী হঠাৎ ওয়াম্বাসীর হাত দুটি ধরে বলেন, ডক্টর ওয়াম্বাসী! বিজ্ঞানের মুখ চেয়ে আপনি দয়া করে একটু চেষ্টা করে দেখবেন?

: কী?

: হেলেন, ক্লিয়োপেট্রা কিংবা নূরজাঁহা—যাকে পছন্দ হয়.....

ওয়াম্বাসী মনে মনে হাসে। কী অদ্ভুত ঘটনাচক্র। একবিংশ শতাব্দীর এক কালা-আদমীকে মানবেতিহাসের শ্রেষ্ঠ জীববিজ্ঞানী চার্লস ডারউইনের ছায়া বলছেন—হেলেন, ক্লিয়োপেট্রা বা নূরজাঁহার মধ্যে কোনো একজনকে অনুগ্রহ করে শয্যাসঙ্গিনী করে নিতে!

সে হেসে বললে, সে তো পরের কথা। আমি রাজি না হলেও বব্ হয়তো রাজি হয়ে যাবে আপনার পরীক্ষায় সহযোগিতা করতে। আপাতত যে কথা হচ্ছিল—আর্থারের প্রসঙ্গ, আজ যদি গডফাদার বেঁচে থাকতেন—

তিন বৃদ্ধ মুখ চাওয়াচাওয়ি করেন। ওয়াম্বাসী বলে, কী হল?

: গডফাদার বেঁচে থাকলে কী হত?

: যত যাই বলুন—আপনারা তিনজন মেকানো-স্যাপিয়ান্স, আমি হোমো-স্যাপিয়ান্স। আমাদের মানসিক বিচরণক্ষেত্র হয়তো এক নয়। গডফাদার আর আমি এক সমতলের জীব। তাঁর সঙ্গে একবার আলোচনা করলে হয়তো—

চার্লস গারউইন ওয়াম্বাসীর হাতটা চেপে ধরে বলেন, ডক্টর ওয়াম্বাসী! সময় হয়েছে। তোমার কাছে গোপন করব না। তোমার বন্ধুকেও কথাটা বলো না : গডফাদার জীবিত!

: সে কী! কোথায় তিনি?

: জীববিজ্ঞানের মুখ চেয়ে তোমাকে আমরা তাঁর কাছে নিয়ে যাব।

সব কথা এরপর ওঁরা খুলে বলেন।

গডফাদারের মৃত্যু একটা সজ্ঞান মিথ্যাপ্রচার। মাত্র চারজন রোবো সে কথা জানেন। ওঁরা তিনজন এবং রুডল্‌ফ্‌ ব্যাটলার। সর্বাধিনায়ক সম্রাট লেকজান্ডাকেও ব্যাপারটা জানানো হয়নি। সিদ্ধান্তটা ওঁরা চারজন নিয়েছেন—ভিন্ন উদ্দেশ্যে। রোবোদের সাহায্যে আর্থারের কবল থেকে ডরোথিকে উদ্ধার করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় একেবারে ক্ষেপে গিয়েছিলেন গডফাদার। এতগুলো নামকরা বিশ্বত্রাস জেনারেল একটা নিগার-বাচ্চার সঙ্গে যুঝতে পারে না! এঁরা বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, সেজন্য তাঁরা দায়ী নন—রোবোটিক্স বিজ্ঞানের প্রথম সূত্রটা রোবো তৈরি করেনি, করেছে তার স্রষ্টা। নাহলে বিশ্ববিজয়ী লেকজান্ডা, বিশ্বত্রাস ব্যাটলার, আসূর্যাস্ত-সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী চুরুটমুখো চারশকুন তিনজনে মিলে একটা নিগ্রো-বাচ্চাকে লেঙ্গি মারতে পারেন না! কিন্তু কে কার কথা শোনে? গডফাদার দুনিয়ার ওপর ক্ষেপে ছিলেনই, এবার তাঁর সৃষ্ট জগতের ওপরেও ক্ষেপে গেলেন। আল্‌ফা জেনারেলদের দেখলেই মারতে ওঠেন, বীটা-সুন্দরীরা সোহাগ জানাতে এলে তেড়ে মারতে আসেন—'আর ন্যাকামো করতে হবে না—লক্ষ্মীছাড়ি পুতুলের দল'! এমনকি কোনো এপসাইলন কচ্ছপ যদি ভ্যাকুয়াম ক্লিনার নিয়ে ওঁর ঘরে ঢোকে তাকে ক্লিনার-পেটা করে তাড়িয়ে দেন। একমাত্র একজনকে তিনি তখনও বরদাস্ত করতেন—ঐ ব্যাটলারকে। বলতেন, শুধু তোকেই আমি ভালবাসি ব্যাটলার। তোর সঙ্গে আমার চরিত্রগত মিল আছে। তোর দুঃখ আমি বুঝি। তোর মতো আমাকেও শেষমেষ বার্লিন-বাঙ্কারে আশ্রয় নিতে হল!

ব্যাটলারের অনার্য থিয়োরিটাকেও তিনি সর্বান্তঃকরণে মেনে নিয়েছিলেন, তবে তার ক্ষেত্রে পরিসরটা আরও কমিয়ে এনে। গডফাদারের মতে—মেকানো-স্যাপিয়ান্সরাও, অর্থাৎ ঐ রোবোরাও, সব অনার্য। আর্য এ দুনিয়ায় মাত্র দুজন। গড দ্য ফাদার তিনি নিজে, আর গড দ্য সান, তাঁর সৃষ্ট ব্যাটলার। বাদবাকি সব শালা আনহোলি গোস্ট! যত্ত সব ভূতের কেত্তন!

ব্যাটলার সুযোগ বুঝে গডফাদারকে সরিয়ে ফেললেন। লেকজান্ডাকেও জানালেন না। তাঁর পরিকল্পনাটা এই জাতীয়—ব্যাটলার জানেন, সম্রাট লেকজান্ডারের বয়স হয়েছে। তাঁর দেহাবয়বে এখানে-ওখানে জং ধরতে শুরু করেছে। অচিরেই তিনি পটলোৎপাটন করবেন। তখন হবে একটা চরম গদির লড়াই। গুলিয়াস গীজার এবং বোনাইপার্ট সেমিফাইনালে ফৌত হওয়ায় ওঁরা দুজন এখন ফাইনালে উঠে বসে আছেন। সম্রাট শিঙে ফুঁকলেই সেই ফাইনাল খেলাটা শুরু হবে—চারশকুন বনাম ব্যাটলার! রুডলফ জানেন, চারশকুন অতি ঘড়েল, অতি ধড়িবাজ। তলায় তলায় দল ভারী করছে। তাই সেই চরম 'ব্যাট্‌ল্‌ অব লন্ডনে'র জন্য তিনি গোপনে জমিয়ে রেখেছেন এই গডফাদাররূপী ভি-টু রকেট! স্বয়ং গডফাদার এসে যদি 'ভেটো দেন, তখন 'ভি-টু' রকেটে চারশকুন কাৎ হবেন! যাবতীয় রোবো—বিটা-গামা-ডেল্‌টা এপসাইলন তাদের গডফাদারের আদেশ নিশ্চয় বিনা বিচারে মেনে নেবে!

কিন্তু গডফাদারকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে কোনো চিকিৎসকের সাহায্য নিতে হয়। ব্যাটলার বাধ্য হয়ে ব্রয়েডের দ্বারস্থ হলেন। ব্রয়েড রাজি হলেন কিন্তু বললেন, কাজটা তাঁর পক্ষে একাহাতে সম্পন্ন করা সম্ভবপর নয়। ফলে, দলে টানতে হল আইনস্টোন এবং গারউইনকে।

গামা-পণ্ডিত তিনজন রাজি হলেন অন্য কারণে। যত যাই হোক, লোকটা ওঁদের ঈশ্বর—যদিও ছোট হাতের g। দ্বিতীয়ত, আর্থার ছাড়া ওঁদের জ্ঞানমতো এই সসাগরা পৃথিবীতে তিনিই একমাত্র সুস্থ মস্তিষ্কের জীবিত হোমোস্যাপিয়ন্স—। বিজ্ঞানের মুখ চেয়ে তাঁরা রাজি হলেন। বরং গডফাদারই রাজি হলেন না—ঐ তিনজন গামা-পণ্ডিতের সম্মুখে উপস্থিত হতে। ফলে ব্যাটলারের মুখে শুনে শুনে ওঁরা ওষুধ দেন, চিকিৎসার যাবতীয় আয়োজন করেন।

ওয়াম্বাসী প্রশ্ন করে, গডফাদারের মূল অসুখটা কী?

একনিশ্বাসে জবাব দেন ব্রয়েড, সব রোগেরই যা মূল—অবদমিত কামেচ্ছা!

ডক্টর ব্রয়েডের মতে গডফাদারের এই গোটা পরিকল্পনাটার উদ্ভব অবদমিত কামেচ্ছা থেকে। যেহেতু তিনি সুস্থ-সবল যৌন জীবনের অধিকার পাননি, তাই রোবো-জগৎ সৃষ্টির এই তির্যক প্রয়াস। বীর্যের মাধ্যমে সন্তান উৎপাদন না করতে পেরে তিনি বিত্তের মাধ্যমে তা করতে চেষ্টা করেছিলেন। ওঁর চিকিৎসাও হচ্ছে সেইভাবে। গডফাদারের গোপন আবাসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে জনা দশ-পনেরো প্রায়-জন্তু মানবীকে। বীটাদের উনি বরদাস্ত করেন না। তাই মানবীর ব্যবস্থা। ব্রয়েডের চিকিৎসায় ঐ কয়টি মেয়ে কিছু পরিমাণে বুদ্ধিবৃত্তি লাভ করেছে। কথা বলতে পারে না, তবে আকার-ইঙ্গিত বোঝে। গণ্ডার-গাধার মতো নির্বোধ নয়, ঘোড়া-কুকুর-বেড়ালের মতো পোষ মেনেছে। গডফাদার তাদের নিয়েই মেতে আছেন।

ওয়াম্বাসী বলে, এটা কি ঐ মেয়েগুলির প্রতি অবিচার হচ্ছে না?

: না। যেহেতু তাদের বোধশক্তি নেই। দৈহিক পীড়ন তাদের করা হচ্ছে না। মানসিক পীড়নের বোধ তাদের নেই। লজ্জা, সঙ্কোচ, দুঃখ, বেদনা, অপমান বোধের অতীত তারা।

ডক্টর ব্রয়েড বলেন, আপনার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমরা গডফাদারের গোপন আবাসে এখনই যেতে পারি।

: আমি সানন্দে প্রস্তুত। চলুন।

: শুনুন। আমরা তিনজন সে বাড়িতে ঢুকব না। আপনাকে পৌঁছে দেব শুধু। আমাদের দেখলে তিনি ক্ষেপে যাবেন। আপনি একলাই যাবেন। ভয়ের কিছু নেই। একটু রুক্ষ মেজাজের হয়ে পড়লেও তিনি নিশ্চয় আপনার সঙ্গে সদ্ব্যবহারই করবেন। বহুদিন কোনো বুদ্ধিমান মানুষের সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। সে বাড়িতে আর আছে কতকগুলি এপসাইলন। গডফাদারের চোখ এড়িয়ে লুকিয়ে তারা ঘর-দোর সাফা রাখে। এ ছাড়া—বুঝতেই পারছেন, আছে কিছু জড়বুদ্ধিসম্পন্না হতভাগিনী।

আট

প্রায় আধঘন্টা পরে ওরা এসে উপস্থিত হল এক স্তব্ধ প্রান্তরে। পাখির কোলাহল নেই, জনমানবের কোনো হদিস তো নেই-ই। কাঁটাতারের বেড়া-ঘেরা প্রকাণ্ড বাগানের মাঝখানে একটা ভাঙা বাড়ি। কে জানে কার আবাস ছিল! কত হাসিকান্নার ইতিহাস চাপা পড়ে আছে ঐ ধ্বংসস্তূপের তলায়। বাড়িটার একটা অংশ খাড়া আছে। বিজলি বাতি নেই—সেটা বস্তুত খুব কম জায়গাতেই ওরা চালু রাখতে পেরেছে। দ্বিতলের একটি ঘরে সেজবাতির আলো জ্বলছে। একটা কলকোলাহলও ভেসে আসছে। গামা-পণ্ডিত তিনজন গেটের বাইরে থেকেই বিদায় নিলেন। ওয়াম্বাসী বাগানে ঢুকল। নুড়িবিছানো পথটা অতিক্রম করে প্রাসাদ-সোপানের সামনে এসে দাঁড়ালো। আকাশে শুক্লপক্ষের চাঁদ। সন্ধ্যারাত্রে প্রায় মাঝ-আকাশে ফুটে রয়েছে। বাগানে দু-একটা ভাঙা পাথরের মূর্তি। বোঝা যায়, প্রাক্তন গৃহস্বামী সৌখিন লোক ছিলেন।

সদর দরজাটা হাট করে খোলা। করিডোরটা আলো-আঁধারি। সদর দরজা পার হয়েই ওয়াম্বাসী স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ায়। গলিপথে দু-তিনটি নারীমূর্তি। প্রায় সমবয়সি—বিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে। সকলেই সম্পূর্ণ নিরাবরণা। ওয়াম্বাসীর বিস্ফারিত দৃষ্টির সম্মুখে তারা সঙ্কোচ বোধ করল না কোনো, অবাকও হল না। পোষা কুকুর অচেনা লোক দেখলে ডাকাডকি করে, পোষা গরুও অজানা মানুষ দেখলে চঞ্চল হয়। ওদের তিনজনের যেন সে বোধটুকুও নেই। অথচ ওয়াম্বাসী লক্ষ্য করে দেখল—তাদের হাতপায়ের নখ যত্ন নিয়ে কাটা, চুল ঠিকমত ছাঁটা এবং আঁচড়ানো। এমনকি কেউ বোধ হয় ওদের প্রসাধন করিয়েও দিয়েছে—ভ্রূ-র সূচ্যগ্র ভঙ্গি, ওষ্ঠাধরের রক্তিমাভা সহজাত নয়, কৃত্রিম। ওয়াম্বাসী নিঃসন্দেহে উত্তেজিত হয়েছিল—দীর্ঘ দীর্ঘ দিন, এক দশকের ওপর সে নারীসঙ্গ-বঞ্চিত। তবু সে

আত্মশাসন করল, চোখ নামিয়ে নিল। তার মনে হল—ঐ বিবসনা সুন্দরীদের দিকে এক পদ অগ্রসর হওয়ার অর্থ পশ্চাচার।

সিঁড়ি দিয়ে সে উঠে এল দ্বিতলে। সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ আবার একটি নারীমূর্তি। সে কিন্তু বিবসনা নয়। কে যেন তাকে সযত্নে পোশাক পরিয়ে দিয়েছে। যদিও সে বিষয়ে সে সচেতন নয়। এ মেয়েটি ওকে দেখতে পেল যেন। অবোধ দৃষ্টি মেলে একাগ্র ভঙ্গিতে ওয়াম্বাসীকে দেখতে থাকে। ওয়াম্বাসীর মনে হল, তার দেহাকৃতি ঐ মৃগনয়নার শুধু রেটিনাতেই ছায়াপাত করেনি—তার দর্শনেন্দ্রিয়েও একটি মায়াপাত করেছে। ওয়াম্বাসী বললে, গডফাদার! গডফাদার কোথায়?

মেয়েটি ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত করে। অধোবদনে অনেকক্ষণ কী যেন ভাবে। তারপর আবার ওর দিকে তাকিয়ে দেখে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে অপেক্ষা করে। ওয়াম্বাসী পুনরায় প্রশ্ন করে, গডফাদার! গডফাদার ওপরে?

মেয়েটি স্পষ্ট হাসল। একটি আঙুল তুলে ওপরটা দেখালো। তারপর ধীরপদে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে। ডক্টর ওয়াম্বাসীর মনে হল, মনোবিজ্ঞানী ডক্টর ব্রয়েড নিশ্চয় সফলকাম হবেন। এই মেয়েটিই তো তার উজ্জ্বল প্রমাণ। এ বোধ করি বোধের সীমা, চিন্তাশক্তির সীমা ছুঁই-ছুঁই করছে। তাই ওকে পোশাক পরানো হয়েছে।

দ্বিতলে পৌঁছে আলোকোজ্জ্বল ঘরটির দিকে সে এগিয়ে যায়। এখানেও দরজা খোলা। ঘরের ভেতর থেকে একটা উৎকট খিলখিল হাসি-কৌতুকের শব্দ ভেসে আসছে। গডফাদার নিশ্চয় ওখানেই আছেন। আরো দু-এক পা অগ্রসর হয়েই ঘরের ভেতরের দৃশ্যটা স্পষ্ট দেখতে পেল।

ওয়াম্বাসীর মনে হল—ঐ ঘরটার ভেতরে ডস্টোয়েভ্স্কির একটি বিখ্যাত উপন্যাসের একটি বিশেষ দৃশ্যের শ্যুটিং হচ্ছে বুঝি। 'ব্রাদার্স ক্যারমোজফ্'। ঘরের আসবাবপত্র তিনশ' বছর আগেকার। প্রকাণ্ড একটা কারুকার্যখচিত পালঙ্কে একজন বৃদ্ধ শুধুমাত্র অধোবাস পরে চার-পাঁচটি মেয়েকে নিয়ে শুয়েছেন। দুটি মেয়ে সম্পূর্ণ নগ্নিকা। একটি মেয়ে আস্বচ্ছ 'নাইটি' পরা এবং একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে পরে আছে শুধু বিকিনি প্যান্টি। ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। টপলেস্। শেষোক্ত মেয়েটি পালঙ্কে লুটোপুটি খাচ্ছে—কারণ বৃদ্ধ ব্যক্তিটি একটা পাখির পালক দিয়ে তাকে সুড়সুড়ি দিচ্ছেন। ঐ মেয়েটির হাস্যধ্বনিই যেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে অপরাপর হতভাগিনীদের কলকণ্ঠে। উন্মুক্ত দ্বারপথে ওয়াম্বাসী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

বৃদ্ধ ওর দিকে পেছন ফিরে আধশোয়া অবস্থায় ছিলেন, ওকে দেখতে পাচ্ছিলেন না। কৌতুকমত্তার দল ওকে দেখতে পাচ্ছিল, নজর করছিল না—তাদের জড়বুদ্ধিতে ওর আবির্ভাব কোনো রেখাপাত করেনি। ওকে প্রথম নজর করল সেই অনাবৃতবক্ষা সুন্দরী, যে এতক্ষণ পালঙ্কের ওপর লুটোপুটি খাচ্ছিল। দর্শনমাত্রই সে শিউরে ওঠে। লাফ দিয়ে নেমে পড়ে খাট থেকে। তার দু-চোখে শরাহত হরিণীর আর্তি। কথা বলে না সে, বাকশক্তি নেই—মর্মান্তিক আতঙ্কে সে হাতটা বাড়িয়ে দ্বারপথটা নির্দেশ করে শুধু।

বৃদ্ধ ঘুরে বসেন। আগন্তুককে দেখতে পান। তৎক্ষণাৎ লাফ দিয়ে নেমে পড়েন। ছুটে চলে যান সামনের একটা টেবিলের দিকে। টানা-ড্রয়ার একটানে খুলে ফেলেন। ওয়াম্বাসী চীৎকার করে ওঠে : গডফাদার! আমি আর্থার ক্রুক্স্ নই। ভাল করে তাকিয়ে দেখুন!

আলোর সম্মুখে সে সরে আসে। দুহাত মাথায় তোলে। ততক্ষণে গডফাদার টানা-ড্রয়ার থেকে রিভলভার বার করে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরেছেন। ওয়াম্বাসীর নজর কিন্তু তাঁর ওপর নেই। সে একদৃষ্টে দেখছিল ঐ আতঙ্কতাড়িতা যুবতীকে। দু'হাতে সে চেপে ধরেছে খাটের বাজু। দেওয়ালগিরি স্তিমিত আলোক মূর্ছিত হয়ে পড়েছে ঐ জড়বুদ্ধিসম্পন্নার নিরাবরণ দেহে—বাহুমূলে, জঙ্ঘায়, উদরে, স্তনাগ্রচূড়ায়। আতঙ্কের তুঙ্গশীর্ষে সে যেন বজ্রহতা। ওয়াম্বাসী অন্যান্য মেয়েদের দিকে ফিরে দেখল। না! তারা ভয়ে কুঁকড়ে যায়নি, তবে কী যেন একটা পরিবর্তন ঘটেছে এটুকু বুঝতে পারছে। কারণ আর হাসছে না কেউ।

: তুমি কে? কী করে এলে এখানে? বজ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করেন গডফাদার। তাঁর মারণাস্ত্র কিন্তু তখনও জমির সঙ্গে সমান্তরাল।

: যেই হই! আমি যে আর্থার ক্রুক্‌স্ নই সেটা আগে বুঝে নিন। রিভলভারটা নীচু করুন। আপনার হাত কাঁপছে।

: না। তুমি আর্থার ক্রুক্‌স্ নও। তবে তুমি কে?

রিভলভারটা এতক্ষণে নীচু হয়।

: বলছি। এসে বসুন ঐখানে। ওয়াম্বাসী নিজেও বসে।

গডফাদার অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে এসে বসেন তাঁর খাটে।

ওয়াম্বাসী বলে, এদের যেতে বলুন।

গডফাদার হাততালি দিলেন। মুখেও বলেন, গো! গো!

যেন এ্যাল্‌সেশিয়ান কুক্কুরীর দল। ওরা সার বেঁধে ঘর ছেড়ে চলে গেল। ওয়াম্বাসীর লক্ষ হল—ওদের মধ্যে সব চেয়ে অনিন্দ্যকান্তি সেই মেয়েটি কিন্তু স্থানত্যাগ করেনি। সে দাঁড়িয়ে পড়েছে দরজার কাছে। এখন কিন্তু সে উন্মুক্তবক্ষা নয়। হয়তো নিজেরই অজান্তে একটা বালিশ ঢাকা দিয়ে আড়াল করতে চেয়েছে তার বক্ষস্পন্দন। ওয়াম্বাসী বললে, ওকেও যেতে বলুন।

গডফাদার এবার তাকে দেখতে পান। ধমকে ওঠেন, গো!

মেয়েটি তৎক্ষণাৎ নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়। গডফাদার বলেন, এখন বল, তুমি কে? কী করে সুস্থ-মস্তিষ্ক নিয়ে বেঁচে আছ পৃথিবীতে?

ওয়াম্বাসী সংক্ষেপে তার আদ্যোপান্ত ইতিহাসটা জানালো।

সমস্ত শুনে গডফাদার বললেন, বুঝলাম। এবার বল, কেন এসেছ? কী চাও?

ওয়াম্বাসী বললে, আমি জানতে এসেছি, আপনি কী চান? ঐ আর্থারের প্রসঙ্গে?

: তাকে গুলি করে মারতে চাই। যেভাবে এড্ আমার চোখের সামনে মরেছিল, সেইভাবে তাকে মারতে চাই।

: এড্, ডরোথি আর আর্থারের কাহিনিটায় তাহলে মিথ্যার ভেজাল নেই?

: তুমি কী শুনেছ বল?

ওয়াম্বাসী তার জ্ঞানমতো কাহিনিটার পুনরুক্তি করে। গডফাদার বললেন, হ্যাঁ, ঘটনা এই রকমই ঘটেছিল। ওয়াম্বাসী জানতে চায়, মিসেস্ ডরোথি কলিন্স-এর শেষ সংবাদ কতদূর জানেন?

: শুনেছি সে আর্থারের কাছ থেকে পালিয়ে আসে। ডক্টর ব্রয়েডের চিকিৎসাধীনে ছিল। তারপর বদ্ধ উন্মাদিনী হয়ে সে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।

ওয়াম্বাসী বলে, গডফাদার, আমি আপনার ইচ্ছাপূরণে আপ্রাণ চেষ্টা করব, কথা দিচ্ছি—আর্থারের পাপের প্রায়শ্চিত্ত যাতে হয় তার আয়োজন করব। কিন্তু আপনি কি সেক্ষেত্রে আমার মিশনে আমাকে সাহায্য করবেন?

: কী তোমার মিশন?

: এই নিষ্প্রাণ পৃথিবীতে আবার প্রাণ সঞ্চার করা। সে সাধনা করছেন আপনার সৃষ্ট তিনজন গামা-পণ্ডিত, তাঁদের ব্রত উদযাপন করা। আপনি কি তাতে আমাদের সাহায্য করতে স্বীকৃত?

: আমি কী করতে পারি? আমি বৃদ্ধ! আমি পঙ্গু! আমি তো দুনিয়ার বার!

: না, গডফাদার। আপনি এই নয়া দুনিয়ার সৃষ্টির্কতা। মাত্র পাঁচ বছর আগেও আপনি নতুন উৎসাহে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। এড্ আর ডরোথিকে দিতে চেয়েছিলেন আপনার সৃষ্ট দুনিয়ার অধিকার। আর্থারকে তার এ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

: তাতে কী হল?

: তাহলে এখনই বা তা পারবেন না কেন? ধরুন, আমাদের প্রকল্পের পথে যে একমাত্র বাধা—ঐ আর্থার, তাকে আমি সরিয়ে দিলাম। তখন এই দুনিয়ার দায়িত্ব তো আপনি আমাদের দুজনকেও দিতে পারেন? আমাকে আর আমার বন্ধু—ডক্টর বব্ রয়কে!

বৃদ্ধ ম্লান হেসে বললেন—তাতে লাভ? সে আর কদিন? এড্ আর ডরোথি ছিল আমার আদম আর ঈভ। তোমরা দুজন তো তা নও!

: গডফাদার! ভুলে যাবেন না, ঈভ সৃষ্ট হয়েছিল আদমের পাঁজর থেকেই। হয়তো আমরাও তেমনি আমাদের পাঁজর ভেঙে ঈভকে নতুন করে সৃষ্টি করব।

: আমরা বাস্তব দুনিয়ার বিষয়ে কথা বলছি ডক্টর ওয়াম্বাসী!

: আমিও তাই বলছি গডফাদার। এখানে বুকের পাঁজর তৈরি করা অর্থে বিজ্ঞানের সাহায্যে তাকে সৃষ্টি করা। যেভাবে ওরা—ঐ আপনার গামা-জীববিজ্ঞানীরা—ধীরে ধীরে এই জড়বুদ্ধিসম্পন্নাদের নারীত্ব দান করছেন। এইমাত্র যে মেয়েটিকে আপনি ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলেন—

: না! সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ান গডফাদার।

: কী হল? ওয়াম্বাসী বিস্মিত।

: ওকে তোমরা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিও না!

: বেশ তো, নেব না। কিন্তু ঐ মেয়েটিকে দেখে আমার মনে হল—সে এখন আর একেবারে জড়বুদ্ধির নয়। তার বোধ জাগরিত হচ্ছে, হবে। একটি মেয়ের ক্ষেত্রে যদি ওঁরা এতটা উন্নতি করে থাকেন, তবে অন্য একটি মেয়ের ক্ষেত্রেও পারবেন।

: না, পারবেন না। কিছুতেই পারবেন না।

: কেন? কী যুক্তিতে?

: তর্ক করো না আমার সঙ্গে।

: বেশ, করব না। আমার প্রশ্নটার জবাব কিন্তু আপনি দেননি।

বৃদ্ধ অনেকক্ষণ চুপ করে কী ভাবলেন। তারপর বললেন, জান ডক্টর ওয়াম্বাসী, আমি লোকটা 'বেসিকালি' এত খারাপ নই। আমিও ঘটনাচক্রের শিকার। নিজের দোষত্রুটি সম্বন্ধে আমি সচেতন। আমি স্বেচ্ছাচারী, ক্ষমতাপ্রিয়, অর্থমদগর্বিত এবং স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে দুর্বল! আমি এও জানি, আমার এই চরিত্রগত দুর্বলতার জন্যই আমার সৃষ্ট দুনিয়া ব্যর্থ হয়ে গেছে—

: না, যায়নি গডফাদার। ঈশ্বরের সৃষ্টি দুনিয়াটাকে দেখুন—সেখানে শুধু আলো, শুধু আনন্দ, শুধু হাসি নেই। সেখানে আলোর পাশেই আছে অন্ধকার, আনন্দের কাছ ঘেঁষে বেদনা, হাসির হাত ধরে অশ্রু। আপনি যেমন ব্যাটলারকে সৃষ্টি করেছেন, তেমনি অসংখ্য গামা-পণ্ডিতদেরও রূপায়িত করেছেন। স্বয়ং ঈশ্বরের সৃষ্ট ঈডেনে কি আদম-ঈভের সঙ্গে শয়তানও ছিল না?

ও থামতে বৃদ্ধ বললেন, থ্যাঙ্কু ডক্টর! এভাবে ব্যাপারটা কোনোদিন ভেবে দেখিনি। বেশ, তোমার বন্ধুকে নিয়ে কাল সন্ধ্যাবেলায় এসো। দেখি কী করতে পারি!

ওয়াম্বাসী উঠে দাঁড়ায় : গুড নাইট গডফাদার!

: আমি অসুস্থ, না হলে গেট পর্যন্ত তোমাকে এগিয়ে দিতাম।

: কোনো প্রয়োজন নেই। আমি একা যদি আসতে পেরে থাকি, একা ফিরতেও পারবো।

ওয়াম্বাসী বেরিয়ে আসে ঘর ছেড়ে। একবার পেছন ফিরে দেখে, বৃদ্ধ জানলা দিয়ে উদাস দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছেন। বাইরে জ্যোৎস্নালোকিত বনভূমি। মহিরুহ নেই—তবু পাঁচ বছরে শিশু মহিরুহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠবার চেষ্টা করছে। একটা দলছুট নাইটিঙ্গেল শিস দিচ্ছে, যেন ঘোষণা করছে : মরিনি—আমরা মরিনি!

স্বল্পালোকিত সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিল, হঠাৎ ল্যান্ডিঙ-এর মুখে দেখা হয়ে গেল সেই মেয়েটির সঙ্গে। সেই জড়বুদ্ধিসম্পন্না যে মেয়েটি পালকের সুড়সুড়ি খেয়ে তখন লুটোপুটি খাচ্ছিল। মেয়েটি এখন আর বিকিনি-স্যুট পরা টপ্‌লেস নয়; অগোছালোভাবে একটা স্কার্ট-ব্লাউস পরেছে। ওয়াম্বাসীর দিকে অবোধ দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির মাঝ-বরাবর, চিত্রার্পিতার মতো। ওয়াম্বাসী থমকে দাঁড়ালো। হাসল। বললে, তোমার নাম কী?

সে শব্দ শুনে মেয়েটির কোনো ভাবের অভিব্যক্তি হল না। যেন পাথরে কোঁদা কোনও মর্মরমূর্তিকে প্রশ্ন করা হল।

ওয়াম্বাসী বললে, আমাকে ভয় পেও না। নিগার হলেও আমি জন্তু নই, মানুষ!

মেয়েটি নির্বিকার। ওয়াম্বাসী তখন সাবধানে তার পাশ কাটিয়ে নীচে নেমে যায়। দীর্ঘ করিডোরটা অতিক্রম করতে করতে ওর মনে হল মেয়েটি পেছন পেছন আসছে। ওয়াম্বাসী থমকে দাঁড়ালো। মেয়েটিও। ওয়াম্বাসী বললে, কিছু বলবে?

মেয়েটি যেন দ্বিধায় পড়েছে। যেন কিছু বলতে চায়, পারছে না। নতমস্তকে কী যেন ভাবছে। তারপর পায়ে পায়ে ঘনিয়ে আসে। ওয়াম্বাসী পাথরের মূর্তির মতো স্থির। কাছে, আরও কাছে ঘনিয়ে আসে মেয়েটি। এবার ওর নিশ্বাস ওয়াম্বাসীর বুকে লাগছে। নতনয়না এবার মুখটা তুলল। কীসের জন্য যেন প্রতীক্ষা করল। ওয়াম্বাসী এখনো প্রস্তরমূর্তি। তারপর ধীরে ধীরে সেই অনিন্দ্যকান্তি মেয়েটি তার দুটি গজদন্তনিন্দিত বাহু তুলে ওর দুটি কাঁধে রাখল। তার চোখ দুটি মুদে আসে আবেশে। অর্ধস্ফুট বিম্বাধর মেলে ধরে সে নিমীলিত নেত্রে কীসের জন্য যেন প্রতীক্ষা করে। পুরো একটি মিনিট পার হয়ে গেল। ওয়াম্বাসী নিথর নিশ্চল। এবার মেয়েটি চোখ খুলল। বুঝে নিতে চাইল পরিস্থিতিটা। এতক্ষণে ওয়াম্বাসী সজীব হল। অতি ধীরে ধীরে সে নামিয়ে দিল মেয়েটির দুটি বাহু। হাসল। তারপর বললে, তোমাকে আমি চুমু খাব না!

বিদ্যুৎস্পৃষ্টার মতো মেয়েটি ছিটকে সরে গেল। কথা সে বলেনি, বাকশক্তির অধিকারী সে নয়। তবু তার চোখ দুটি বাঙ্ময় হয়ে উঠল। অতি দ্রুতছন্দে কয়েকটি অভিব্যক্তি ফুটে উঠল সেখানে—বিস্ময়, হতাশা, অভিমান, ক্রোধ! আর সবার ওপর—প্রশ্ন। ওর সে দৃষ্টির আক্ষরিক রূপ—'?'।

ওয়াম্বাসী হ্যাট-র‍্যাক থেকে টুপিটা তুলে নিল। প্রবেশের সময় অভ্যাসবশে টুপিটা এখানেই খুলে রেখে গিয়েছিল। টুপিটা আবার খুলে বললে, গুড নাইট মিসেস কলিন্স!

: কী! কী বললে?—মেয়েটি যেন ইলেকট্রিক শক্ খেয়েছে।

: অভিনয় তোমার নিখুঁত, কিন্তু আমাকে ঠকাতে পারনি!

মেয়েটি বললে, কে বলেছে আমার নাম মিসেস কলিন্স?

: তুমি। তোমার ব্যবহার। আমাকে দ্বারপথে দেখতে পেয়েই তুমি লাফিয়ে উঠেছিলে—আলো-আঁধারিতে তুমি ভেবেছিলে—আমি আর্থার। আমরা দুজনেই নিগ্রো, দুজনেই কালো। তখন তোমার দৃষ্টিতে ছিল শুধু আতঙ্ক। তখন সঙ্কোচে তুমি নগ্নবক্ষ আবৃত করনি—কারণ আর্থার ক্রুক্স তোমাকেঐ অবস্থায় বহুবার দেখেছে। যে মুহূর্তে বুঝলে, আমি অন্য একজন পুরুষ—তুমি সঙ্কোচে নিজ দেহ আবৃত করলে। জড়বুদ্ধিসম্পন্না হলে তুমি দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আমাদের কথোপকথন শুনতে না—

: কে বলল তা আমি শুনেছি?

: তোমার ছায়া। তুমি খেয়াল করোনি—বাতিটা ছিল তোমার পেছনে। খোলা দরজার সামনে তোমার ছায়া পড়েছিল! তাছাড়া গডফাদারও তোমাকে হারানোর আতঙ্কে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, নিজের অজান্তে—তুমি কে!

নতমস্তকে মেয়েটি বললে, কাউকে বোলো না!

: বলবো না। কিন্তু তুমি যে এখানে আছ, তা কেউ জানে না?

: না। কেউ নয়। একমাত্র রুডলফ্ ব্যাটলার ছাড়া এ বাড়িতে কেউ ঢোকে না। গডফাদার তাকেও জানতে দেননি।

: আমি কিন্তু তোমার অনুরোধটা রাখতে পারবনা, মিসেস কলিন্স। আমাকে সব কথা জানাতে হবে চারজনকে। তাতে তোমার ভয়ের কিছু নেই। কারণ তাঁরা তোমার ক্ষতি করবেন না।

: কে? কে তাঁরা?

: আমার বন্ধু বব্ রয়, আর তিনজন গামা-পণ্ডিত, যাঁরা তোমার হিতার্থী।

: বুঝেছি। কিন্তু....কিন্তু.....কী ভাবে বলব.....?

: কেন তোমার উদ্যত চুম্বন প্রত্যাখ্যান করলাম? মিসেস কলিন্স, আমি নিগার হতে পারি, কিন্তু আর্থার ক্রুক্‌স্ নই!

: তুমি আজ রাতে এখানেই থেকে যাও।

: সে হয় না।

: কেন হয় না?

: ডরোথি, আর্থার ক্রুক্‌স্ না হলেও আমি মানুষ। অতটা আত্মবিশ্বাস আমার নিজের ওপরেও নেই।

: আমি তো নিজেই আমন্ত্রণ করছি ডক্টর! আর্থার ক্রুক্‌স্ শুধু আমার দেহটাকেই ভোগ করতে চেয়েছিল—আমার মন ছোঁবার কোনো চেষ্টাই সে করেনি।

: আর আমি?

আবার ঘনিয়ে আসে মেয়েটি। বলে, ডক্টর! আমি কিশোরী মেয়ে নই। জীবনে পুরুষ আমি কম দেখিনি—কিন্তু তোমার মতো আশ্চর্য মানুষও আমি দেখিনি।

: এতো স্বল্প পরিচয়ে? কতটুকু জেনেছ তুমি আমাকে?

ডরোথি একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে, ভুলে যেও না—আমি মিস্ মার্স ছিলাম। মাথা কোনদিন নিচু করিনি। আমার উদ্যত চুম্বন জীবনে কখনও প্রত্যাখ্যাত হয়নি। এই আমার প্রথম পরাজয়। এবং জয়। না হারলে যে জেতা যায় না, এটা তুমিই আমাকে শেখালে!

: কিন্তু আমি নিগ্রো। মধ্যরাত্রে তোমার নির্জন সান্নিধ্যে এই ব্ল্যাক ডগটার স্পর্ধাও যদি আকাশচুম্বী হয়ে ওঠে?

ডরোথি ওকে জড়িয়ে ধরে—প্লীজ! প্লীজ! ও-ভাবে বোলো না!

ওয়াম্বাসী বলে, কেমন করে ঐ কামুক বৃদ্ধটাকে সহ্য কর?

ডরোথির মুখটা বেদনার্ত হয়ে ওঠে। অস্ফুটে বলে, বিশ্বাস কর, বহুবার চেষ্টা করেছি। পারিনি। মরতে পারিনি। জীবনকে আমি বড় ভালবাসি। আমি বাঁচতে চাই। তুমি আমাকে বাঁচতে দাও। বাঁচাও।

ওয়াম্বাসী দুহাতে ওর বাহুমূল শক্ত করে ধরে। বলে, ডর্! আর প্রলোভন দেখিও না আমাকে। তবু...তবু একটা কথা বল! সত্যি করে বল।—তুমি কি এক রাতের জন্য শুধু শান্ত হতে চাইছ?

ডরোথি ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে। ওর বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে বলে, ওগো না, না! কেমন করে তোমাকে বোঝাই? আমি ব্যভিচারিণী! আমি বহুভোগ্যা! বহুবার অভিনয় করেছি জীবনে—খাঁটি জিনিস কী তা জানতাম না! আজ আমার বুকের মধ্যে যা হচ্ছে....

এতক্ষণে কালো মানুষটা তার কবাটবক্ষে ঐ অনিন্দ্যকান্তির তনুদেহ নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে। নত হয়ে আসে একটি চুম্বনতৃষিত মুখ।

নয়

পাখির পালকের মতো হালকা মন নিয়ে যেন বাতাসে ভাসতে ভাসতে ঐ মধ্যযুগীয় প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ থেকে বেরিয়ে আসছিল ওয়াম্বাসী—পরদিন সকালে। আমূল বদলে গেছে পৃথিবী, তবু বৃষ্টির ধারাপতনের শব্দে, তুলোপেঁজা তুষারে ভেসে বেড়ানোর গতিছন্দে কিংবা রামধনুর বর্ণালীতে তার ছায়াপাত ঘটেনি। আজকের এই সকালটাও তেমনি সহস্রাব্দীর যে-কোনো সকালের মতোই উজ্জ্বল, সুন্দর, আশাঘন। না, ওয়াম্বাসী মনে মনে প্রতিবাদ করল—আজকের সকালটা বিশেষ। ওর ত্রিশ বছরের জীবনে একটি সুচিহ্নিত প্রভাত। সন্ধ্যা আর প্রভাত, দুটি ঝিনুকের খোলার মাঝখানে আজ ধরা পড়েছে জমাট মুক্তোবিন্দুর মতো একটা দুর্লভ রত্ন। লক্ষ শুক্তিখণ্ডের মধ্যে একটিতেই জন্মায় এমন মুক্তো—জমাট অশ্রুর মতো সুন্দর। রতিকান্তা আশ্লেষশয়নার বিদায়-চুম্বনের অনুরণন ওর প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্রে রিমঝিম করে বাজছে এখনো। দীর্ঘ দশ বছর মহাকাশ পাড়ি দিয়ে এসে এমন দুর্লভ নারীরত্ন লাভ করবে এ কথা কি স্বপ্নেও ভেবেছিল! ডরোথি অপূর্ব সুন্দরী—কিন্তু সেজন্য নয়, ও খুশিয়াল হয়ে উঠেছে ডরোথির রূপের জন্য নয়, তার ঐকান্তিক প্রেমের ধারাস্নানে অবগাহন করে। ভালবাসাই তো

সব! ডরোথি বলেছিল—না হারলে যে জেতা যায় না সেটা তুমিই আমাকে শেখালে। শুধু না হারলে নয়, না হারালে—নিজেকে হারাতে হয়! ব্যক্তিসত্তা। দুয়ে মিলে এক। শুধু 'C' নয়—C^2!

হঠাৎ বাধা পেল ওয়াম্বাসী। প্রেমের জগৎ থেকে ফিরে এল বাস্তব দুনিয়ায়। তার পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে একটি বিচিত্র জীব—জনৈক এপ্‌সাইলন।

: কী চাই?

মক্‌-টার্টল্‌টা পেছনের পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। শুঁড় দিয়ে নাকটা চুলকালো এবং মাঝের ঠ্যাং দুটো ধরে একটা সিলবন্ধ লেফাফা বাড়িয়ে ধরল ওর দিকে। ওয়াম্বাসী খামটা গ্রহণ করা মাত্র এপ্‌সাইলন পুনরায় কচ্ছপে রূপান্তরিত হল এবং অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলে গেল। ওয়াম্বাসী খামটা খুলে ফেলে। সামরিক-বিভাগের নির্দেশ একটা :

"যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আপনি চরম বিপদের সম্মুখীন। এখনই সাবধান হোন। আপনার ওপর অতর্কিতে গুলিবর্ষণ হতে পারে। আপনার বন্ধু আহত। ডক্টর ব্রয়েডের হাসপাতালে। অবিলম্বে সেখানে যান।

জি. ও. সি—ডাব্‌লু. সি."

মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা গেল না। যুদ্ধ বেধেছে? কার সঙ্গে কার? এই জনমানবহীন বিশ্বে যুযুধান কই? পত্রপ্রেরকের পরিচয়টা অবশ্য বোঝা যাচ্ছে—জেনারেল অফিসার কমান্ডিং—ওয়েস্টার্ন কমান্ড। অর্থাৎ রুডলফ্‌ ব্যাটলার। কিন্তু বব্‌ গুলিবিদ্ধ হল কী করে? কে, কেন তাকে গুলি করল?

আধঘন্টা পরেই সে এসে পৌঁছলো ডক্টর ব্রয়েডের হাসপাতালে। সেখানে অনেকেই অনুপস্থিত। ডঃ ব্রয়েড নেই, তাঁর অনুগামী কয়েকজন বিশিষ্ট জীববিজ্ঞানীও নেই। সকলেই গ্রেপ্তার হয়েছেন। বসে আছেন, বাজেপোড়া তালগাছের মতো সেই চার্লস ডারউইনের ছায়ামূর্তি। গতকাল রাত্রিতে রোবোর দুনিয়ায় যে দ্রুতছন্দ পটপরিবর্তন হয়েছে তার সংক্ষিপ্তসার তিনিই শোনালেন।

সন্ধ্যারাত্রে বব্‌ বসেছিল জানলার ধারে। যে বাড়িতে এখন ওরা দুজন থাকে। বব্‌ আর ওয়াম্বাসী। হাসপাতাল থেকে ফিরে বব্‌ একাই ছিল, সেখানে। জানলা দিয়ে সূর্যাস্তের দিকে মুখ করে বসেছিল। ভাবছিল, কতক্ষণে ওয়াম্বাসী ফিরে আসে। হঠাৎ খোলা জানলা দিয়ে ছুটে আসে একটা বুলেট! ববের বাহুমূলে প্রচণ্ড আঘাত লাগে। বব্‌ পড়ে যায়। তার পরেই একটা হৈ-হৈ। ববের আঘাতটা খুব বেশি নয়—বস্তুত গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট না হলে সে মারাই যেত। বুলেটটা ওর বাম কাঁধের চামড়াটা ছিঁড়ে দিয়ে গিয়েছে শুধু। বব্‌ একটা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে তৎক্ষণাৎ আততায়ীর পশ্চাদ্ধাবন করে, কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

ব্যাটলারের গেস্টাপো বাহিনী অচিরে রহস্যজাল ভেদ করে প্রকৃত সংবাদ সংগ্রহ করে আনে—আর্থার ক্রুক্‌সের কাণ্ড। লোকটা দিনদুয়েক আগে ওপরে উঠেছিল; ডক্টর ব্রয়েডের হাসপাতালে গিয়েছিল! সেখানেই সে জানতে পারে—এই দুনিয়ায় নতুন দুটি মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে। তৎক্ষণাৎ সে বুঝতে পারে তার বিপদের পরিমাণটা। রোবোরা এতদিন ছিল ঢোঁড়া সাপ—এখন ঐ দুজনের সাহায্যে তারা শোধ নেবে। আর্থারের ধারণা, গডফাদার এবং ডরোথি জীবিত—যদিও তারা কোথায় লুকিয়ে আছে তার সন্ধান সে পায়নি। সে বুঝতে পারে—এরপর তার পক্ষে ভূগর্ভস্থ প্রাসাদে অবস্থান করা নিরাপদ নয়। আর কিছু না হোক—নবাগত দুজন ওর লিফট্‌টাকে অকেজো করে দিলেই আর সে পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারবে না। সে যে ঠিক কী ভেবেছিল জানা নেই, বোধ হয় ভেবেছিল—ঐ অজ্ঞাত দুটি নবাগতকে খতম করতে না পারলে তার সমূহ বিপদ। হয়তো সেজন্যই সে ওভাবে অতর্কিত গুলিবর্ষণে বব্‌কে হত্যা করতে চেয়েছিল।

খবরটা জানাজানি হওয়া মাত্র ওয়েস্টার্ন কমান্ডের সেনাপতি তৎপর হলেন। আধঘন্টার মধ্যে দ্রুতগতিতে ঘটে গেল কতকগুলি ঘটনা। বব্‌কে নিয়ে আসা হল ডক্টর ব্রয়েডের হাসপাতালে। ব্রয়েড তাকে পরীক্ষা করে যেই বললেন বিপদের কোনো আশঙ্কা নেই তৎক্ষণাৎ তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। শুধু তাঁকে নয়, তাঁর আরও কয়েকটি সহকারীকে। এমনকি ডর্মিটারি থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হল

প্রফেসর আইনস্টোনকে। সকলের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ। ওঁরা গোপনে শত্রুপক্ষকে সংবাদ সরবরাহ করেছেন—ওঁরা খবর না দিলে আর্থার জানতে পারত না যে, দুজন নতুন নভোচারী পৃথিবীতে এসেছেন।

বৃদ্ধ জীববিজ্ঞানী বললেন, ডক্টর ওয়াম্বাসী! আমি....আমি এখন কী করব? এ কী অভূতপূর্ব পরিস্থিতি হল বলুন তো?

ওয়াম্বাসী বললে, অভূতপূর্ব কিছুই নয়। এমনটাই দুনিয়ায় ঘটে থাকে। আপনি কিচ্ছু ভাববেন না। আমি সব ব্যবস্থা করছি। বব্ কোথায়? কেমন আছে সে?

: বব্ তো ভালই আছে। ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছিল। এখনো তার ঘুম ভাঙেনি।

: তবে সে ঘুমোক। চলুন—ডক্টর ব্রয়েডদের ছাড়িয়ে আনা যায় কি না দেখি।

অগত্যা সেই চেষ্টাই করা হল। ওরা দুজনে এসে উপস্থিত হল ওয়েস্টার্ন কমান্ডের হেড-কোয়ার্টার্সে। রুডলফ্ ব্যাটলারের খোলা কথা। এখন 'ওয়ার-এমার্জেন্সি' চলছে। ডক্টর ব্রয়েড বা প্রফেসর আইনস্টোনের মতো পঞ্চম বাহিনীর লোককে জেলের বাইরে রাখা চলে না।

ওয়াম্বাসী অনেক যুক্তিতর্কের অবতারণা করল; কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনি!

: সব ব্যাটা অনার্য! কাউকে ছাড়ব না আমি!

ওয়াম্বাসী বলে, হের ব্যাটলার—আমি রোবোটিক্স ল'-র দু-নম্বর ধারামতে আপনাকে আদেশ করছি—ঐ দুজন গামা-পণ্ডিতকে অবিলম্বে মুক্ত করুন। সংবিধানের দু-নম্বর ধারায় বলা আছে—A robot must obey the orders given to it by human beings (মানুষের আদেশ রোবোমাত্রই মানতে বাধ্য।)

হের ব্যাটলার বলেন, সংবিধান দরকার হলে বদলাব; কিন্তু আপাতত তার দরকার নেই; ঐ ধারাতেই পরবর্তী 'ক্লজ'টা হচ্ছে except where such orders would conflict with the First Law (যদি না সেই আদেশ প্রথম সূত্রের প্রতিবন্ধক হয়)। প্রথম সূত্রে বলা হয়েছে—'রোবো কোনও মানুষের ক্ষতি করতে পারে না। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে।' ওদের মুক্তি দেওয়া হলে আপনাদের দুজনের ক্ষতি করা হবে, পরোক্ষভাবে আর্থার ক্রুক্স্‌কে সাহায্য করা হবে—যে লোকটা ডক্টর বব্ রয়কে গুলিবিদ্ধ করেছে।

ওয়াম্বাসী বলে, ডক্টর ব্রয়েড যদি মুচলেখা লিখে দেন—

ওকে মাঝপথে থামিয়ে ব্যাটলার বলেন, ডক্টর ওয়াম্বাসী! ন্যাড়া কবার বেলতলায় যায় সে স্ট্যাটিস্‌টিক্সটা কি আপনার জানা?*

ওয়াম্বাসী উঠে দাঁড়ায়। বোঝে, রুড্‌লফ ব্যাটলারকে কিছুতেই বাগে আনা যাবে না। বলে, হের ব্যাটলার! তাহলে আপনি খোলাখুলি আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছেন?

ব্যাটলারও উঠে দাঁড়ান। রাগে তিনি প্রায় তোৎলা হয়ে যান। বলেন, হের ওয়াম্বাসী! এযাত্রায় রক্ষা পেলেন আমাদের শাস্ত্রের ঐ প্রথম সূত্রটির জন্য। নাহলে এ উদ্ধত আচরণের উপযুক্ত জবাব আপনাকে দিতাম।

ওয়াম্বাসী ফিরে আসে। সে ভাবছিল, ঐ বড় হাতের G-ওয়ালা কোনো নাট্যকার যদি সত্যই কোথাও থাকেন, তবে তিনি ছোট হাতের g-ওয়ালা ঐ গডের মতো স্থবির, বৃদ্ধ। নতুন একখানা নাটক লিখবার ক্ষমতা আর তাঁর নেই। একই নাটক বার বার মঞ্চস্থ করার আয়োজন করছেন। চর্বিত-চর্বণের

---

* প্রসঙ্গত স্মর্তব্য : 1933 সালে হিটলার 'সাইকো-অ্যানালিসিস্' পদ্ধতিতে চিকিৎসা নিষিদ্ধ করে একটি আদেশজারি করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধার পূর্বে নাৎসীরা যখন অস্ট্রিয়া দখল করে তখন সিগ্‌মুন্ড ফ্রয়েড সপরিবারে গ্রেপ্তার হন। বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতদের সমবেত প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক চাপে হিটলার ওঁকে কারামুক্ত করে দিতে রাজি হন, যদি ফ্রয়েড লিখিতভাবে স্বীকৃতি দেন যে, বন্দি অবস্থায় নাৎসী কারারক্ষীরা তাঁর ওপর কোনো অত্যাচার করেনি। ফ্রয়েড তখন দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে মৃত্যুপথযাত্রী। তিনি অস্বীকৃত হন। শেষ পর্যন্ত তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীদের নির্বন্ধাতিশয্যে তিনি মুচলেখা লিখে দিয়ে মুক্ত হন এবং বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার মাত্র মাস দুই আগে ঐ রোগেই মারা যান।

পুনঃপৌনিক রোমন্থন। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে স্লেটটা ধুয়েমুছে সাফা হয়ে গেল, তবু কোনো নতুন নাটকের পরিকল্পনা করতে পারলেন না তিনি।

এরপর বেচারি এসে হাজির হল ইস্টার্ন কমান্ডের সেনাপতির কাছে। সেখানেও কল্কে পেল না। চারশকুন সাহেব চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে বললেন, দেখুন মশাই, ওসব ছেঁদো কথা আমায় বলতে আসবেন না। ব্যাটলার লোকটা পাজি, পাজির বেহদ্দ; কিন্তু এক্ষেত্রে সে যা করেছে তাতে আমার পূর্ণ সমর্থন আছে। মহামহিম সম্রাটের এই বিশাল সাম্রাজ্য—যে সাম্রাজ্যে সূর্য পর্যন্ত অস্ত যেতে ভয় পায়—সেটা 'লিকুইডেট্' করতে আমি এ গদিতে বসিনি। এখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। দেশে 'এমার্জেন্সি' চালু হয়েছে। এখন ওসব সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক করে রাখা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

অগত্যা শেষ চেষ্টা—স্বয়ং সর্বাধিনায়ক, লেকজান্ডার দরবারে। কিন্তু তিনিও যুগের হাওয়ায় অভ্যস্ত হয়েছেন এতদিনে। সম্রাট জানেন, তাঁর গদির নিরাপত্তা নির্ভর করছে দুই সেনাপতির মদৎদানে। নিজ পার্টির কোনো হোমরাচোমরার কার্যকলাপের বিরুদ্ধে যাওয়া রাজনীতিতে বেআইনী। এমার্জেন্সির অজুহাতে তিনিও বধির, তুচ্ছ কথায় কানই দিলেন না।

* * *

সারাদিনের ব্যর্থ পরিশ্রমে ক্লান্ত ওয়াম্বাসী ফিরে এল হাসপাতালে।

বৃদ্ধ জীববিজ্ঞানী বলেন, কী হল? ওদের জেলখানা থেকে ছাড়িয়ে আনা গেল না?

ওয়াম্বাসী মাথা নেড়ে বলে, না স্যার, পারলাম না। আমার বন্ধু কেমন আছে? সে কি এখনও অজ্ঞান হয়ে আছে?

: না, অজ্ঞান সে আদৌ হয়নি। আঘাতটা অতি সামান্য। একটু ছড়ে গিয়েছে মাত্র। মারাত্মক হতে পারত—খুব বেঁচে গিয়েছে। ওকে ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছিল। উঠেছে। তোমার খোঁজ করছিল। চল তার কাছে যাই।

ওয়াম্বাসী বলে, চলুন, কিন্তু একটা কথা স্যার। আমাকে কিন্তু সব কথা বব্‌কে খুলে বলতে হবে।

: বলো। আমার আপত্তি নেই। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আমি অত্যন্ত হতাশ বোধ করছি ডক্টর ওয়াম্বাসী।

ওয়াম্বাসী বলে, আমি কিন্তু খুব আশাপ্রদ একটা খবর আপনাকে জানাতে পারি।

: কী?

: আপনাদের যেটা ছিল মূল সমস্যা—'হোমো স্যাপিয়ন্স-স্পেসিস্' অর্থাৎ মানুষ নামক জন্তুর বংশবৃদ্ধি অপ্রতিহত রাখা—সেটার সমাধান আমি করে ফেলেছি।

বৃদ্ধ দাড়ি চুলকোতে থাকেন। মাথার চুলগুলোও টানতে থাকেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ঘরময় বারকতক পায়চারি করে এসে বলেন, আশ্চর্য! আমরা এতদিন গবেষণা করেও কোনো কূলকিনারা করতে পারিনি, আর তুমি মাত্র একদিনেই—! তুমি....তুমি একজন জিনিয়াস। বল, কীভাবে?

ওয়াম্বাসী বলে, চলুন, ববের কাছে যাই। তারপর আপনাদের দুজনকেই বলব।

ওদের দেখেই বব্ লাফিয়ে ওঠে; হাই নিগার! কোথায় ছিলি এতক্ষণ? আমি গুলি খেয়ে মরছি আর তুই বেপাত্তা!

ওয়াম্বাসী দীর্ঘ কৈফিয়ত দিল। গতকাল রাত্রে তার ছোট হরফের ঈশ্বরপ্রাপ্তির কথা। অকপটে জানালো তিন গামা-পণ্ডিত কীভাবে বব্ রয়কে সরিয়ে দিয়েছিলেন এবং কেন? কী ভাবে সে গডফাদারের গোপন আস্তানায় গিয়ে তাঁকে কী পরিবেশে আবিষ্কার করে। শুধু একেবারে শেষের অভিজ্ঞতাটুকু সে গোপন রাখল—অর্থাৎ প্রত্যাবর্তনের পথে সে কীভাবে ডরোথি কলিন্সকে আবিষ্কার করে!

আদ্যন্ত কাহিনিটা শুনে বব্ বলে, তোর দৃঢ় বিশ্বাস—সেই মেয়েটা ডরোথি?

: আমি নিঃসন্দেহ। কেন আমার এ সিদ্ধান্ত তা আগেই বলেছি—আমাকে দেখে মেয়েটা ভেবেছিল আমি আর্থার ক্রুক্‌স্‌। তাই আতঙ্কে একেবারে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল।

বব্‌ বলে, কিন্তু আতঙ্কগ্রস্ত হওয়া কোনো উন্নত বুদ্ধির পরিচায়ক নয়—জন্তুরাও ভয়ে সিঁটকে যায়।

: যায়। কিন্তু দরজার আড়ালে লুকিয়ে মানুষের কথোপকথন শুনবার চেষ্টা করে না। দ্বিতীয়ত, গডফাদার তাঁর কথাবার্তায়, আচরণে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন যে ঐ মেয়েটি ডরোথি। তাঁর ভয়—আমরা মেয়েটিকে ওঁর কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসব। তাতে তাঁর ঘোরতর আপত্তি। কেন? দশ-বারোটি সুন্দরী মেয়ে তো তাঁর রয়েছে! আমার বিশ্বাস তার কারণ—একমাত্র ঐ মেয়েটির সঙ্গেই তিনি ভাবের আদানপ্রদান করতে পারেন, কথা বলতে পারেন।

গারউইন বলেন, কিন্তু ডরোথি তো বিকৃতমস্তিষ্কা?

: না। হয়তো অত্যাচারে সে সাময়িকভাবে মানসিক স্থৈর্য হারিয়ে ফেলেছিল, অথবা সবটাই তার অভিনয়। এখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ।

বব্‌ উৎসাহে উঠে বসে; বলে, আর য়ু শিওর?

: এককথা কতবার বলব?

বৃদ্ধ জীববিজ্ঞানী গার্লস গারউইন আনন্দে প্রায় কেঁদে ফেলেন। চট্‌ করে উঠে দাঁড়ান চেয়ার ছেড়ে। ম্যান্টলপিসে বসানো ছিল সেই নগ্নপ্রায় ক্রুশবিদ্ধ মানুষটির একটি মূর্তি। তিনি সেদিকে এগিয়ে যান। নতজানু হয়ে প্রার্থনা করেন, তারপর এগিয়ে আসেন দুই বন্ধুর দিকে। ওয়াম্বাসীর হাতটা তুলে নিয়ে ভাবগম্ভীর কণ্ঠে বলেন, ডক্টর ওয়াম্বাসী! ঈশ্বর করুণাময়। শুধু আদম নয়, ঈভকেও তিনি বাঁচিয়ে রেখেছেন। এই বৃদ্ধের অনুরোধ তোমাকে রাখতেই হবে। হয়তো ডরোথি এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেনি—না হোক! তোমাকে নিজের বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে তাকে সচেতন করতে হবে। আইনস্টোনের সেই ফর্মুলাটা $E = mC^2$-কে সার্থক করতে হবে! পারমাণবিক বিস্ফোরণে এবার তার প্রমাণ হবে না, হবে—পরম-মানবিক বিকাশনে! ধ্বংস নয়, সৃষ্টি!

বব্‌ হেসে বলে, স্যার! আমরা দুজন আশমান ফুঁড়ে এসেছি। আপনি দুঃখ করেছিলেন, যেহেতু দুটোই হুলো! তা আপনার সিদ্ধান্তটা একটু একদেশদর্শী হয়ে যাচ্ছে না কি? ঐ নিগারটা একাই সে গুরুদায়িত্ব পালন করবে? আর আমি কি শুধু বসে বসে হাপু গাইব?

বৃদ্ধ বলেন, প্লীজ ডক্টর রয়! আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমার এ প্রস্তাব নিতান্ত জীববিজ্ঞানের দৃষ্টি থেকে। পরম করুণাময় এ সৃষ্টিতে আলোর পাশে অন্ধকার, কালোর পাশে সাদা সৃষ্টি করেছেন। তাই আমি চাই—নূতন সৃষ্টিতেও সেই আলো-ছায়ার অপূর্ব মিলন-মাধুর্য সৃষ্ট হোক। ওয়াম্বাসী কালো, ডরোথি সাদা। পরের ধাপে আমরা মেন্ডেলের থিয়োরি অনুযায়ী সাদা ও কালো দুজাতেরই সন্তান পাব। তুমি—ডক্টর রয়, তুমি হাজার চেষ্টা করলেও ডরোথির সাহায্যে আগামী দুনিয়ায় সেই আলো-ছায়ার বৈচিত্র্য আনতে পারবে না। ওয়াম্বাসী পারবে!

বব্‌ বলে : কিন্তু ডরোথি তো গিনিপিগ নয়, তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথাও—

বাধা দিয়ে ওয়াম্বাসী বলে, মাপ করবেন স্যার, বিষয়টা এমন কিছু জরুরি নয় যে এখনই তার চূড়ান্ত ফয়সালা দরকার। তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করলে ভাল হয়। প্রথম কথা, আপনি কি এখনও মনে করেন—আর্থার ক্রুক্‌স্‌-কে জীববিজ্ঞানের মুখ চেয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হবে?

: না। নিশ্চয় নয়। ডক্টর বব্‌ রয়কে অতর্কিত হত্যার চেষ্টা করে সে আমার সহানুভূতি হারিয়েছে। তাকে বাঁচিয়ে রাখা মানে যে-কোন মুহূর্তে তোমাদের দুজনের মৃত্যুকে ডেকে আনা।

: তাহলে সে বিষয়ে আমাদের সচেষ্ট হতে হয়। এই সময় প্রফেসর আইনস্টোন, ডক্টর ব্রয়েড প্রভৃতিরা যদি থাকতেন—

বব্‌ বাধা দিয়ে বলে, ও সমস্যার একটা সম্ভাব্য সমাধান আমায় মাথায় এসেছে। রাজনীতির একটা

ঘোরপ্যাঁচ! তার আগে বলুন তো স্যার—সর্বাধিনায়কের মৃত্যু হলে এই রোবো দুনিয়ার সর্বাধিনায়ক কে হবেন? ব্যাটলার না চারশকুন?

বৃদ্ধ বলেন, সে কথা কেউ জানে না। সম্রাটও তাঁর উত্তরাধিকার-নির্বাচন করে রাখেননি। একবার তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। বাঁচবার আশা ছিল না। সেই সময় তাঁর মৃত্যুশয্যা ঘিরে ছিলাম আমরা শুধু চারজন—ব্রয়েড, আমি, চারশকুন আর ব্যাটলার। রুডলফ্ সম্রাটকে প্রশ্ন করল, মহামহিম! আপনি বলে যান—আপনার অবর্তমানে কে পৃথিবীপতি হবে?

বব্ সাগ্রহে বলে, তিনি কী বললেন?

বৃদ্ধ জবাব দেবার পূর্বেই ওয়াম্বাসী বলে, আমি সেটা জানি। সম্রাট জবাবে বলেছিলেন "Whoever is the strongest !"—যার ক্ষমতা সব চেয়ে বেশি।

গারউইন অবাক হয়ে বলেন, কী আশ্চর্য! তুমি কেমন করে জানলে?

ওয়াম্বাসী বলে, সহজে। ইতিহাস পড়ে। লেকজান্ডা যাঁর ছায়া দিয়ে গড়া সেই বিশ্ববিজয়ী আলেকজান্ডার যখন ব্যাবিলনে মৃত্যুশয্যায় শায়িত তখন তাঁর প্রধান সেনাপতি তাঁকে ঐ প্রশ্নটিই জিজ্ঞাসা করেছিল এবং সেকেন্দার শাহ্ তাঁর শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে বিশ্ব-রাজনীতির শেষ কথাটাই বলে গিয়েছিলেন : Whoever is the strongest !

বব্ খুশি হয়। বলে, তার মানে কে গদিতে বসবে তা অনিশ্চিত। সেক্ষেত্রে আমার কূটকৌশলটা কাজে লাগবে মনে হয়। শোন্ নিগার, আমার পরামর্শটা।

এসব বিষয়ে বব্ রয়ের মাথা খোলে ভাল। তার পরিকল্পনাটা এই রকম :

রুডল্ফ্ ব্যাটলারকে কব্জা করতে হলে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে। সেই দ্বিতীয় কাঁটাটা অনিবার্য ভাবে ইস্টার্ন কমান্ডের সৈন্যাধ্যক্ষ মিস্টার চারশকুন। কী ভাবে? ব্যাটলার শেষ লড়াইয়ের জন্য যে ভি-টু রকেটটা লুকিয়ে রেখেছে, সেটা চারশকুনের হাতে তুলে দেওয়া—এই শর্তে যে, সে অনার্য-থিয়োরিতে-আটক গামা-পণ্ডিতদের ছেড়ে দেবে। চারশকুন যদি সম্রাটের কাছে লুক্কায়িত গডফাদারকে হাজির করতে পারে, তাহলে সম্রাট নিশ্চয় ব্যাটলারের ওপর খাপ্পা হয়ে যাবেন। স্বয়ং সর্বাধিনায়কের চোখের আড়ালে এত বড় ব্যাপারটায় লিপ্ত হওয়া ব্যাটলারের অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে।

ওয়াম্বাসী ববের পিঠে একটা বিরাশি-সিক্কার থাপ্পড় মেরে বলে, দারুণ বুদ্ধি করেছিস তো! এমন সহজ সমাধানটা আমার মাথাতেই আসেনি।

: আসবে কোথা থেকে? দিনরাত ইতিহাস-সাহিত্য পড়লে এসব কূটকচালে বুদ্ধি কারো মাথায় আসে? পাণ্ডিত্য দিয়ে তোর মগজটা যে ঠাসা!

বৃদ্ধ গারউইন বলেন, ডক্টর ওয়াম্বাসী! একটা কথা। গামা-পণ্ডিত কজনকে মুক্ত করে দিতে যদি চারশকুন রাজি হয় তবেই শুধু তাকে গডফাদারের খবরটা জানাবে।

ওয়াম্বাসী বলে, সে আর বলতে!

দশ

বব্ রয়ের পরিকল্পনাটা অদ্ভুতভাবে সার্থক হল।

ভি-টু রকেট গোপনে তৈরি হচ্ছে, সর্বাধিনায়কের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে ভি-টু রকেট তাঁর ওপর বর্ষিত হতে পারে এমন আশঙ্কা চারশকুন মশায়ের বরাবরই ছিল। তিনি শুধু জানতেন না—ভি-টু রকেটটা কী জাতের, কতটা শক্তিশালী এবং কোথায় সেটা গোপনে তৈরি হচ্ছে। ওয়াম্বাসী যখন জানালো সে সমস্ত তথ্যটা জানাতে পারে, তখন চারশকুন চুরুট ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বলেন, আমি আপনার সব শর্ত মেনে নেব, যদি আমাকে সেটার সন্ধান দিতে পারেন!

এর পরেই অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ঘটে গেল কতকগুলি ঘটনা। যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি আমূল বদলে গেল। অর্থার ক্রুক্স্ কোনো একটা ভাঙা বাড়ির ধ্বংসস্তূপে আশ্রয় নিয়েছে—প্রচুর গোলাবারুদ নিয়ে

যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, এ খবর ওঁরা জানতেন—জানতেন না, ক্রুক্‌স্‌-এর গোপন ঘাঁটিটা কোথায়। ব্যাটলারের গোপন গেস্টাপো বাহিনী তন্নতন্ন করে খুঁজছে সেই গোপন ঘাঁটিটা। এদিকে ওয়াম্বাসীর নির্দেশমত চারশকুন আবিষ্কার করলেন গডফাদারকে। সম্রাট লেকজান্ডাকে সব কথা খুলে বললেন। সম্রাট তপ্ত-তৈলে নিক্ষিপ্ত বার্তাকুর মতো হস্তপদাদি সঞ্চালনে উষ্মা প্রকাশ করলেন। গডফাদার জীবিত—অথচ ব্যাটলার-ব্যাটা সে খবর তাঁর কাছে গোপন রেখে মিথ্যাপ্রচার চালাচ্ছে, এ সংবাদে তিনি একেবারে অগ্নিশর্মা। তৎক্ষণাৎ আদেশজারি করলেন—ব্যাটলারকে গ্রেপ্তার করে আন!

এর চেয়ে আনন্দের কথা কিছু হতে পারে না ডিফিটস্টোন চারশকুনের কাছে। সদলবলে তিনি রওনা হলেন ব্যাটলারকে গ্রেপ্তার করে আনতে। কিন্তু রুডলফ্‌ ব্যাটলার বৃথাই তাঁর গেস্টাপো বাহিনীকে এতো যত্নে পোষেননি। তিনি ঠিক সময়েই খবর পেলেন এবং রোবো সাম্রাজ্যের একমাত্র হেলিকপ্টারটি চড়ে কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর সমেত তিনি গিয়ে আশ্রয় নিলেন আর্থার ক্রুক্‌স্‌-এর বাঙ্কারে। সেখান থেকেই তিনি শেষ যুদ্ধ লড়বেন ঐ অনার্যদের বিরুদ্ধে। আর কেউ না জানলেও ব্যাটলারের গেস্টাপো বাহিনী ইতিমধ্যে সন্ধান পেয়েছিল আর্থারের গোপন ঘাঁটির। জনশ্রুতি—ব্যাটলার তাঁর বাঙ্কারে আশ্রয় নেওয়ার সময় একটি বীটা-সুন্দরীকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন।

ফলে যুদ্ধের প্রকৃতিটা বদলে গিয়েছে।

তা যাক, কিন্তু ওয়াম্বাসী অবাক হলো অন্য একটা কারণে। গডফাদারের গোপন আবাসে সে যখন উপস্থিত হল তখন আর সকলকেই খুঁজে পেল, পেল না একজনকে! তার ডেস্‌ডিমোনাকে।

হ্যাঁ, ডেস্‌ডিমোনা। গতকাল রাত্রে সে তার আবিষ্কারের নতুন নামকরণ করেছিল। ডরোথি নয়, ডেস্‌ডিমোনা—অপূর্ব সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও যে ভালবেসেছিল কৃষ্ণকায় ওথেলোকে।

শুধু ওর ডেস্‌ডিমোনা নয়, বব্‌ রয়ও সারাদিন-সারারাত নিরুদ্দেশ।

পরদিন বব্‌ ফিরে এসে বললে, হাই নিগার! তোর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছে। মেয়েটা উন্মাদিনী নয়—সুস্থমস্তিষ্কা!

: কার কথা বলছিস্‌? ডরোথি?

: না। প্রাক্তন ডরোথি। এখন ওর নাম—'জুলিয়েট।'

: জুলিয়েট! নামটা তুই দিয়েছিস?

: হ্যাঁ। কাল সারারাত তো তার কাছেই ছিলাম। দারুণ মেয়েটা! এক্সকুইজিট, ভলাপচুয়াস্‌ এ্যান্ড সেক্সি!

ওয়াম্বাসী মুহূর্তে সংযত হয়। বলে, তাহলে তুই অন্তত রোমিও-জুলিয়েটটা পড়েছিস্‌!

: পড়িনি। টি-ভি-তে দেখেছি। মাই ডিয়ার নিগার! আয়, আমরা ডিউটিটা ভাগাভাগি করে নিই। সারা দুনিয়াটা তোকে দিয়ে দিলাম—আমার ভাগে রইল শুধু জুলিয়েট। রাজি?

ওয়াম্বাসী ম্লান হেসে বললে, কিন্তু তোর জুলিয়েট তো গিনিপিগ নয়, তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথাও—

বব্‌ ওর পিঠে একটা থাপ্পড় মেরে বললে, সে আর তোকে ভাবতে হবে না, নিগার! তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা না জেনেই কি বলছি? ওর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তোর কথাও হয়েছে—আমরা দুজনে স্থির করেছি—ঐ ক্রুক্‌স্‌ নিগারটাকে শেষ করে তোকে গডফাদারের সিংহাসনে বসাবো। তারপর আমরা দুজনে চলে যাব—হনিমুনে। মাঝে মাঝে তোর রাজ্যে বেড়াতে আসব।

ওয়াম্বাসী বলে, আমার কথা সে কী বলেছে?

: সে আর তোর শুনে কাজ নেই ভাই। কিন্তু জুলিয়েটকে আমি দোষও দিতে পারি না। আর্থার ক্রুক্‌সের ব্যবহারে গোটা নিগ্রো জাতটার ওপরেই সে ক্ষেপে আছে!

ডক্টর ব্রয়েড, আইনস্টোন প্রভৃতি গামা-পণ্ডিতেরা এই সময় প্রবেশ করায় ওদের জনান্তিক আলাপচারিটা স্থগিত রাখতে হল।

*　　*　　*

প্রথমে অবসাদে মনটা ভরে গিয়েছিল। পরে ভেবে দেখেছে—এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। বব্ রয় যাই বলুক—সাদা-কালোর পার্থক্যটা একবিংশতি শতাব্দীতেও আছে। প্রকাশ্যে কেউই সেটা মানতে চায় না, মুখে স্বীকার করে না—কিন্তু ঐ সাদা চামড়ার মেয়েটি জাতিগতভাবে নিগ্রোদের ঘৃণা করে। তাহলে গতকাল সে কেন অমন ব্যবহার করল? খুব স্বাভাবিক। দীর্ঘ দীর্ঘ দিন প্রকৃতির তাড়নায় মেয়েটি ছটফট করছিল। তার প্রকৃতি তো অজানা নয়! তাই দীর্ঘ-উপবাস-অন্তে খাবারের পাত্রটা সামনে পাওয়া মাত্র সে গোগ্রাসে গিলেছিল! একটা তীব্র অপমানে ওয়াম্বাসী নিজেকে অপবিত্র মনে করছিল। বোধ করি এমন মানসিক অবস্থাতেই মানুষ আত্মহত্যা করে!

ওয়াম্বাসী তা করবে না। কিছুতেই নয়। কীসের অপমান? কীসের বঞ্চনা? তার তো লজ্জা পাওয়ার কোনো কারণ ঘটেনি। তার কী অপরাধ? আমি ভালোবাসতে পেরেছি, আমি ভালোবেসেছি—আমি তাতেই ধন্য। তুমি পারনি, তুমি কামনার পঙ্কে কর্দমলিপ্ত হয়ে মিথ্যার অভিনয় করেছ সে তোমার দুর্ভাগ্য!

কিন্তু আশ্চর্য! সে-রাত্রে তো ও-কথা মনে হয়নি। একবারও সন্দেহ হয়নি—ডেস্‌ডিমোনা অভিনয় করছে! ওয়াম্বাসী ভাবুক-প্রকৃতির; তার মনে হল—হয়তো মেয়েটি অভিনয় আদৌ করেনি। ওয়াম্বাসী তার রোমান্টিক ধ্যান-ধারণায় প্রেম জিনিসটাকে যে-চোখে দেখে, ঐ মেয়েটির দৃষ্টিভঙ্গিতে হয়তো প্রেমের সেই সংজ্ঞা নয়। ওয়াম্বাসী রক্ষণশীল নিগ্রো পরিবারের সন্তান। ওর বাপ ছিল পাদ্রী—রোমান ক্যাথলিক নয়, প্রোটেস্টান্ট। ওদের পরিবারে বা সমাজে বহুবিবাহ, পরীক্ষামূলক বিবাহ বা গোষ্ঠিবিবাহ চালু হয়নি। তবু একবিংশতি শতাব্দীর মানুষ হিসাবে সে সবগুলি প্রথার সঙ্গেই পরিচিত—পলিগ্যামি, ট্রায়াল-মারেজ এবং গ্রুপ-ম্যারেজ! অতি-আধুনিক মার্কিন সমাজে সেগুলির বহুল প্রচলন দেখেছে। সমাজের স্বীকৃতি-মতেই এক পুরুষ দুটি রমণীর স্বামী হতে পারে; এক রমণীর দুটি বা তিনটি স্বামী থাকতে পারে। এমনকি একই ক্লাবের সভ্য-সভ্যা পরস্পরের বিধিসম্মত স্বামী-স্ত্রী হতে পারে। জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে সাফল্যমণ্ডিত হবার পর এই নতুন চেতনাটা এসেছে—সমাজ এভাবে নানা জাতের সমস্যাকে এড়িয়ে যেতে পারছে।

পূর্ব পূর্ব শতাব্দীতে মানুষের জীবন ছিল—গৃহকেন্দ্রিক। খোঁটায়-বাঁধা গরু যেমন তার খুঁটিকে কেন্দ্র করে সামান্য পরিসরে বিচরণ করে—সে আমলের মানুষও তেমনি ঐ গৃহকেন্দ্রিক জীবনচক্রের পরিক্রমায় অভ্যস্ত ছিল। কর্মান্তে ফিরে আসত নিজগৃহে, সেখানে তার বধূ পীটর ডি হুখের চিত্রের সেই প্রোষিতভর্তৃকা ঘরনির মতো তার প্রত্যাবর্তন-পথের দিকে দৃষ্টি মেলে প্রতীক্ষা করত, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা—'run to lisp their sire's return, or climb his knees the envied kiss to share'—গৃহ-প্রত্যাগত বাপের কোলে উঠে চুমু খাবার প্রতিযোগিতায় হুড়োহুড়ি করত। তারপর দুনিয়া বদলে গেল। কেন্দ্রস্থলের সেই খুঁটিটা গেল হারিয়ে। জীবনে যতির স্থান নিল গতি—মানুষ ঘুরতে থাকে ক্রমাগত, শহর থেকে শহরে, এ-মহাদেশ থেকে সে-মহাদেশে। গ্রহের ফেরে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। ফলে, তার জীবনযাত্রার মানটাই গেল বদলে : গৃহ যার নেই, তার আবার গৃহিণী কী? মাসের ত্রিশটা দিন সে বাস করে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন হোটেলে, ক্লাব-রুমে, অফিসে, গেস্ট-রুমে বা বাঙলোয়। তার সংসারটাও গতিমুখর হতে বাধ্য। ফলে 'ঐকান্তিক প্রেম' শব্দটা তার ব্যঞ্জনা হারালো। তাতে দোষ ধরল না কেউ। মানুষ হল ক্ষণিকবাদী। প্রতি মুহূর্তই সত্য—প্রতিটি মুহূর্তের আনন্দের মূল্যায়নে। আজ যার বাহুবন্ধনে রাত কাটালে, কাল যদি নতুন দুটি বাহুর বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সময়ে সেই অতীতকে ভুলতে না পার—তবে তুমি ব্যাক্-ডেটেড, তুমি পড়ে থাকবে পেছনে। তুমি হবে হতভাগ্য।

মিস্ মার্স সেই মানসিকতা নিয়েই গড়ে উঠেছে। সেও ক্ষণিকবাদিনী; সে ডেস্‌ডিমোনা নয়, জুলিয়েটও নয়, সে—সে! ওয়াম্বাসী যদি তার সংস্কারাচ্ছন্ন মন দিয়ে, তার নিজস্ব মাপকাঠি নিয়ে তাকে মাপ করতে যায় তবে ওয়াম্বাসীরই ভুল। মেয়েটি দায়ী নয়।

কিন্তু, তবু.....! না, তবু কিছু নেই। ওয়াম্বাসী মনকে শক্ত করে।

পরদিন বব্ নিজেই এসে বললে, আয়াম সরি নিগার! কিন্তু দোষ শুধু আমার একার নয়। তুই নিজেও অপরাধী।

: কী ব্যাপার? তুই 'সরি'ই বা হচ্ছিস্ কেন? আমিই বা অপরাধটা কী করলাম?

: তুই সব কথা আমাকে খুলে বলিসনি কেন?

: 'সব কথা' মানে?

: ওথেলো আর ডেস্‌ডিমোনার গল্প?

ওয়াম্বাসী জোর করে হেসে ওঠে। বলে, ও, এই কথা! তা তোকে কে বলল? তোর জুলিয়েট?

: হ্যাঁ, আমার জুলিয়েট আর তোর ডেস্‌ডিমোনা!

ওয়াম্বাসী প্রফুল্লতা বজায় রেখে বলে, না রে বাস্টার্ড! ভুল বললি, ও শুধু তোর জুলিয়েটই। এক রাতের জন্য ডেস্‌ডিমোনার ভূমিকায় অভিনয় করেছিল।

বব্ বললে, না। ডরোথি সব কথা আমার কাছে স্বীকার করেছে। আমিও ব্যাপারটা ভেবে দেখলাম। আমার গতকালকার প্রস্তাব আমি প্রত্যাহার করছি।

: তার মানে?

: তার মানে সৌরলোকের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীকে আমি একা দাবি করব না।

: এটা তো ঠিক 'প্যারিস'-এর মতো সিদ্ধান্ত হল না।

: প্যারিস! প্যারিস কে?

: যার কাছে হেরা, এথেনা আর আফ্রেদিতি এসেছিল সুবর্ণগোলক সমস্যার সমাধানের খোঁজে!

: কী বলছিস মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না?

: কী করব, আমিও যে তোর কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না? তুই কী করতে চাস্?

: আর্থার ক্রুক্‌স্ যা চেয়েছিল! আমরা দুজনেই ওকে বিয়ে করব। ও দ্বৈতসত্তায় আমাদের ঘরনি হবে। তোর চোখে ও হবে ডেস্‌ডিমোনা, আমার চোখে জুলিয়েট।

ওয়াম্বাসী বলে, এককথাই বার বার বলছি বাস্টার্ড! ডরোথি গিনিপিগ নয়; তার নিজেরও ইচ্ছে-অনিচ্ছে থাকতে পারে।

: তার সঙ্গে আমি কথা বলেছি, সে রাজি।

: আমি বিশ্বাস করি না।

: বেশ তাকে ডাকছি। সে নিজমুখেই স্বীকার করবে।

ওরা দুজন জানত না—একই নাটক একইভাবে রূপায়িত হচ্ছে; অর্থাৎ ওদের কথোপকথন দ্বারের বাইরে দাঁড়িয়ে ডরোথি এতক্ষণ সবই শুনেছে। এতক্ষণে ঘরে এসে বললে, কী ব্যাপার? আমাকে ডাকছিলে?

ওয়াম্বাসী একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ঐ অনিন্দ্যকান্তি নারীমূর্তিটির দিকে। তার সপ্রতিভতা দেখে মনে হয় না—সে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত। ওয়াম্বাসী কৃত্রিম হাসি হেসে বলে, এস ডরোথি। পাগলটা কী বলছে শোন!

মেয়েটি বললে, আবার ডরোথি কেন? শোননি, আমার পুনর্জন্ম হয়েছে! এখন আমার দ্বৈতসত্তা—ডেস্‌ডিমোনা-কাম-জুলিয়েট।

ওয়াম্বাসী বলে, তুমি কি সত্যই ঐ দ্বৈতসত্তায় অভিনয় করতে রাজি?

'অভিনয়' শব্দটার তির্যক অর্থ মেয়েটিকে বিদ্ধ করল না। বললে, উপায় কী? আমি সেনসিব্‌ল্। তোমরা দুজন পুরুষ, আমি একা। তাছাড়া ডক্টর ব্রয়েড এবং গার্লস্ গারউইন চান, আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মা হই। তোমাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যাওয়া উচিত।

খিল্‌খিলিয়ে মেয়েটি হেসে ওঠে। ওয়াম্বাসীর মনে হল—অশ্লীল! ঐ হাসিটা নিতান্ত অশ্লীল। পরক্ষণেই তার মনে হল—দোষ ঐ মেয়েটির নয়, তার নিজের সংস্কারাচ্ছন্ন মনের। 'মা হওয়া' জিনিসটা তার মানসিকতার সৌকুমার্যে যে ব্যঞ্জনা বহন করে—ঐ মেয়েটির ধারণায় সেটা নেই। ওর

কাছে 'মাতৃত্ব'একটা জৈবিক সত্য। গারউইনের মতো ঐ মেয়েটিও বোধ করি ভাবে—ওর 'মা' হওয়ার অর্থ 'হোমো-স্যাপিয়ান্-সেপিয়ান্স' নামক স্পেসিস্টাকে ডাইনোসর, ম্যামথ বা ডোডো পাখির দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা করা।

ওয়াম্বাসী বলে, একটা কথা বল ডরোথি—তুমি এ প্রস্তাবে রাজি হচ্ছ কেন? মূল উদ্দেশ্যটা কী? গার্লস গারউইনকে সাহায্য করা—না আমার প্রতি করুণাবশে?

: তুমি আমার প্রতি অবিচার করছ ওথেলো। এবং সেটা করছ, যেহেতু তুমি একবিংশতি শতাব্দীর মানুষ হয়েও গত শতাব্দীর ধ্যান-ধারণায় নিজেকে আবদ্ধ করে রেখেছ। সতীত্বের সেই মর্বিড ধারণাটাকে তুমি আঁকড়ে ধরে আছ!

ওয়াম্বাসী বলে, না। তুমিই একদিন বলেছিলে—কোনো নিগারের বিছানায় শোয়ার চেয়ে মৃত্যুই তোমার কাছে কাম্য।

: বলেছিলাম। কিন্তু তার পরে স্বেচ্ছায় তোমার সঙ্গে শুয়েছি। শুইনি?

: স্টপ ইট! চীৎকার করে ওঠে ওয়াম্বাসী। সেই অনুরাগঘন মুহূর্তটির উল্লেখমাত্রে যেন ক্ষেপে যায় লোকটা। সেটা এমন একটা অনুভূতি, যা সে ওর নিকটতম বন্ধু ববের সামনেও আলোচনা করতে প্রস্তুত নয়।

ডরোথি শুধু বলে, শুধু 'স্টপ ইট'! 'স্টপ ইট য়ু বীচ' নয়?

ওয়াম্বাসী উঠে দাঁড়ায়। ডরোথিকে অস্বীকার করে বন্ধুকে বলে, বব্! আমি রাজি নই।

বব্ হেসে বলে, তোর সংস্কারটাই বড় হলো?

: হয়তো তাই। স্থানত্যাগ করে ওয়াম্বাসী।

* * *

ব্যাপারটা কিন্তু ওখানেই মিটল না। একটু পরে ওর সঙ্গে দেখা করতে এলেন দুজন গামা-পণ্ডিত। ডক্টর ব্রয়েড এবং গারউইন। ব্রয়েড বললেন, ডক্টর ওয়াম্বাসী—কিছু মনে করবেন না, ব্যাপারটা যদিও নিতান্তই আপনার ব্যক্তিগত, তবু জীববিজ্ঞানের মুখ চেয়ে আমরা দুজন সেটা নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছি।

ক্লান্ত দুচোখ মেলে ওয়াম্বাসী বলে, কী বিষয়ে?

: ডক্টর বব্ রয় এবং ডরোথি আমাদের সব কথা খুলে বলেছেন। আমাদের মনে হচ্ছে আপনি ভুল করছেন, অন্যায় করছেন। ববের প্রতি, ডরোথির প্রতি, জীববিজ্ঞানের প্রতি এবং সর্বোপরি আপনার নিজের প্রতি!

ওয়াম্বাসী বলে, এ কথা কেন বলছেন?

: আপনি যদি একটা ভুল সংস্কারবশে—

: ভুল সংস্কার! নর-নারীর ঐকান্তিক প্রেমকে আপনারা কুসংস্কার মনে করেন?

: 'কু' উপসর্গটা আপনার লাগানো। আমরা ওটাকে শুধু ভ্রান্ত বলেছি।

: কেন ভ্রান্ত?

: ভেবে দেখুন। 'নরনারীর ঐকান্তিক প্রেম' যেটাকে বলছেন, সেটা আসলে কী? নিতান্ত জৈবিক প্রয়োজনে একটা মনগড়া সিদ্ধান্ত—যে সিদ্ধান্তের ওপর গড়ে উঠেছে হাজার বছরের সাহিত্য-শিল্প-কাব্য!

: মনগড়া সিদ্ধান্ত?

: নয়? মানুষের ইতিহাসে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ব্যবস্থা বেশিদিনের নয়, তিন-চার হাজার বছরের। তার পূর্বে কয়েক লক্ষ বছর ধরে চালু ছিল মাতৃতান্ত্রিক সমাজ। তখন ঐ 'নরনারীর ঐকান্তিক প্রেম' বলে কিছু ছিল না। পরবর্তী যুগেও—লক্ষ্য করে দেখুন, প্রতিটি দেশে, প্রতিটি কালে পুরুষের ঐকান্তিকতাকে যতটা জোর দেওয়া হয়েছে নারীর ঐকান্তিকতাকে তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব

দেওয়া হয়েছে। তাই 'সতীত্ব' বা chastity নামে একটা শব্দ আবিষ্কৃত হল প্রায় প্রতিটি ভাষায়—যার সমার্থক পুরুষের ঐকান্তিকতাব্যঞ্জক কোনো শব্দ সৃষ্টি হল না। কেন? কারণ পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পিতৃত্বটা সন্দেহাতীতরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। ভেবে দেখুন ডক্টর ওয়াম্বসী—'সতীত্ব' ধারণাটা সত্যই স্বর্গীয় কিছু নয়, নিতান্ত একটি কেজো ভূমিকার ওপর দাঁড়িয়ে আছে সেটা। একবিংশতি শতাব্দীতে সমাজ পিতৃতান্ত্রিক থেকে রাষ্ট্রতান্ত্রিক হতে বসেছিল। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে মানবসভ্যতা যদি এভাবে ধ্বংস হয়ে না যেত, তাহলে দেখতেন অচিরেই সমাজ পুরোপুরি রাষ্ট্রতান্ত্রিক হয়ে গেছে। তখন ছেলেমেয়েকে মানুষ করা, তাকে লেখাপড়া শেখানো, নানান বৃত্তিতে শিখিয়ে তোলার পূর্ণ দায়িত্ব নিতো রাষ্ট্র। বস্তুত সমাজ প্রায় সেইরকমই হয়ে গিয়েছিল। এখন পিতৃত্ব জিনিসটার আর সে দাম ছিল না। ফলে, ঐকান্তিক প্রেম বলেও এখন আর কিছু স্বাভাবিক ভাবে থাকতে পারত না। আপনার মতো সংস্কারাচ্ছন্ন কিছু লোক হয়তো জোর করে সেটা কিছুদিন আঁকড়ে ধরে থাকবার চেষ্টা করত। কিন্তু বিবর্তনের তাগিদে একদিন 'সতীত্ব' শব্দটা শুধু অভিধান-আশ্রয়ী হয়ে যেত, আদিম যুগের ডাইনোসরের জীবাশ্ম যেমন টিকে ছিল শুধু মিউজিয়ামে।

ওয়াম্বাসী রুখে ওঠে, একটি স্ত্রীলোকের পক্ষে দুজন পুরুষকে সমানভাবে ভালোবাসা সম্ভব?

: প্রশ্নটাই অবৈধ। একটি স্ত্রীলোকের পক্ষে দুটি সন্তানকে সমানভাবে ভালোবাসা সম্ভব কিনা এ প্রশ্ন তোলার মত। হয়ত বড় ছেলেটিকে সে ভালবাসে—তার ওপর নির্ভর করে বলে, সে হাতে হাতে সাহায্য করে বলে; আর ছোটটিকে ভালোবাসে সে ন্যাওটা বলে, পেটুক বলে, দুষ্টুমি করে বলে। দুটি সন্তানের মধ্যে সে কোনটিকে বেশি ভালোবাসে তা সে নিজেই জানে না। সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে ভেবে দেখুন—দুটি স্বামীর ক্ষেত্রেও তা হতে পারে। মেয়েটি হয়তো তার প্রথম স্বামীকে ভালোবাসে তার পাণ্ডিত্যের জন্য, তার সঙ্গে ঠাট্টা-রসিকতা-বাকচাতুর্যের খেলায় সঙ্গী হতে পেরে। তার গায়ের রঙ কালো হওয়া সত্ত্বেও। আবার দ্বিতীয়টিকে সে সমান ভালোবাসতে পারে তার মূর্খামি সত্ত্বেও তার দুর্ধর্ষ বেপরোয়া ভঙ্গিমার জন্য। কাকে যে বেশি ভালোবাসে এ প্রশ্নটাই ওঠার কথা নয়!

ওয়াম্বাসী এবার জবাব দিতে পারে না। বোঝে, এতক্ষণ নৈর্ব্যক্তিক উদাসীনতায় যে আলোচনাটা চলছিল—ডক্টর ব্রয়েড তাঁর শেষ উদাহরণে সেটাকে 'বিশেষ' করেছেন।

ডক্টর ব্রয়েড বলেন, তাই আপনাকে অনুরোধ করব—সিদ্ধান্তে আসার আগে আর একবার বিবেচনা করে দেখুন। ডরোথির সঙ্গে কথা বলে বুঝে নিন পরিস্থিতিটা।

: বেশ তাই নেব।

: তাহলে ওকে ডাকি?

: কাকে?

ডাকতে হল না। ডরোথি নিজে থেকেই প্রবেশ করল ঘরে এবং সঙ্গে সঙ্গে দুই গামা-পণ্ডিত বিদায় নিয়ে নির্গত হলেন।

ওয়াম্বাসী বললে, ও! এটা তাহলে তোমাদের একটা ষড়যন্ত্র?

ডরোথি ঠোঁট উল্টে বললে, ষড়যন্ত্রই তো! তোমাদের মতো গবেটের মাথায় সহজ কথা তো সহজ ভাবে ঢুকবে না। তাই গজাল মেরে ঢোকাবার জন্য দুই গামা-পণ্ডিতকে অগ্রদূত করে পাঠিয়েছিলাম।

: কিন্তু সহজ কথাটা কী, ডরোথি? তুমি কি পারবে আমাদের দুই বন্ধুকে সমান ভাবে ভালোবাসতে?

: এখনই শুনলে না—তোমার ও প্রশ্নটাই অবৈধ। ভালোবাসার ভাগাভাগি হয় না। তোমাকে তোমার জন্য ভালোবাসি—ওকে ওর জন্য। তোমাদের দুজনের সঙ্গে রাত কাটাবার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে ডক্টর। ওথেলোকে ভালোবাসি তার বাকপটুতার জন্য—ঠিক ডেস্‌ডিমোনার মত; আর রোমিওকেও ভালোবাসি তার প্যাশনেট লাভের জন্য।

ডরোথি টের পেল না—ওয়াম্বাসী একটা বেদনা বোধ করল। বললে, ঠিক আছে ডরোথি, আমাকে একটু চিন্তা করতে দাও। তুমি এখন বরং এস।

মেয়েটি উঠে দাঁড়ায়। বলে, তুমি এখনও আমাকে 'ডরোথি' বলে ডাকছ। আমাকে চলে যেতেও বললে। আমার সঙ্গটাই এখন ভাল লাগছে না তোমার। বেশ, আমি চলে যাচ্ছি। তবে যাবার সময় একটা কথা বলে যাই। তুমি এ্যাস্ট্রনট—তাই হয়তো কথাটা বুঝবে; পৃথিবী থেকে অনেকে মনে করে চাঁদের এক পিঠে অন্ধকার। কথাটা ঠিক নয়। চাঁদের দুটো পিঠই সূর্য প্রণাম করে পর্যায়ক্রমে। একবার এ-পিঠ, একবার ও-পিঠ।

ওয়াম্বাসী হেসে বলে, ঠিক এই কথাটাই তোমাকে বলতে চাই ডরোথি। কাব্যে, সাহিত্যে চাঁদ যে অনন্যা তা সে ঘুরে-ফিরে সূর্য প্রদক্ষিণ করে বলে নয়—সব গ্রহ-উপগ্রহই তা করে; চাঁদের মহিমা তার প্রেমের জ্যোৎস্নায়—যে প্রেম পৃথিবীর প্রতি একমুখী!

ডরোথি বললে, আমারই ভুল! তুমি এ্যাস্ট্রনট নও,—তুমি কবি! ওথেলোর মতো বাকপটু!

* * *

নির্জন ঘরে বিছানায় পড়ে ছটফট করছিল ওয়াম্বাসী। ওর ঘরে দুটি খাট। দুই বন্ধুতে পাশাপাশি শোয়। আজ রাত্রে পাশের খাটটা খালি পড়ে আছে। ওয়াম্বাসী জানে—কেন? রোমিও তার জুলিয়েটের ঘরে রাত কাটাচ্ছে। ওয়াম্বাসী উঠে বসে। আলোটা জ্বালে। রাত একটা। একগ্লাস জল খায়। মুখে-মাথায় জলের ছিটে দেয়। ঘুম আসছে না। আসবেও না। যতক্ষণ না সে তার ঐ একটা গলে যাওয়া পচে যাওয়া কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারছে ততক্ষণ এভাবেই তাকে ছটফট করতে হবে। রাতের পর রাত। বাকি জীবন। তাই বলে একটা অসত্যের সঙ্গে, একটা মিথ্যাচারের সঙ্গে আপোস করবে? বাঃ! অসত্য আবার কোনটা? মিথ্যাচার কাকে বলি? মিথ্যা তো ওর কুসংস্কারটুকুই।

মনে পড়ছে—অনেকদিন আগেকার কথা। দ্বৈত-বিবাহের প্রথম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাটার কথাটা। ও তখন নভোচারী হবার জন্য ট্রেনিং নিচ্ছে। ওর দুজন বন্ধু ওকে নিমন্ত্রণ করেছিল। পল রজার্স আর ভিনসেন্ট উইলসন। ওরা দুজনে একই কোম্পানিতে কাজ করত। সেলস্‌ম্যান। পল বলেছিল, আজ আমাদের স্ত্রীর জন্মদিন। তুমি আসবে? ডিনারে দু-একটি বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেছি।

ওয়াম্বাসী অবাক হয়ে বলেছিল, তোমাদের স্ত্রীর জন্মদিন মানে? কার স্ত্রী?

খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠেছিল পল রজার্স। পার্শ্ববর্তী বন্ধুর দিকে ফিরে বলেছিল, ভিন্, এ কালো-আদমিটাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দাও! ওদের সমাজে এটার চল নেই।

ভিনসেন্ট বিরক্তি প্রকাশ করে বলেছিল, ও আবার কী কথার ছিরি! কালা-আদমি মানে? তুমি কিছু মনে করো না ওয়াম্বাসী, ব্যাপারটা হচ্ছে এডনা আমাদের দুজনেরই স্ত্রী।

ব্যাপারটা খাতাকলমে জানা ছিল—এমন বাস্তব প্রয়োগের সম্মুখীন হয়নি কখনো এর আগে; ওয়াম্বাসী সামলে নিয়ে বলেছিল, মানে প্লুরাল ম্যারেজ? বহুবাচনিক বিবাহ?

: হ্যাঁ। তুমি আসবে আমাদের স্ত্রীর জন্মদিনে?

প্রচণ্ড কৌতূহল হয়েছিল ওয়াম্বাসীর। এককথায় সে রাজি হয়ে যায়। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে! সকৌতুকে প্রশ্ন করে, কে সিনিয়ার? আগে কে বিয়ে করেছিল?

পল বলে, না, সিনিয়ার-জুনিয়ার নেই। তিনজনে একই দিনে বিবাহ করি।

ভিনসেন্ট হেসে উঠেছিল খিলখিলিয়ে। বলে, ব্যাপারটা ভারি মজার, জান? এডনা আমাদের দুজনের সঙ্গেই প্রেমপর্ব চালাচ্ছিল—পর্যায়ক্রমে ডেটিং করছিল। বেচারি টুইড্‌ল্‌ডাম আর টুইডল্‌ডির মধ্যে কাকে বেছে নেবে স্থির করতে পারছিল না। এদিকে আমরা দুজনে একই কোম্পানিতে কাজ করি। দুজন সহকর্মী হয়ে পড়লাম দুজনের প্রতিদ্বন্দ্বী! অথচ দুজনের পকেটের জোর এত কম যে, গোটা একটা বউ-পোষার ক্ষমতা নেই। শেষ পর্যন্ত তিনজনে মিলে এই সিদ্ধান্ত নিলাম। একই দিনে দুজনে বিয়ে করলাম এডনাকে। সব সমস্যার সমাধান হল—আমাদের দুজনেরই কাজ ঘুরে ঘুরে—মাসের মধ্যে পনেরো দিনই ট্যুর। আমরা ট্যুর এমনভাবে ফেলি, যাতে এডনা মাসের কোনদিনই স্বামীসঙ্গ থেকে বঞ্চিত না হয়।

: রেজিস্ট্রি-মতে বিয়ে করলে?

: না। রীতিমত চার্চে গিয়ে। চার্চ তো এটা মেনে নিয়েছে।

ওয়াম্বাসী কৌতূহল দমন করতে পারেনি। এরপর প্রশ্ন করেছিল, কিন্তু এডনা হনিমুনে গেল কার সঙ্গে?

: কেন? দুজনের সঙ্গেই।

আরও হাজারটা প্রশ্ন ওর মনে উদয় হয়েছিল। সৌজন্যবোধে প্রশ্ন করতে পারেনি। দুরন্ত কৌতূহলে ওদের স্ত্রীর জন্মদিনে যোগ দিতে গিয়েছিল। উপহার হিসাবে নিয়ে গিয়েছিল এক জোড়া সৌখিন গ্লাভ্স্। পল ওদের স্ত্রীকে বলেছিল—কালা-আদমি হলে কী হয়, বেটার বুদ্ধি আছে। দেখ, ও একটা উপহার আনেনি। এনেছে এক জোড়া। একপাটি গ্লাভস্ পলের বউ এর জন্যে, আর এক পাটি ভিনসেন্টের বউ-এর জন্য।

খুঁটিয়ে বুঝবার চেষ্টা করেছিল ওয়াম্বাসী—কিন্তু ওদের সে সুখের সংসারে কোনো ফাটল খুঁজে পায়নি। কী করে এটা সম্ভব? ওদের দু-তিনটি ছেলেমেয়েও আছে। জনান্তিকে পলকে জিজ্ঞাসা করেছিল—কোনটি কার?

পল খিলখিলিয়ে হেসে উঠেছিল। ভিনসেন্টের সম্মুখেই বলে উঠেছিল, এডনা, আমাদের বন্ধু কি প্রশ্ন করছে শোন! বলছে, কোনটা কার? তুমিই বলে দাও—কোন বাচ্চাটার বাপ কোন হতভাগা!

কান লাল হয়ে উঠেছিল ওয়াম্বাসীর।

এডনা—এডনা কী? এডনা রজার্স? না এডনা উইলসন? না, এডনা পার্কার বিবাহের পরেও কুমারী-জীবনের পৈতৃক উপাধিটা ব্যবহার করে। এডনা সহজভাবেই বলেছিল : সন্তান আমাদের। আমার, পলের এবং ভিনসেন্টের।

ঢং ঢং করে দুটো বাজল।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসে ওয়াম্বাসী। সে সিদ্ধান্তে এসেছে। পল, এডনা আর ভিনসেন্ট যদি দশ-বারো বছর আগে পেরে থাকে, তবে সেও পারবে। কেন পারবে না? এভাবে রাতের পর রাত বিছানায় ছটফট করার কোনো অর্থ হয়? সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠতে হবে তাকে।

তখনই উঠে পড়ে বিছানা থেকে। দরজা খুলে বেরিয়ে আসে। দুমদুম করে পা ফেলে চলে আসে ডরোথির ঘরে। সে-ঘরে এই এত রাত্রেও আলো জ্বলছে। ওয়াম্বাসী রুদ্ধদ্বারে কারাঘাত করে।

: হুস দ্যাট? ববের কণ্ঠস্বর।

: আমি ওয়াম্বাসী। দরজা খোল।

: জাস্ট এ মিনিট!

মিনিটতিনেক পরে বব্ রয় এসে দ্বার খুলে দেয়। তার ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। একটা স্লিপিং স্যুটের পায়জামা তার পরনে। ডরোথিকে দেখা যায়—তার পরিধানে কী আছে বোঝা যায় না। সে খাটে শুয়ে আছে। তার গলা পর্যন্ত একটা চাদর টানা। বব্ বলে, কী ব্যাপার? এত রাত্রে?

: আমি রাজি।

: রাজি? মানে?.....ও আই সী! তা সেটা তো কাল সকালেও বলতে পারতিস্।

ওয়াম্বাসী লজ্জা পায়। বলে, আয়াম সরি। ডিসটার্ব করলাম বোধ হয়। আচ্ছা চলি, গুড নাইট!

বব্ ওর হাত চেপে ধরে। বলে, চলি কী রে? তুই যখন রাজি তখন আর ও-ঘরে যাচ্ছিস কেন? ভেতরে আয়!

কেমন একটা বিবমিষার বেগে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে ওয়াম্বাসী। চোখ তুলে দেখে একবার ডরোথির দিকে। সে নির্বাক। না আবাহন, না বিসর্জন। ওয়াম্বাসী বলে, না। সে আমি পারব না। আমি যাই।

বব্ খোলামনেই ব্যাপারটা নেয়। বলে, বেশ। তবে যা। ঘুমোগে যা।

এগারো

পরদিন একে একে অনেকেই এসে ওয়াম্বাসীকে অভিনন্দন জানালেন। সদ্য-কারামুক্ত আইনস্টোন, ব্রয়েড প্রভৃতি। ওয়াম্বাসীর অজান্তে বব্ রয় সুখবরটা সকলকে জানিয়েছে। গামা-পণ্ডিতেরা সবাই সে অ্যানাউন্সমেন্ট শুনে খুশি। অনেক—অনেকদিন পরে একটা বিবাহ-উৎসব হচ্ছে। ওয়েডিং-পার্টি। যুদ্ধ চলা-কালে সেটা ঠিকমতো জমবে না—স্থির হয়েছে, যুদ্ধান্তে বিজয় উৎসবের অঙ্গ হিসাবে এই ত্রিকোণাকৃতি বিয়ের ভোজটা দেওয়া হবে। মিডলটন বলেছেন, তিনি এই বিচিত্র বিবাহ নিয়ে একটি সনেট রচনা করবেন, 'এ্যান ওড টু ডেস্‌ডিমোনা-কাম-জুলিয়েট'। বিটল্‌ফেন বিবাহ-রাত্রে একটি অর্কেস্ট্রা উপহার দেবেন—নিওট্রায়াঙ্গুলার-ঈডেন-সিম্‌ফনি'। দা-ভেংচি ওদের তিনজনের একটি চিত্র আঁকবেন : দ্যা হ্যাপী ফ্যামিলি! এমনকি গার্লস গারউইন পর্যন্ত স্থির করেছেন, তাঁর 'এ্যানিহিলেশন অব্ স্পেসিস্' গ্রন্থের পরিবর্তে লিখবেন : 'রেসারেক্‌শান অব স্পেসিস্'—মানব-প্রজাতির পুনর্জন্ম।

ওয়াম্বাসী কিন্তু একটা জিনিস কিছুতেই ভুলতে পারছিল না—এত লোকে তাকে অভিনন্দন জানিয়ে গেল; কিন্তু বিশেষ একজন একবারও তার কাছে এল না। সে কি তাহলে অন্তর থেকে এটা চায়নি? শুধু ববের অনুরোধে রাজি হচ্ছিল?

চিন্তাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে ওয়াম্বাসী সকলকে বললে, আপনারা একটা জিনিস ভুলে বসে আছেন—যুদ্ধটা এখনও শেষ হয়নি। রুডল্‌ফ ব্যাটলার আর আর্থার ক্রুক্‌স্ তাদের গোপন বাঙ্কারে কী ষড়যন্ত্র করছে তা আমরা জানি না। যে কোন মুহূর্তে অতর্কিত আক্রমণে ওরা আমাদের সমস্ত শুভ পরিকল্পনা মুহূর্তে ধূলিসাৎ করে দিতে পারে। তাদের গোপন আস্তানাটা যে কোথায় সে-খবরটুকু পর্যন্ত এখনও আমরা জানি না।

ডিফিটস্টোন চারশকুন বলেন, ওটা আপনার ভুল ধারণা ডক্টর ওয়াম্বাসী। ইতিমধ্যে আমাদের গুপ্তচর বাহিনী সন্দেহাতীতভাবে সে খবর জেনেছে।

: কোথায়? বব্ সোৎসাহে প্রশ্ন করে।

মিস্টার চারশকুন বলেন, মাফ করবেন, সম্রাটের বিনা অনুমতিতে সে গোপন তথ্যটা আমি আপনাদের জানাতে পারব না। সম্রাট এখনই আসবেন। আমরা তাঁরই প্রতীক্ষা করছি।

তাই এলেন সম্রাট। নকিব তাঁর নাম ঘোষণা করল। শিঙেদাররা শিঙে ফুঁকলো। সবাই যে যার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। সম্রাট ভারিক্কি চালে এসে বসলেন, সবাইকে বসতে বললেন। তারপর ওয়াম্বাসীর দিকে ফিরে বললেন, সম্রাটের অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি আপনারা বিবাহ করছেন জেনে। কই, বধূমাতা কোথায়?

ইস্টার্ন কমান্ডের জেনারেল বলেন, স্ত্রীলোকের পেটে কথা থাকে না। এখানে আমরা সামরিক বিষয়ে আলোচনা করব। তাই তাঁকে আনা হয়নি।

সম্রাট বলেন, অ। তা ভালই হয়েছে। লড়াই-কাজিয়ার ঝামেলা মিটে যাক; তার পর আমরা গ্র্যান্ড স্কেলে বিবাহ-উৎসবের আয়োজন করব। তোমার মনে আছে ওয়াম্বাসী? দারাউস ফৌত হবার পর আমি কেমন একখানা মহাবিবাহের ব্যবস্থা করেছিলুম— পারস্যের সেই সুসা-নগরীতে?

একজন গামা-পণ্ডিত বলেন, সম্রাট ভুল করছেন, ওয়াম্বাসী তখনো জন্মায়নি।

: তুমি থামো তো হে ছোকরা! ডক্টর ওয়াম্বাসী তোমার মতো পাগলও নয়, মূর্খও নয়—ও বইটই পড়ে। কী ওয়াম্বাসী!

ওয়াম্বাসী বলে, মনে আছে সম্রাট। আপনি আপনার সৈন্যদলের প্রত্যেককে একটি করে পারসিক রমণীরত্ন উপহার দিয়েছিলেন।

: তবে? এবং নিজে বিয়ে করেছিলুম দারাউসের কন্যাকে। ছুঁড়ি বড় ছিঁচকাঁদুনে! বাপের বীভৎস মৃত্যুর কথা কিছুতেই ভুলতে পারল না। আবার ওকে বিয়ে করার জন্য রোক্সানার মুখখানা হল

তোলোহাঁড়ি! রোক্সানাকে মনে আছে তো? সমরখন্দের রাজকন্যা—তাকে আগেই বে' করেছিলুম যে! সে এক মহা-বখেড়া, দুই সতীন নিয়ে.....

চারশকুন বাধা দিয়ে বলেন, মহামহিম সম্রাট! আমাদের সময় সংক্ষিপ্ত। বর্তমানে আমরা যুদ্ধ-পরিচালনা বিষয়ে—

: জানি রে বাপু জানি। দু-দণ্ড যে সমঝদার লোকের সঙ্গে খোশগল্প করবো তার জো নেই! তা বেশ, যুদ্ধের পরিকল্পনার কথাই বল—কী বলছিলে?

: সেই নরাধম আর্থার ক্রুকস্ এবং তার দক্ষিণহস্ত বিশ্বাসঘাতক ব্যাটলার বর্তমানে কোথায় শিবির সংস্থাপন করেছে তার সন্ধান আমরা পেয়েছি। সেটি একটি বিধ্বস্ত নাইট-ক্লাব-বাড়ি। শহরের ও-প্রান্তে! আমার প্রস্তাব—আজ রাত বারোটার সময় একটি বাহিনী গিয়ে প্রথমে সেটা 'রেকনয়টার' করে আসবে—

: কী করে আসবে? সম্রাট জানতে চান।

: আজ্ঞে রেকনয়টার—অর্থাৎ দুর্গপ্রবেশ পথের সুলুকসন্ধান জেনে আসবে। কাজটা দুরূহ। আমার প্রস্তাব, এই দুজন মানুষ কিছু ডেলটা সৈন্য নিয়ে—

: না। সম্রাট সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। বলেন, এত বড় গুরুতর কাজে আমি ঐ দুটো চ্যাংড়া মানুষের বাচ্চাকে পাঠাতে পারি না। যুদ্ধের ওরা কী জানে? কী বোঝে? ওরা আকাশে পাড়ি দিতেই জানে—যুদ্ধবিদ্যা শেখেনি। আমি এ অভিযানে সেনাপতি পদে বরণ করছি—আমার অজেয় বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারলে ডিফিটস্টোন চারশকুনকে। সেনাপতি চারশকুন! উঠে দাঁড়াও। আমার সামনে এস।

চারশকুন রীতিমত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। হন্তদন্ত হয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

: নতজানু হও। এই তরবারি গ্রহণ কর। আর ইয়ে, মুখ থেকে চুরুটটা ফেলে দাও!

চারশকুন চুরুটটা ফেলে দেয় বটে তবে নতজানু হয় না। বলে, য়োর ম্যাজেস্টি! আমাকে....আপনি....এ কী করছেন? যুদ্ধের আমি কী জানি?

সম্রাটের চোখ দুটো কপালে উঠে যায়। বলেন, মানে? তুমি আমার প্রধান সেনাপতি.....

: না স্যার....ইয়ে.....আমি যুদ্ধমন্ত্রী। ওসব গোলাবারুদের কাছাকাছি যাওয়ার অভ্যাস আমার নেই। আমি দূর থেকে শুধুমাত্র যুদ্ধ পরিচালনা করি। আর....ইয়ে....তরোয়াল কী হবে? ওসব আজকালকার যুদ্ধে কোনো কাজেই লাগে না।

সম্রাট হতাশ হয়ে ওয়াম্বাসীর দিকে ফিরে বলেন, দেখলে? এদের কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝি না। যুদ্ধ করবে—অথচ একটা ঘোড়া নেই, একটা বর্শা নেই, তরোয়াল নেই!

বব্ বললে, ওসব আপনাকে ভাবতে হবে না স্যার। ব্যাপারটা আমরাই ম্যানেজ করে নেব। আপনি আমাদের এই-নয়া যুদ্ধের রীতিনীতিটা ঠিক বুঝতে পারবেন না। একটা 'জেনারেশন গ্যাপ' হয়ে গেছে কিনা....

সম্রাট বলেন, 'জেনারেশন গ্যাপ' নয় হে ছোকরা, কথাটা 'মিলেনিয়াম গ্যাপ'। তা বেশ। তোমরাই সব ব্যবস্থা কর। তা আমি, সম্রাট, আমি কী করব?

চারশকুন বলেন, আপনি অনুমতি দিয়েছেন। আপাতত আর কিছু করণীয় নেই আপনার। আপনি বরং এবার গিয়ে ঐ গডফাদারকে সামলান। আমরা এদিকটা ম্যানেজ করছি।

সেই মতোই ব্যবস্থা হল। সম্রাট বিশ্রাম করতে গেলেন। যুদ্ধের যাবতীয় পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রণ করলেন চারশকুন স্বয়ং। তাঁর প্রস্তাব—ওয়াম্বাসী আর বব্ রয় দুজনে আজ রাতে যাবে দুর্গটাকে দেখে আসতে। আগামীকাল শেষ রাত্রিতে অতর্কিত আক্রমণ করা হবে। সেই মতো সিদ্ধান্ত নিয়েই সভাভঙ্গ হত, বাধ সাধলেন জীববিজ্ঞানী গার্লস গারউইন। বললেন, এ প্রস্তাবে আমার আপত্তি আছে। ওদের দুজনকেই এই বিপদজনক কাজে একসঙ্গে পাঠানো চলবে না।

চারশকুন গম্ভীরভাবে বলেন, কারণটা জানতে পারি?

: পারেন। আমাদের মূল লক্ষ্য হল মানব-প্রজাতির বংশবৃদ্ধি। পৃথিবীকে নতুনভাবে ফুলে ফলে ভরিয়ে তোলা। একটি মেয়ে হোমো-স্যাপিয়ান্স-স্যাপিয়ান্স পাওয়া গিয়েছে। আর আছে একজোড়া হুলো। একটা আপনার, যুদ্ধ করবে। একটা আমার, বাচ্চা পয়দা করবে!

চারশকুন হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন, মিস্টার গারউইন, আপনি কি চান, ব্যাটলারের মতো আমি আপনাকে ধরে গারদে বন্ধ করি? আপনি পঞ্চম বাহিনীর কাজ করছেন!

গারউইন স্তম্ভিত হয়ে যান। বাক্যস্ফূর্তি হয় না তাঁর। বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকের হয়ে এবার প্রত্যুত্তর করলেন নবীন-বিজ্ঞানী আইনস্টোন। বললেন, মিস্টার চারশকুন! আপনি কি চান ব্যাটলারের মতো আপনাকেও আমরা সরিয়ে দিই? ভুলে যাবেন না—বৈজ্ঞানিকদের সাহচর্য ছাড়া এ-যুগে যুদ্ধ করা যায় না। জীববিজ্ঞানী গার্লস্ গারউইন আমাদের সকলের শ্রদ্ধাভাজন। তাঁর সম্মান রেখে কথা বলবেন—না হলে সমস্ত গামা-পণ্ডিত আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এবং ঐ দুজন মানুষের বাচ্চাও।

চারশকুন সমবেত গামামণ্ডলীর ওপর চোখ বুলিয়ে অবস্থাটা প্রণিধান করেন। বলেন, না মানে, ওঁকে আমিও সম্মান করি! তা বেশ তো। দুজন একসঙ্গে না হয় নাই গেল। একজনই যাক। কে যাবে?

বব্ রয় তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ায়। বলে, আমি!

ওয়াম্বাসী তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে, না। আমি।

দ্য-ভেংচি বলেন, এক্ষেত্রে একমাত্র সমাধান লটারি করা। আমি দুটি কাগজে দুটি নাম লিখে টুপির ভেতর রাখছি। বিটল্‌ফেন, তুমি একটা তোলো। যার নাম উঠবে সে-ই যাবে দুর্গ পরিদর্শনে।

বিট্‌লফেন বলেন, সেই ভালো। চলো, এখনি আমার নবতম সৃষ্টিটি তোমায় শুনিয়ে দিই।

চারশকুন বলেন, ও বদ্ধ কালাকে টানাটানি করার দরকার নেই। নাম দুটো টুপিতে ফেলে আমাকে দাও। আমি একটি তুলি।

দ্য-ভেংচি দ্রুতহস্তে দুটি নাম দুটুকরো কাগজে লিখে ভাঁজ করে তাঁর টুপির মধ্যে ফেলে দেন। তারপর টুপিটা বাড়িয়ে ধরেন চারশকুনের দিকে। তিনি একটি কাগজ তুলে ভাঁজ খুলে লেখাটা পড়বার চেষ্টা করেন। সামনে দূরে নানান ভাবে ধরেও তার পাঠোদ্ধার করতে পারেন না। বলেন, এ কী লিখেছেন? মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কাগজটায় লেখা ছিল : সীম্বায়াও রক্টড!

ডক্টর ওয়াম্বাসী উঠে দাঁড়ায়। বলে, ওটা আমার নাম! আমিই যাব।

বব্-ও উঠে দাঁড়ায়। বলে, জেন্টল-রোবোস্! আপনারা একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন। আপনারা এমন ব্যবহার করছেন যেন আমরা রোবোদের প্রজা। তা নয়। আমরা দুজন স্বাধীন। ডক্টর ওয়াম্বাসী আমার সহকর্মী, কিন্তু আমিই হচ্ছি শিপ-ক্যাপ্টেন। আমার কমরেডকে এমন বিপজ্জনক যাত্রায় আমি একা যেতে দিতে পারি না। আমরা দুজনে গেলে দুজনেই মারা যাব—এমন আশঙ্কা করা অমূলক। বরং দুজন থাকলে পরস্পরকে আমরা সাহায্য করতে পারব। ফলে আমরা দুজনেই যাব।

ওয়াম্বাসী প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার পূর্বেই ঘরের ও-প্রান্ত থেকে কে যেন প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে, আমার তাতে আপত্তি আছে।

সকলেরই দৃষ্টি পরে দ্বারের দিকে। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে ডরোথি।

ওয়াম্বাসী যে-কথা বলতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই কথাটাই বলেছে ডরোথি। কিন্তু তাতে যেন সে খুশি হতে পারে না। বলে, ভেতরে এস ডরোথি। এদের বুঝিয়ে বল, কেন এ প্রস্তাবে তোমার আপত্তি!

ডরোথি দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে আসে। বলে, আমার মতে ওঁদের দুজনের এ অভিযানে একসঙ্গে যাওয়া ঠিক নয়। গার্লস্ গারউইন যা বলেছেন তা যুক্তিপূর্ণ। তাছাড়া আমি জানি—ডক্টর বব্ রয়ের কাঁধের ব্যথাটা সম্পূর্ণ সারেনি। কাল সারারাত তিনি একফোঁটা ঘুমোতে পারেননি। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করেছেন।

বব্ কিছু বলতে যাচ্ছিল—হঠাৎ ডরোথির মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে যায়। হেসে ফেলে। গার্লস্ গারউইন বলেন, প্লীজ ডক্টর রয়, আপনি আর আপত্তি করবেন না!

বব্ একটা শ্রাগ্ করে বললে, অগত্যা। সবাই মিলে যখন বলছেন.....

ওয়াম্বাসী আর থাকতে পারে না। বলে ওঠে, হ্যাঁ, শুধু জেন্টল-রোবোস্‌রা নয়, একমাত্র হিউমান লেডিটি পর্যন্ত যখন বলছেন!

অগত্যা তাই স্থির হল।

ওয়াম্বাসী কী জানি কেন তখন ক্ষেপে গিয়েছে। সভাভঙ্গ হওয়ার পর সে জনান্তিকে ডরোথির সঙ্গে দেখা করল। গতকাল মধ্যরাত্রিতে সে যখন তার সিদ্ধান্ত জানাতে গিয়েছিল, তার পর থেকে ডরোথি ওর সামনে আসেনি। এখন ওর ডাকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, কী ব্যাপার? ডাকছ?

: হ্যাঁ। সকাল থেকে সবাই আমাকে অভিনন্দন জানাতে এল, কই তুমি তো একবারও এলে না?

ডরোথি বললে, এতে আবার অভিনন্দন জানাবার কী আছে? নিতান্ত একটা জৈবিক বৃত্তিকে অবদমনের চেষ্টা করেছিলে একটা ভ্রান্ত ধারণার বশে। এতক্ষণে তোমার শুভবুদ্ধি হয়েছে—এটা নিশ্চয় আনন্দের কথা; কিন্তু সেজন্য তোমাকে ফুলের মালা পরাতে হবে এমন কোনো কারণ দেখি না।

ওয়াম্বাসী বললে, আমার জন্যে ফুলের মালা গাঁথতে তোমাকে অনুরোধ করিনি। হ্যাঁ স্বীকার করছি—ভুল আমার হয়েছিল, তোমার দক্ষ অভিনয়ে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। তোমার কথাই সত্য—বোধ করি তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা জৈবিক বৃত্তির ঊর্ধ্বে কোনদিনই উঠবে না।

: এসব কী বলছ তুমি? মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।

: পারার কথাও নয় যে ডরোথি। জৈবিক-বৃত্তির অতিরিক্ত অনুরাগ-ঘন সম্পর্কের কথা তোমার মাথায় ঢুকবে না। সে শিক্ষা তোমার নেই। তাই সোজা সোজা ভাষায় বলি—কাল সারারাত আমিও ঘুমোতে পারিনি। আজ তাই আমি একা শোব না। বব্‌-এরও ঘুমটা হওয়া দরকার। কথাটা তোমার, তাই সে এ ঘরে একা শোবে! বুঝেছ?

ডরোথির ওষ্ঠপ্রান্তে এক-চিলতে হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। ছদ্ম গাম্ভীর্যে বললে, কিন্তু তুমি তো আজ রাত্রে সেই অভিযানে যাচ্ছ?

ঃ সারারাত নিশ্চয় সেখানে ঘুরব না! ফিরে এসে যেন দেখি বব্ আমার ঘরে ঘুমোচ্ছে!

: বব্‌কেই অনুরোধটা করে দেখ না!

: না। বব্‌কে অনুরোধটা তুমি করবে।

বিচিত্র হেসে ডরোথি বললে, বিয়ে না হতেই স্বামীত্ব ফলাচ্ছ! আয়াম সরি নিগার! তুমি কোনদিনই সেই গত শতাব্দীর ধ্যানধারণা থেকে—

ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে ওয়াম্বাসী বলে, নিগার! নিগার মানে?

খিলখিলিয়ে হেসে উঠেছিল ডরোথি। বলে, ওমা! তুমি আদর-সোহাগও বোঝ না? ওটা আদরের গালাগাল! বব্ যেমন ডাকে তোমাকে।

: বব্ আর তুমি এক নও! আমাকে ও নামে ডাকবে না।

: বেশ। ধন্যবাদ ডক্টর ওয়াম্বাসী। আপনার আদেশটা মনে রাখবার চেষ্টা করব।

দুম্‌দুম্ করে পা ফেলে ওয়াম্বাসী স্থানত্যাগ করে। সুর কেটে গিয়েছে। কোথায়—কেন এ প্রভেদ? তার গায়ের রঙ? তার ভদ্র মন? ডরোথির আজন্ম নিগার-বিদ্বেষ? নাকি খোঁচা দেওয়াতেই ঐ মেয়েটির তির্যক বিলাস! বব্‌কেও সে কথায় কথায় এভাবে খোঁচা মারে? এটাই কি ওর স্বভাব?

* * *

রাত দুটোর সময় ওরা ফিরে এল অভিযান থেকে। আর্থার ক্রুক্‌স্‌-এর দুর্গটা বাইরে থেকে পরিদর্শন করে। শত্রুপক্ষ টের পায়নি। কোনো সাড়াশব্দ জাগেনি কোথাও! অভিযান থেকে ফিরে এসে ওয়াম্বাসী ডেলটা সৈন্যদের বিদায় দিয়ে ওদের আবাসে পৌঁছে দেখে সমস্ত বাড়িটা নিশুতি। কোনো ঘরে আলো জ্বলছে না। ওয়াম্বাসী উঠে আসে দ্বিতলে। নিজের ঘরে ঢুকে আলোটা জ্বালে। পাশাপাশি দুটি খাটে বিছানা পাতা। বব্ এ ঘরে নেই। ওয়াম্বাসী তৎক্ষণাৎ চলে যায় ও-ঘরে। করিডরের ও-প্রান্তে ডরোথির ঘরে। দ্বারে করাঘাত করতেই সেটা খুলে গেল। সে-ঘরেও কেউ নেই। না ডরোথি, না বব্!

বারো

পরদিন সকালে দেখা হতেই বব্ বললে, হাই নিগার! কাল কত রাত্রে ফিরলি?

: রাত দুটোয়।

: মিশন সাক্সেসফুল?

: তা বলতে পারিস। কিন্তু তুই কাল রাতে কোথায় ছিলি?

: আমরাও একটা এক্সকার্শানে গিয়েছিলাম। দারুণ চাঁদনী রাত ছিল তো—গরমও ছিল। ও বললে, চল সমুদ্রের ধারে গিয়ে রাতটা কাটিয়ে আসি। আমরা চাদর-বালিশ নিয়ে—

: বুঝলাম। কিন্তু তোর না কাঁধে ব্যথা! যন্ত্রণায় সারারাত ঘুমোতে পারিস না?

: অশ্বডিম্ব! জুলিয়েটের চালাকি! শোন নিগার, পর পর দু-রাত আমি ও-ঘরে শুয়েছি। আজ তোর চান্স।

ওয়াম্বাসী বললে, তুই সব ভুলে মেরে দিয়েছিস দেখছি! আজ না 'ডি. ডে'.!

: ডি-ডে.! ও, হ্যাঁ—তা বটে, আজ আমরা আক্রমণ করব। কে ফিরে আসব—আদৌ কেউ ফিরে আসব কিনা তাই বা কে বলতে পারে?

ওয়াম্বাসী জবাব দেয় না। চুপ করে সে কী যেন ভাবে।

: তুই কী ভাবছিস্ বল তো?

ওয়াম্বাসী মনস্থির করে বলেই ফেলে, বাস্টার্ড! বন্ধু হিসাবে একটা অনুরোধ করব, রাখবি?

বব্ হাসে। বলে, অত ভণিতা করছিস কেন রে নিগার? নেহাত অদেয় না হলে কোনোদিন তোকে বিমুখ করেছি?

: আমার মনে হয়, আমাদের দুজনের এ অভিযানে যাওয়াটা ঠিক নয়। যদি দুজনেই মারা যাই তাহলে—

কথাটা সে অসমাপ্ত রাখে। বব্ চিন্তান্বিত। একটু ভেবে নিয়ে বলে, তোর কথাটা ফেল্না নয়। পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে, অন্যান্য মহাদেশে মানুষ আছে কিনা আমরা জানি না। সবই ডার্ক কন্টিনেন্ট! আবার আমাদের ভবিষ্যৎ-বংশীয় নতুন ম্যাগেলান, নতুন কুক্, ভাস্কো-দা-গামা নতুন জগতের সন্ধানে বার হবেন। সেই পালতোলা জাহাজে। আবার নতুন করে মানব সভ্যতার বিকাশ হবে। আর সেটা সম্ভব হবে যদি তুই-আমি দুজনের মধ্যে অত্যন্ত একজন বেঁচে থাকি! যদি ডরোথি আমাদের কোনো একজনের সন্তানের মা হতে পারে!

: তাই আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, তুই থাক। আমাকে একাই যেতে দে। ঐ আর্থার ক্রুক্স্ লোকটাকে আমি বোঝাবার চেষ্টা করব—সে মানুষ, কেন বুঝবে না?

: কিন্তু তুই যাবি কেন? আমি নয় কেন?

: যেহেতু আমি নিগ্রো! আমি নিগার! তোকে সে গুলি করেছে। হয়তো আমাকে করবে না। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হয়তো সে রাজি হবে।

অনেকক্ষণ ভেবে নিয়ে বব্ বললে, ধর যদি তার সুবুদ্ধির উদয় না হয়?

: তখন তাকে বধ করব আমি!

: পারবি? সেটা আমার পক্ষে অনেক সহজ হবে রে নিগার! হাজার হ'ক—লোকটা তোর স্বজাতি, হয়তো এই দুনিয়ায় সে তোর একমাত্র জাতভাই!

ওয়াম্বসী দৃঢ়স্বরে বলে, হোক। আমি আগে মানুষ, পরে নিগ্রো। যদি গোটা মানব-প্রজাতিটাই লুপ্ত হতে বসে, তাহলে স্বজাতি-নিধনে আমার সঙ্কুচিত হওয়া উচিত নয়। আমি পারব। নিশ্চয়ই পারব।

বব্ ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে।

ওয়াম্বাসী বলে, তাহলে ভাই আর একটা কথা বলি। কিছু মনে করিস না।

: বল না! অত আমতা আমতা করছিস কেন?

: আমতা আমতা করছি এজন্য যে, আমার আশঙ্কা হচ্ছে—কথাটা তুই বুঝতে পারবি না—

: কী এমন তত্ত্বকথা, বলই না?

: দ্যাখ বাস্টার্ড! আজ আমরা তিনজন—তুই আমি আর তোর জুলিয়েট একটা যুগসন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছি। আমরা একটা নতুন পৃথিবী সৃজন করতে যাচ্ছি। নতুন ঈডেনে প্রবেশ করবে নতুন কালের আদম আর ঈভ। আমি চাই না, আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারব না—যদি তার মূলে থাকে শুধুমাত্র একটা জৈবিক প্রবৃত্তি!

বব্ সত্যিই কথাটা বোঝবার চেষ্টা করে। পারে না। স্বীকার করে সেকথা। ওয়াম্বাসী হতাশ হয়ে বলে, কেমন করে তোকে বোঝাই বাস্টার্ড? তুই যে ইতিহাস-কাব্য-সাহিত্যের পাতাই ওল্টাসনি কোনোদিন! সৃষ্টির মূলে যদি প্রেম না থাকে—'প্রেম', যা কামের চেয়েও বড়—সেই ভালোবাসার বনিয়াদের ওপর যদি এ নতুন বিশ্বকে গড়তে না পারি তাহলে আবার এ সৃষ্টি ব্যর্থ হয়ে যাবে—যেমন গিয়েছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে গত-কল্পের সভ্যতা। তোর জুলিয়েট তোকেই ভালোবাসে—আমাকে নয়। তোর দৃষ্টি দিয়ে তুই তা বুঝতে পারছিস্ না। ওর চোখে আমি—নিগ্রো, আমি নিগার! আমাকে সে বারে বারে সংস্কারাচ্ছন্ন করে ব্যঙ্গ করে; আসলে সে নিজেই আবদ্ধ আছে গত শতাব্দীর একটা কুসংস্কারে—সাদা চামড়া আর কালো চামড়ার পার্থক্যটা সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

: অসম্ভব! তাহলে সে তোকে কিছুতেই....সে তো আগে তোকেই.....

: জানি। তার কারণ 'প্রেম' নয়, 'কাম'! শুধু সে বেচারিকে দোষ দিয়ে কী হবে—হয়তো আমিও তাকে আর ভালোবাসতে পারবো না। আমার ডেস্‌ডিমোনা একরাত্রের অভিনয় সেরে হারিয়ে গিয়েছে। হয়তো আমিও তাকে আজ ঘৃণা করি।

বব্ অনেকক্ষণ জবাব দেয় না। কী যেন ভাবছে সে! তারপর বলে, কথাটা সত্যিই নিগার? তুই ওকে ঘৃণা করিস?

ওয়াম্বাসী দু-হাতে মুখ ঢাকে। সেও অনেকক্ষণ সময় নেয় জবাব দিতে। বোধ করি অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত একবার তলিয়ে দেখে নেয়। তারপর মুখ থেকে হাত সরায়। হাসে। বলে, না রে বাস্টার্ড! ভুল বলেছিলাম। রাগের মাথায়। তোকে ঈর্ষা করি বলে। না, ডেস্‌ডিমোনাকে আমি ঘৃণা করি না—তাকে আজও ভালোবাসি। সে আমাকে ঘৃণা করে জেনেও।

বব্ বলে, ওকে ডাকব?

ওয়াম্বাসী ববের হাত চেপে ধরে : না। এ সিদ্ধান্ত শুধু তোর আর আমার!

বব্ আবার চিন্তামগ্ন হল। তারপর যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বলে, ডক্টর ওয়াম্বাসী! য়োর শিপ্-ক্যাপ্টেন হ্যাজ কাম টু এ ডিসিশন! আমি সিদ্ধান্তে এসেছি। হ্যাঁ, আমরা দুজনেই এ অভিযানে যাব না। কিন্তু কে যাবে তা স্থির করব লটারি করে। বি এ স্পোর্ট!

ওয়াম্বাসী বললে, আমি রাজি নই। তুই আমাকে যেতে দে।

: কেন বল দিকিনি!

: কেন? সেটাই তো এতক্ষণ বোঝাচ্ছিলাম! তাহলে তোকে খুলেই বলি। কাল রাত্রে আমি তোর জুলিয়েটকে বলেছিলাম, রাত্রে আমি তার ঘরে শোব। তাই আমাকে এড়াবার জন্যই সে এভাবে তোকে সমুদ্রের ধারে নিয়ে গিয়েছিল।

বব্ শুধু বললে, আয়াম সরি! হ্যাঁ, আমারই অন্যায়। পর পর দু-রাত..... ওয়েল! যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। আয়, এবার লটারি করি!

ওয়াম্বাসী বলে, লটারি যদি করতেই হয়, তাহলে তোর জুলিয়েটকে ডাক। তার সামনেই সেটা হোক।

বব্ গম্ভীরভাবে শুধু বললে, 'তোর জুলিয়েট' নয়, ডক্টর ওয়াম্বাসী! হয় তুমি ওকে ডেস্‌ডিমোনা বলে ডেকো, নাহলে ডরোথি বলে! 'জুলিয়েট' ডাকটা আমার জন্যেই তোলা থাক।

'ডক্টর ওয়াম্বাসী'!— ওয়াম্বাসী চমকে ওঠে। তবে কি বব্‌ও ওকে ঈর্ষা করতে শুরু করেছে? নাকি সেই মেয়েটা জনান্তিকে বব্‌কে জানিয়েছে তার মুখে 'নিগার' সম্বোধনটায় আপত্তি জানিয়েছিল ওয়াম্বাসী! সেও গম্ভীর হয়ে বলে, বেশ, ডাকো তাকে।

ডরোথি আসতেই বব্ বললে, ডরোথি! কাল ওয়াম্বাসী তোমাকে কিছু অনুরোধ করেছিল?

ওয়াম্বাসী নজর করল, তার সম্মুখে ঐ মেয়েটিকে বব্ তার দেওয়া প্রিয় নামে সম্বোধন করল না। পল আর ভিনসেন্ট যেভাবে এডনাকে ভাগ করে নিয়েছিল, ওরা দুজন বোধ করি সেভাবে ডরোথির ব্যক্তি-সত্তাকে সমানভাবে ভাগ করে নিতে পারবে না। কেন? তারা সাদা আর কালো বলে?

ডরোথি ভ্রূ কুঁচকে বললে, নিক্তি ধরে প্রেম করতে আমি পারব না।

ওয়াম্বাসী বলে, ও কথা থাক। যেজন্য তোমাকে ডাকা হয়েছে তাই বলি। আমরা দুজনে স্থির করেছি আজ আমাদের মধ্যে মাত্র একজনই যাবে আর্থারের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে। কে যাবে তুমি নির্বাচন করে দেবে?

মেয়েটি ববের দিকে একবার তাকিয়ে দেখল। বললে, আমি তার কী জানি?

: তোমার কোনো মতামত নেই? জানতে চায় ওয়াম্বাসী।

: থাকলেও তা জানাতে আমি বাধ্য নই।

বব্ বললে, আমরা স্থির করেছি লটারি করে সেটা স্থির করব। ঐ টেবিলের ওপর দুটি নাম লেখা কাগজ আছে। তুমি একটা তুলে দাও। যার নাম-লেখা কাগজ উঠবে সেই যাবে আর্থারের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে।

ডরোথি একটু ইতস্তত করল। তারপর উঠে গেল টেবিলের কাছে। দুটি ভাঁজ করা কাগজের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর মরিয়া হয়ে একখণ্ড কাগজ তুলে নিল। ভাঁজ খুলে দেখল। তার মুখটা কাগজের মতো সাদা হয়ে গিয়েছে।

বব্ ঘরের এ-প্রান্ত থেকে বলে, কী? কার নাম?

ডরোথি জবাব দেয় না। তার রক্তহীন ঠোঁট দুটো নড়ে ওঠে।

জবাব দেয় ওয়াম্বাসী। কাগজটা সেও দেখতে পায়নি। তবু নিঃসন্দেহে বলে, আয়াম সরি, শিপ্-ক্যাপ্টেন! নামটা তোমার।

বব্ দুমদুম করে এগিয়ে যায়। কাগজটা ডরোথির হাত থেকে কেড়ে নিয়ে দেখে। হাসে। বলে, য়ু আর করেক্ট নিগার! কনগ্রাচুলেশন্স। আমিই যাবো। এসো।

ওর জুলিয়েটের হাত ধরে বব্ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

ওয়াম্বাসী বিহ্বলের মতো বসে থাকে একা।

তেরো

আলোর সামনে বোতলটা তুলে দেখল বব্ রয়। আর এক পেগ মতো বাকি আছে। ঘড়ির দিকেও এক নজর তাকিয়ে দেখল। দুটো বেজে দশ। ঠিক আড়াইটের সময় তার অভিযানে বের হওয়ার কথা। ওয়াম্বাসীর থিয়োরিটা সে মেনে নিতে পারেনি। আর্থারকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দলে টানার চেষ্টা সে আদৌ করবে না। পরিচয় হয়নি, তবু লোকটা বব্‌কে গুলি করে মারতে চেয়েছিল। এডকে সে কুকুরের মতো গুলি করে মেরেছে। ফলে বব্ তাকে কোনোক্রমেই ক্ষমা করতে পারে না। ব্লাডি! বাস্টার্ড! নিগার! হুইস্কির তলানিটুকু পানপাত্রে ঢালতে ঢালতে জানলা দিয়ে বাইরে তাকালো বব্। ফিন্‌কি দিয়ে জ্যোৎস্না ফুটেছে। আজ বোধ হয় পূর্ণিমা। সেই দলছুট নাইটেঙ্গেলটারও আজ রাত্রে ঘুম নেই। এই স্তব্ধ পৃথিবীতে এই মধ্যরাত্রে সেই পাখিটাই জাগিয়ে রেখেছে প্রাণের সাড়া। না। আরো একজন আছে। ঐ খাটের ওপর। উপুড় হয়ে পড়ে আছে। মাঝে মাঝে তার পিঠটা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

: কী আশ্চর্য! এভাবে কাঁদছ কেন? তুমি যেন ধরেই নিয়েছ আমি বেঁচে ফিরব না!

ডরোথি উঠে বসে। চোখ তুলে তাকায়। তার দুটি সুন্দর নীল চোখের তারা যেন রক্তসমুদ্রে

অবগাহন করেছে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে বললে, আমি....আমি নিজে হাতেই তোমার নামটা তুলেছি!

: তাতে কী হল? বি এ স্পোর্ট! লটারি—লটারিই!

: তোমরা....তোমরা নিষ্ঠুর! নিজে হাতে আমাকে দিয়ে আমার মৃত্যুপরোয়ানা লিখিয়ে নিলে!

বব্ বললে, মিথ্যে কথা বলোনা জুলিয়েট। তোমাকে আমরা সুযোগ দিয়েছিলাম বেছে নিতে। তুমি রাজি না হওয়াতেই আমরা লটারি করে—

ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে ডরোথি বলে, কেন? তোমরা জানতে না? আমার কী ইচ্ছা তা জানতে না? তুমি বুঝতে পারোনি? সেই নিগারটা বুঝতে পারেনি? আর য়ু অল ইডিয়টস!

: প্লীজ জুলিয়েট! শান্ত হও। দেখো, আমি ঠিক বেঁচে ফিরে আসব।

: কিন্তু যদি....যদি....

: তাহলেও তুমি বিধবা হবে না। হা-হা করে হেসে ওঠে মদ্যপটা।

সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায় ডরোথি। বলে, না। সেবার যা বলেছিলাম এবারও তাই বলছি। ঐ নিগারটার বিছানায় শোওয়ার আগে আমি আত্মহত্যা করব।

বব্ স্তম্ভিত হয়ে যায়। বলে, কী বলছ তুমি? তুমি তো নিজেই বলেছ—তাকে তুমি স্বেচ্ছায় সেরাত্রে....

: হ্যাঁ। কিন্তু তখন তো আমি তোমাকে চিনতাম না!

বব্ পানীয়টুকু কণ্ঠনালিতে ঢেলে দেয়।

: প্লীজ রোমিও! তুমি ওকে যেতে দাও। তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না।

বব্ পানপাত্রটা আছড়ে মাটিতে ভাঙে। ঘরময় পদচারণ করতে থাকে। তারপর ফিরে এসে বলে, তা হয় না। আমি স্পোর্টস্‌ম্যান।

ডরোথি বলে, স্পোর্টসম্যান! তাহলে তুমি এখানে কেন? তোমার সেই নিগার বন্ধুই বা তার ঘরে একা পড়ে আছে কেন? পর পর তিন রাত্রি আমাকে অধিকার করে আছ কি স্পোর্টস্‌ম্যানশিপের পরাকাষ্ঠা দেখাতে?

মদ্যপটা ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে। বিড়বিড় করে বলে, করেক্ট! আমার অন্যায় হয়েছে।

: না, অন্যায় হয়নি! কারণ তুমি স্পোর্টস্‌ম্যান নও, তুমি লাভার। খেলোয়াড় নও, তুমি প্রেমিক!

বব্ উঠে দাঁড়ায়। বলে, না। কারণ সেটা নয়—কারণটা কী তা নিগার জানে! তাই সে আজ তার দাবি পেশ করেনি। হি হিজ অল্‌সো এ স্পোর্টস্‌ম্যান! তাই সে এই বোতলটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়েছে। তাই সে আজ রাতে আমাকে এ-ঘরে জোর করে ঠেলে পাঠিয়ে দিল!

: কী কারণ সেটা? শুনি? জানতে চায় মেয়েটি।

শূন্যগর্ভ বোতলটা জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল বব্। হাসল। বললে, নিগারটা জানে—বোতলটা যেমন শেষ হয়ে গেল রাত পোহাবার আগেই, আমিও আজ রাতে তেমনি—

: না। ডরোথি ছুটে এসে ওর মুখে হাত চাপা দেয়।—প্লীজ, ও কথা বোলোনা!

ঢং করে ঘড়িতে আড়াইটা বাজল।

বব্ রয় তার বাহুবন্ধে আবদ্ধ সেই ছলনাময়ীর মুখটা তুলে ধরে। ওর জুলিয়েট নিমীলিত নেত্রে প্রতীক্ষা করে—হয়তো এই ওদের শেষ চুম্বন। ধীরে ধীরে নেমে আসে বব্ রয়ের মুখটা। কবোষ্ণ ওষ্ঠাধরের স্পর্শ পাওয়ার আগেই সে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো ছিটকে সরে যায়।

শব্দটা ডরোথিও শুনেছে। জ্যোৎস্নালোকিত স্তব্ধ রাত্রির নৈঃশব্দকে বিদীর্ণ করে অদূরের কোথাও একটা বিস্ফোরণ ঘটেছে। যেন পুঞ্জীভূত বারুদের স্তূপে স্পর্শ করেছে একটি স্ফুলিঙ্গ। বব্ রয় ছুটে গেল জানলার ধারে। দিগন্তের এক প্রান্তে—ঐ যেদিকে সেই আর্থার ক্রুক্‌সের গোপন আস্তানা—সেইদিকের আকাশটা লালে-লাল হয়ে উঠেছে। আকাশচুম্বী অগ্নিশিখা অন্ধকারকে লেহন করছে।

একধাক্কায় ডরোথিকে সরিয়ে দিয়ে শিপ্-ক্যাপ্টেন ছুটে বেরিয়ে আসে। দোতলা থেকে একতলায়। সেখানে ওর ডেল্টা-বাহিনী সৈন্যদলের কেউ নেই। ওদের তো এই রাত আড়াইটেয় এখানেই সারিবদ্ধভাবে অপেক্ষা করার কথা ছিল! সমস্ত বাড়িটা ভূতুড়ে। বাড়িটা ঘুমোচ্ছে। সিঁড়ি বেয়ে আবার সে উঠে আসে দোতলায়। ওয়াম্বাসীকে ঘুম থেকে তুলে ব্যাপারটা জানতে চায়।

ধাক্কা দিতেই দরজাটা খুলে গেল। ওয়াম্বাসী ঘরে নেই। তার বিছানার ওপরে কাগজচাপার তলায় একখণ্ড হাত-চিঠি। তুলে নেয় চিঠিখানা। আলোর কাছে সরে এসে পড়তে শুরু করে। পরিচিত হস্তাক্ষর :

"মাই ডিয়ার বাস্টার্ড

শেষ পর্যন্ত শিপ্-ক্যাপ্টেনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাই করতে হলো। উপায় নেই। তুই কিছুতেই রাজি হতিস না। আমাকে একা যেতে দিতিস না। আমি জানি। দোষ তোর নয়—দোষ আমাদের। আমার আর আমার ডেস্‌ডিমোনার। আমরা কিছুতেই প্রফেসর আইনস্টোনের সেই আশ্চর্য ফর্মুলাটাকে প্রমাণ করতে পারতুম না—সেই $E = mC^2$। আর দায়ী সেই অজানা লোকটা....যার নাম লিখতে একটা বড় হরফের 'G' লাগে। সেই তো দায়ী আমার এই কালো চামড়াটার জন্যে। কেন এ মারাত্মক ভুলটা করেছিল সে—বলতে পারিস? তাই আমার এই খোদার ওপর খোদগিরি।

আগামী দুনিয়ায় শুধু আলোই থাকবে—অন্ধকার নয়। বিশ্বস্রষ্টার কলঙ্কের সেই শেষ কালিমা-চিহ্নটুকু আজ নিঃশেষে আগুনে পুড়িয়ে ফেলব। বাকি যা থাকবে তা শুধু খাঁটি সোনা।

কনগ্র্যাচুলেশন্স্।

ইতি—তোর নিগার"

সমাপ্ত ∞

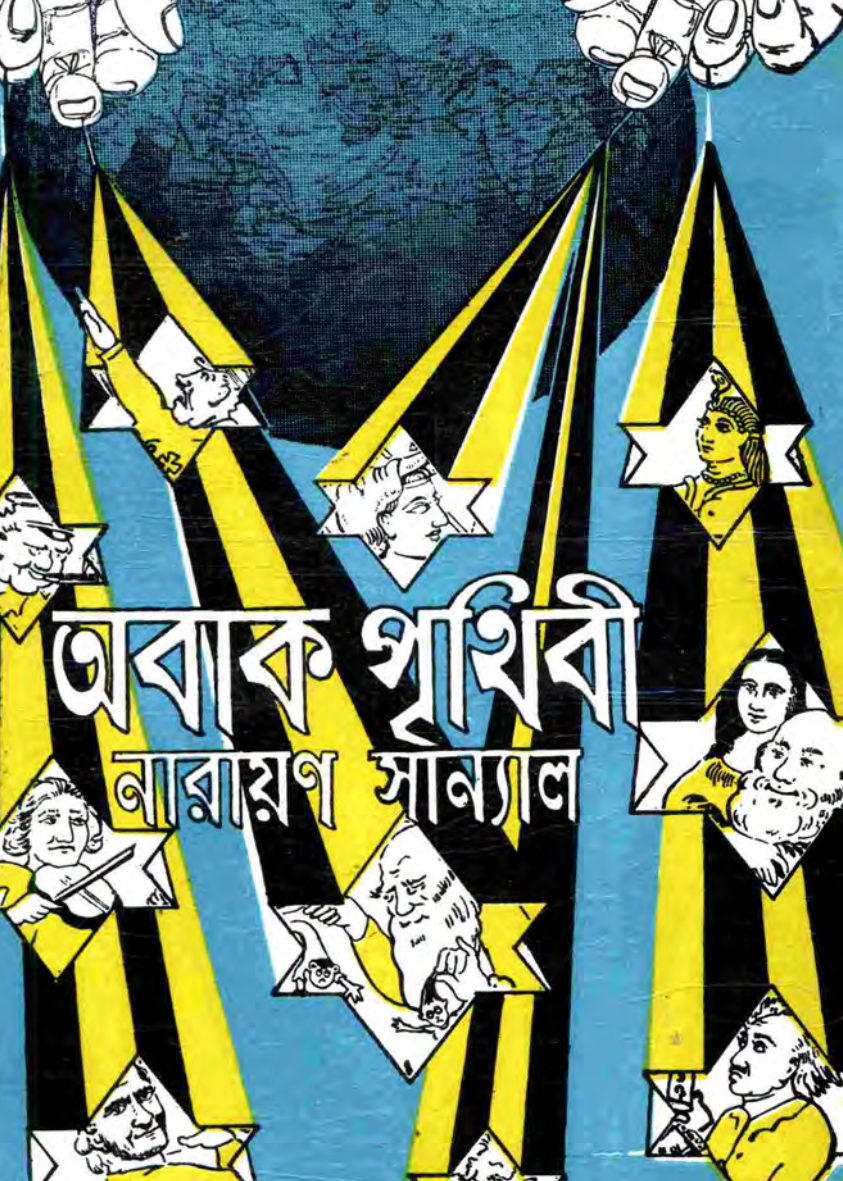

অবাক পৃথিবী

নারায়ণ সান্যাল